সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

৮ম খন্ড

কোরআনের অনুবাদ

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

৮ম খন্ড

সূরা আল আনফাল

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক
মাওলানা কুতুবুল ইসলাম

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন
(৮ম খন্ড সূরা আল আনফাল)

প্রকাশক
খাদিজা আখতার রেজায়ী
ডাইরেক্টর আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
স্যুট ৫০১ ইন্টারন্যাশনাল হাউজ ২২৩ রিজেন্ট স্ট্রীট, লন্ডন ডব্লিউ ১ বি ২কিউ ডি
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৪৪ ০২০ ৭২৭৪ ৯১৬৪ মোবাইল: ০৭৯৫৬ ৪৬৬৯৫৫
বাংলাদেশ সেন্টার
১৭ এ-বি কনকর্ড রিজেন্সী, ১৯ ওয়েস্ট পান্থপথ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮০-২-৮১৫৮৫২৬
বিক্রয় কেন্দ্র : ৫০৭/১ ওয়ারলেস রেল গেইট (জামে মাসজিদ দোতলা), বড় মগবাজার ঢাকা
১১ ইসলামী টাওয়ার, (নীচতলা), দোকান নং ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ও ফ্যাক্স : ০০৮৮-২-৯৩৩ ৯৬১৫ মোবাইল : ০১৮১৮ ৩৬৩৯৯৭
প্রথম সংস্করণ
১৯৯৭
৯ম সংস্করণ
সফর ১৪৩১, জানুয়ারী ২০১০,মাঘ ১৪১৬
কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়: দুইশত টাকা মাত্র

Bengali Translation of Tafseer
'Fi Zilalil Quran'
Author
Syed Qutb Shaheed
Translator of Quranic text into Bengali
&
Editor of Bengali rendition
Hafiz Munir Uddin Ahmed
8th Volume
(Sura Al Anfal)
Published by
Khadija Akhter Rezayee
Director Al Quran Academy London
Suite 501 International House 223 Regent Street London W1B 2QD
Phone & Fax : 0044 020 7274 9164 Mob : 07956 466955
Bangladesh Centre
17 A-B Concord Regency, 19 West Panthopath, Dhanmondi, Dhaka-1205
Phone & Fax : 00880-2-815 8526
Sales Centre: 507/1 Wireless Railgate, (Masjid Complex 1st Floor)
11 Islami Tower (Garand Floor), Stall No- 36, Bangla Bazar, Dhaka
Phone & Fax : 00880-2-933 9615, Mobile : 01818 363997
1st Edition 1997
9th Edition
Shafar 1430, January 2010
Price Tk. 200.00
E-mail: info@alquranacademylondon.co.uk website: www.alquranacademylondon.co.uk
ISBN-984-8490-27-2

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমানযমীন, চাঁদসুরুজ, মহাদেশমহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তার নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?
কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়

এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আ'লামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহ্সান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক—এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা এ মাস থেকেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে ঊর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন
জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও 'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আঝ ঝুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ–আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহ্র ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না-এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি

চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা–শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ

সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না—না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যর সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত

একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,

হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

জানুয়ারী ১৯৯৫

সাইয়েদ কুতুব শহীদ একটি মহা জীবন

বিশ্বের সর্বাধিক মানুষের পঠিত-বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক ভাষায় অনুদিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' শহীদ সাইয়েদ কুতুবের সুদীর্ঘ সাধনা ও গবেষণার এক অমর সৃষ্টি। আধুনিক জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত আরব আজমের প্রতিটি মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে কোরআনের বাণী পৌঁছে দেয়ার এক প্রচন্ড তাগিদ রয়েছে এই তাফসীরের পাতায় পাতায়।

শহীদ সাইয়েদ কুতুব বিংশ শতকের একজন কালজয়ী প্রতিভা। তার প্রতিভাদীপ্ত জ্ঞানকোষ থেকে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর পাশাপাশি তিনি আরো অনেক কয়টি ইসলামী সাহিত্য রচনা করেছেন। তার প্রতিটি বই যেমনি ইসলামী জ্ঞান গরিমায় মহীয়ান তেমনি তা জেহাদের উদ্দীপনায়ও বলীয়ান। তাঁর সাহিত্য যেমনি ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে তোলে তেমনি জেগে থাকা মানুষকে জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে।

আমাদের সমাজে প্রচলিত ও প্রকাশিত হাজার হাজার ইসলামী সাহিত্যের সাথে শহীদ কুতুবের গ্রন্থমালার এখানেই তফাৎ।

তাফসীর শাস্ত্রের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় কোরআনের শত শত তাফসীর গ্রন্থ লেখা হয়েছে সেখানে সেই বিশাল ভান্ডারে আরেকটি সংখ্যা যোগ করার জন্যে যে এই মহাপুরুষ তাঁর কলম ধরেননি, কিছুদূর এগুলে আমি জানি, আপনি নিজেই তা বুঝতে পারবেন। আমি শুধু আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতাটুকু আপনাকে বলতে পারি যে, 'ফী যিলালিল কোরআন' সত্যিই আমাদের সময়ের এক বিস্ময়কর তাফসীর। দুনিয়ার সব কয়টি সেরা তাফসীর গ্রন্থের পাশাপাশি এটি নিসন্দেহে আমাদের সাহিত্যে এক মহা মূল্যবান সংযোজন।

যে মহান চিন্তানায়কের কলম থেকে এই তাফসীর গ্রন্থটি নিসৃত হয়েছে, সেই গ্রন্থের প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশের এ পবিত্র মুহূর্তে তার জীবন ও সাধনা সম্পর্কে দু'টো কথা না বললে মনে হয় তার রূহের প্রতি সুবিচার করা হবে না।

সাইয়েদ কুতুবের শাহাদাতের পটভূমিকা

১৯৬৬ সালের ২৯শে আগস্ট সকাল বেলায় মিসরের যালেম শাসক জামাল নাসের-সাইয়েদ কুতুব এবং তার দু'জন সাথী মোহাম্মদ ইউসুফ হাওয়াশ ও মোহাম্মদ আবদুল ফাত্তাহ ইসমাইলকে নির্মমভাবে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়। তিনজন মর্দে মোজাহেদ একত্রে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)

১৯৫৪ সালে সাইয়েদ কুতুবকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর জেলে তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়, ফলে তিনি দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৫৫ সালের মে মাসে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। একই বছরের ১৩ই জুলাই তারিখে যখন তাকে ১৫ বছর কারাদন্ডের আদেশ দেয়া হয় তখন তিনি এতো অসুস্থ ছিলেন যে, সেই আদেশটি শোনার জন্যে আদালতের কাঠগড়া পর্যন্ত পৌঁছাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। দশ বছরের ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক যুলুম নিপীড়নের পর ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন। তদানীন্তন ইরাকী প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফের ব্যক্তিগত অনুরোধে জামাল নাসের কিছুদিনের জন্যে তাকে মুক্তি দিলেও সে তাকে আবার গ্রেফতারের নানা অজুহাত খুঁজতে থাকে।

মুক্তির পর তিনি কায়রোর উপকণ্ঠ–'হুলওয়ানে' অবস্থান করতে থাকেন। এখানে তার সাথে যারা দেখা করতে আসতেন পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা তাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতে শুরু করে। এ সময় অন্যান্য আরব দেশগুলো থেকে ইসলামী আন্দোলনের নেতারা পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্যে তার কাছে ছুটে আসতেন। যালেম শাসকদের সাথে মোকাবেলা করে সারা বিশ্বে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে জোরদার করার বিষয়েই তারা তার সাথে আলোচনা করতেন। বলতে গেলে মধ্যপ্রাচ্যসহ সব কয়টি আরব ভূখন্ডের ইসলামী দলগুলোর জন্যে সাইয়েদ কুতুব ছিলেন তখন প্রেরণার এক বিরাট উৎস।

এটাই ফেরাউনের উত্তরসূরী নাসের চক্রের সহ্য হলো না। তারা ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে পুনরায় কারারুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করলো। গ্রেফতারী পরোয়ানা পড়েই তিনি স্পষ্টত নিজের ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'আমি জানি যালেমরা এবার আমার মাথাটাই চাইবে, এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। নিজের মৃত্যুর জন্যে আমার কোনো আক্ষেপও নেই। আমার তো বরং সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় আমার জীবনের সমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আগামীকালের ইতিহাসই এটা প্রমাণ করবে যে, ইখওয়ানুল মোসলেমুন সঠিক পথের অনুসারী ছিলো–না এই দিনের শাসকগোষ্ঠী?'

সাইয়েদ কুতুবের গ্রেফতারের সাথে সাথেই শুরু হলো দলীয় নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক গ্রেফতার। লন্ডন থেকে প্রকাশিত ৬৫ সালের ১১ই অক্টোবরের দৈনিক টেলিগ্রাফের মতে এই গ্রেফতারের সংখ্যা ছিলো ৪০ হাজারের ওপর। এদের মধ্যে ৭ শত ছিলেন মহিলা। গ্রেফতারের পর এই বিপুলসংখ্যক নেতা ও কর্মীদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। এদের অধিকাংশের ওপরই নাসেরকে হত্যা ও তার হুকুমতকে উৎখাতের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়।

বৈরুতের একটি পত্রিকা সে সময়ে এ ধরনের এমন একটি খবর প্রকাশ করেছে, যা শুনলে যে কোনো বিবেকবান মানুষই বুঝতে পারবে এদের ষড়যন্ত্র ছিলো কতো হীন, কতো স্থূল!

একটি হাস্যস্পদ ঘটনা

এক গোয়েন্দা পুলিশের পকেটে ইখওয়ানুল মোসলেমুনের সদস্য হওয়ার ফরম রেখে তাকে জামাল নাসেরের জনসভায় পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। সভার কাজ শুরু হলে সে ব্যক্তি নাসেরকে লক্ষ্য করে পরপর ১২ রাউন্ড গুলী ছুঁড়ে, কিন্তু একটি গুলীও নাসেরের শরীরের কোথায়ও লাগে না। যে ব্যক্তিটি গুলী ছুঁড়েছে সে কিন্তু পালাবারও চেষ্টা করছে না। একদল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নাসেরের সামনে নিয়ে যায়। নেতা বললো তার পকেট তল্লাশী করে দেখো, ইখওয়ানের কোনো কাগজপত্র পাওয়া যায় কি না। সাথে সাথেই পুলিশের লোকেরা চীৎকার করে উঠলো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এই যে দেখুন, ইখওয়ানের সদস্যভুক্তির ফরম তার পকেটে। তাকে জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলতে শুরু করে, হ্যাঁ, আমি ইখওয়ানের লোক, ইখওয়ানীরাই আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে গুলী করার জন্যে।

নেতাকে আর পায় কে? সে তো এই অজুহাতটির খোঁজেই ছিলো। গ্রেফতারকৃত ইখওয়ানীদের বিচারের জন্যে গঠন করা হলো স্পেশাল সামরিক আদালত। বিচারক, বাদী-বিবাদী ও উভয় পক্ষের উকিল–এরা সবাই প্রেসিডেন্টের নিয়োজিত। তারপরও তাদের রায় কার্যকর করার জন্যে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর প্রয়োজন হতো। অনুমোদনের নামে তা তার নির্দেশ হিসাবে কাজ করতো।

বিচারের নমুনা

সাইয়েদ কুতুবের বিচার শুরু হলো। বাদী পক্ষ সমর্থনের জন্যে সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর বন্ধুদের কোনো কৌসুলী নিয়োগের অধিকার ও সুযোগ দেয়া হলো না। দেশের শাসনতান্ত্রিক বিধি অনুযায়ী সুদান ও মরক্কোর আইনজীবীরা মিসরের আদালতে মামলা পরিচালনা করতে পারলেও তাদের সে সুবিধা দেয়া হলো না। সাইয়েদ কুতুব ও তার সাথীদের মামলা পরিচালনার জন্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সুদান, মরক্কো ও আরো দু-একটি আরব দেশের কয়েকজন আইনজীবী কায়রো এসেছিলেন। তাদের সবাইকে কায়রোর বিমানবন্দর থেকেই ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। দু একজন আইনজীবীকে আদালত কক্ষ থেকে গলা ধাক্কা দিয়েও বের করে দেয়া হয়।

ফরাসী বার এসোসিয়েশনের সভাপতি উইলিয়াম থরপও চেয়েছিলেন মামলার কাজে কায়রো আসতে, কিন্তু অনুমতি পাননি। লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-ও এ ব্যাপারে তাদের চেষ্টার ত্রুটি করেনি। তারা প্রথমত মামলা পরিচালনার জন্যে একজন আইনজীবী পাঠাতে চেয়েছে, নাসের অনুমতি দেয়নি। তারপর তারা বিচার কক্ষে তাদের একজন পর্যবেক্ষক পাঠাতে চেয়েও সফল হয়নি।

১৯৬৬ সালের ২৫শে এপ্রিল তারিখে এই প্রতিষ্ঠান তার এক প্রতিবাদলিপিতে লিখেছে, শুধু তাদেরই নয়, মিসরীয় স্বৈরশাসক গোটা বিচারকক্ষে কোনো বিদেশী নাগরিক, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি এমনকি কোনো সাধারণ মানুষকেও ঢুকতে দেয়নি। আদালতের কোনো বিবরণী যেন সরকারের অথারাইজেশন ছাড়া সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হতে না পারে তার জন্যে তারা একটি কুখ্যাত সেন্সরশীপ এ্যাক্ট চালু করে রাখে।

প্রথম ঘোষণা দেয়া হলো সমগ্র বিচারের অনুষ্ঠানটি জাতীয় প্রচার মাধ্যম সরাসরি প্রচার করা হবে, কিন্তু অভিযুক্ত নেতারা যখন অপরাধ স্বীকার করতে অস্বীকার করলেন এবং তাদের ওপর কারা কর্তৃপক্ষ যে অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে তা বর্ণনা করতে শুরু করলেন, তখন সম্পূর্ণ বিনা নোটিশেই সম্প্রচারের গোটা কর্মসূচী বাতিল করে দেয়া হলো।

এই হচ্ছে মিসরীয় সামরিক আদালতে বিচারের নমুনা–যার মাধ্যমে তাদের এতো বড়ো দন্ড দেয়া হয়েছে। বিচারালয়ে বিচারের নামে যে প্রহসন চালানো হয়েছে ১৯৬৬ সালের ১৩ই এপ্রিল তার কিঞ্চিৎ বিবরণী কায়রোর আধা-সরকারী দৈনিক আল আহরাম পত্রিকাটি প্রকাশ করেছে। এতে দেখানো হয়েছে, আদালতে অভিযুক্তরা দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের নিজেদের কোনো কৌসুলী নেই। আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁদের কোনো কথা বলার সুযোগ নেই। এর মাঝেও সাইয়েদ কুতুব কিছু বলতে চাইতেন, কিন্তু তাকে কিছুই বলতে দেয়া হতো না।

এমনিভাবে সভ্য সমাজে অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে একদিন আদালত তার রায়ে বললো, 'হ্যাঁ তোমাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক তোমরা সবাই মিসরের নেতা জামাল নাসেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছো। তোমরা এ দেশের ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছো, তাই তোমাদের সবার নামে ফাঁসির আদেশ শোনানো হলো।'

এ ছিলো ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা। সারা বিশ্ব হতবাক হয়ে এ ঘটনা দেখলো।

বিচারের নামে এ অবিচার দেখে মানবতা সেদিন আর্তনাদ করে উঠলো। কিন্তু কে কার কথা! শোনে গোটা নাসের চক্র যেন এদের ফাঁসির দৃশ্য দেখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো।

কিছু পেছনের ঘটনা

বাদশাহ ফারুকের সময়ের কথা।

১৯৪৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর পশ্চিমী দুনিয়া বিশেষ করে বৃটিশদের ইশারায় সর্বপ্রথম ইখওয়ানকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। ইখওয়ানকে বে-আইনী ঘোষণা করার নীলনকশা আঁকা হয় কিন্তু লন্ডনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশরা ওয়াদা করেছিলো, যুদ্ধ শেষে মিসরকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। যুদ্ধ শেষ হবার পর যখন বৃটিশরা স্বাধীনতার প্রশ্নে টালবাহানা শুরু করলো তখন ইখওয়ান এর বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন গড়ে তোলে। অল্প দিনের মধ্যেই ইখওয়ানের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠে গেলো। সদস্য সংখ্যা দাঁড়ালো ২৫ লাখের ওপর। সমর্থক ও কর্মীর সংখ্যা ছিলো আরো বহুগুণ। ইখওয়ানের এ বিপুল পরিমাণ জনপ্রিয়তা দেখেই দেশকে যারা বিদেশী প্রভুদের হাতে বিক্রী করে দিতে চাইলো সে গোষ্ঠী এদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। অতপর লম্পট বাদশাহর লম্পটি উযিরে আযমকে কে বা কারা গুলী করলে এই দোষ চাপানো হলো ইখওয়ানের ঘাড়ে। শুরু হলো ইখওয়ানীদের ওপর চরম নির্যাতনের পালা।

এর কিছুকাল পরে একদিন আলোচনার অজুহাতে ষড়যন্ত্রমূলক এক বৈঠকের আয়োজন করলো কুচক্রীরা। রাস্তার মধ্যেই সরকারী খুনীদের হাতে শহীদ হলেন শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ইখওয়ানের মোর্শেদে আম (কেন্দ্রীয় নেতা) শহীদ হাসানুল বান্না। দিনটি ছিলো ১৯৪৯ সালের ১২ই মার্চ।

১৯৫২ সালের জুলাই মাসে রক্তপাতহীন এক সামরিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এলেন কর্নেল নজীব। ক্ষমতাসীন হয়ে তিনি দুর্নীতিপরায়ণ সামরিক অফিসারদের এক তালিকা প্রণয়ন করলেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই সামরিক অফিসাররা ছিলো দীর্ঘদিন থেকে রাজা ফারুকের সব কয়টি কুকর্মের অংশীদার। এই দুর্নীতিপরায়ণ ও অকর্মা অফিসারদের শীর্ষভাগে যার নাম ছিলো, সেই হলো জামাল আবদুন নাসের। কিভাবে যেন নাসের কর্নেল নজীবের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার খবর জেনে গেলো এবং তার কুকীর্তির সাথীদের নিয়ে এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কর্নেল নজীবকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাতারাতি মিসরের যাবতীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চাবিকাঠি নিজের হাতে নিয়ে নিলো। ক্ষমতায় বসেই নাসের তার সামনে প্রধান বাধা হিসেবে দেখতে পেলো ইখওয়ানুল মোসলেমুনকে।

ইতিমধ্যে সুয়েজ খাল নিয়ে ইংরেজদের সাথে নাসের এক চুক্তি স্বাক্ষর করলে ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় কমিটি একে মিসরের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে। এই সময় সাইয়েদ কুতুবের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আল মাজেল্লাতুল ইখওয়ান' পত্রিকা এই চুক্তিকে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করায় জামাল নাসের পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। এবার নাসের তার পশ্চিমী প্রভুদের খুশী করার জন্যে বন্য জন্তুর ন্যায় ইখওয়ানের নিরীহ নেতা ও কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই মিসর হাইকোর্টের খ্যাতনামা বিচারপতি ও ইখওয়ানের প্রবীণ নেতা শহীদ আবদুল কাদের আওদাসহ ৫ জনকে ফাঁসির আদেশ শুনানো হয়।

আসামীর কাঠগড়ায় বিচারক

১৯৫০ সালে বাদশাহ ফারুক যখন ইখওয়ানীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুকুমনামা জারি করলো তখন ইখওয়ানের পক্ষ থেকে দেশের উচ্চ আদালতে এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। বিচারক আবদুল কাদের আওদা ছিলেন সেই আদালতেরই জজ। দীর্ঘদিন পর্যন্ত

ইখওয়ানের পক্ষ থেকে জোরালো যুক্তি শুনে মাননীয় বিচারক ইখওয়ানের পক্ষেই মামলার রায় দিলেন। মামলার কাগজপত্র পড়তে পড়তে এক সময় তিনিই নিজেই ইখওয়ানের ভক্ত হয়ে গেলেন।

পরে যখন সরকার এই রায়কে উচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করলো, তখন জজ আবদুল কাদের চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে উচ্চ আদালতে ইখওয়ানের পক্ষে উকীল হিসেবে মামলা পরিচালনা করেন এবং তিনি জয়লাভও করেন। এবার আর তার ইখওয়ানের সাথে সাংগঠনিকভাবে একাত্ম হতে বাধা রইলো না। কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি দলের কেন্দ্রীয় সহকারী নেতা (নায়েবে মোর্শেদে আম) নির্বাচিত হয়ে গেলেন।

যেদিন নাসেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার অভিযোগে তাকে কারারুদ্ধ ও পরে বিচার বিভাগীয় নাটকের মাধ্যমে ফাঁসির আদেশ শুনানো হলো সেদিন তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার কাছে এটা কোনো বিষয়ই নয় যে আমি কোথায় মরতে যাচ্ছি এবং কিভাবে যালেমরা আমার মৃত্যুদন্ড দেবে। আমি তো এতেই সন্তুষ্ট যে আমি আল্লাহ তায়ালার একজন অনুগত বান্দা হিসেবে শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে যাচ্ছি।'

শহীদ সাইয়েদ কুতুবকেও যেদিন দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করা হলো তখন তিনিও যালেমের মতিগতি দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাকেও এবার শাহাদাতের দরজায় পা দিতে হবে, তাই তিনিও একই ভাষায় বলেছিলেন, 'আমি আমার মৃত্যুর জন্যে দুঃখিত নই, এতে আমার কোনো আক্ষেপও নেই বরং আমি তো সন্তুষ্ট যে, তাঁর পথেই আমার প্রাণ যাচ্ছে।'

ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গোটা পরিবার

তার ছোট ভাই মোহাম্মদ কুতুবকে (যিনি বহু মূল্যবান ইসলামী সাহিত্যের লেখক) এতো অত্যাচার করা হয় যে, তার চোখে মুখে তাকালে তাকে চিনতে কষ্ট হতো। তার আপন দু'বোন হামিদা কুতুবকে দশ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয় এবং আমিনা কুতুবকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঘরে নযরবন্দী করে রাখা হয়। ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে শহীদ কুতুবের ভাগিনা মাত্র ২৫ বছর বয়সের তরুণ ইঞ্জিনিয়ার রাফাত বকর আশ শাফেয়ীকে অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে বাধ্য করা হচ্ছিলো আদালতে দাঁড়িয়ে মামার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে। কিন্তু এই মর্দে মোজাহেদ রাযি হননি বিধায় তাঁর ওপর অত্যাচারের মাত্রা এতো বাড়িয়ে দেয়া হয় যে, তিনি কারার চার দেয়ালের ভেতরই শাহাদাত বরণ করেন।

শাহাদাতের মর্যাদা দানকারী সে অমর পুস্তক

আদালতের নাটকীয় প্রহসনে যে বই-এর ওপর কর্তৃপক্ষ অভিযোগ এনেছে তা হচ্ছে সাইয়েদ কুতুবের সেই বিখ্যাত বই 'মায়ালেম ফিত তারীক'। (পথের মাইল ফলক) মোট ১৩টি অধ্যায়ে সমাপ্ত এই বই-এর ৪টি অধ্যায়ই উদ্ধৃত করা হয়েছে শহীদের খ্যাতনামা তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' থেকে। কোনো অলস ও দুর্বল মনের মানুষকে ইসলামের প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তোলার ব্যাপারে এই বইয়ের সত্যিই কোনো জুড়ি নেই। ইতিমধ্যেই পৃথিবীর বহু ভাষায় এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

তার রচিত গ্রন্থের তালিকা অনেক বড়ো

শহীদ সাইয়েদ কুতুব সাহিত্য সংস্কৃতির ময়দানে ইসলামী মূল্যবোধের ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত লোকদের ইসলামের ছায়াতলে আনার জন্যে বহু মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছেন। তার রচনাবলীর মধ্যে 'ফী যিলালিল কোরআন' নিসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ

স্থান দখল করে আছে। শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মূল্যবান তাফসীর লিখে তিনি ইতিহাসের পাতায় সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

তার বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের মধ্যে একাধিক উপন্যাস রয়েছে, বেশ কয়টি জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যও রয়েছে। তেফলে মিনাল ক্বারিয়া (গ্রামের ছেলে), মদীনাতুল মাসহুর (যাদু নগরী), মাশাহেদুল কেয়ামাহ ফিল কোরআন (কোরআনে পেশ করা কেয়ামতের দৃশ্যসমূহ), আত্ তাসওয়ীরুল ফান্নি ফিল কোরআন, (কোরআনে শিল্পগত ছবি), আল আদালাতুল এজতেমায়ীয়াতু ফিল ইসলাম (ইসলামে সামাজিক সুবিচার), মা'রেকাতুল ইসলাম ওয়ার রেসমালিয়াহ (ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব) আস সালামুল আলামে ওয়াল ইসলাম (ইসলাম ও বিশ্বশান্তি), দেরাসাতুল ইসলামিয়াহ (ইসলামী রচনাবলী), আন নাকদুল আদাবে-উসুলুহ ও মানাহেজুহ (সাহিত্য সমালোচনার মূলনীতি ও পদ্ধতি), আন নাকদু লে কেতাবে মুসতাকবেলেস সাকাফাহ (ভবিষ্যতের সংস্কৃতি শীর্ষক একটি পুস্তকের সমালোচনা), কেতাবুন ও শাখছিয়াতুন (গ্রন্থ ও ব্যক্তিত্ব), নাহজু মুজতামেয়ুল ইসলামী (ইসলামী সমাজের দৃশ্য) আমরিকা আল লাতি রা'আইতু, (আমার দেখা আমেরিকা), আল আতইয়াফুল আরবা (চারজনের চিন্তাধারা)।

সর্বশেষে রয়েছে তাঁর সেই মহা বিপ্লবের গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক' (পথ চলার নির্দেশনাসমূহ)। এই গ্রন্থের মাঝেই শহীদ কুতুব দেশ, জাতি নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মুসনলমানকে আহ্বান জানিয়েছেন নিজেদের ঘাড় থেকে জাহেলিয়াতের সব ধরনের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিতে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্যে আল কোরআনের ঝান্ডা হাতে নিয়ে যালেমদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে। সমস্ত যালেম মোনাফেক শাসকদের উৎখাত করে তার স্থলে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ তায়ালার দ্বীন কায়েমের জেহাদে শরীক হতে তাদের ডাক দিয়েছেন। (এই বইতে সাইয়েদ কুতুব যে ভূমিকা লিখেছেন, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র' নামে আমরা তা এখানে পেশ করেছি)

কোন্ পরিবারে এ সোনার মানুষ

মায়ের নাম ফাতেমা হোসাইন ওসমান, পিতার নাম হাজী ইব্রাহীম কুতুব। তার নিজের সম্মানিত নাম সাইয়েদ, কুতুব বংশীয় উপাধি। ১৯০৬ সালে মিসরের উসউত জেলার প্রাচীন পল্লী-মুশায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার দাদার আমলে এই বংশের লোকেরা আরব উপদ্বীপ থেকে এসে মিসরের উত্তরাঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, তার পূর্বপুরুষরা ছিলেন হিন্দুস্থানের অধিবাসী, অবশ্য এব্যাপারে বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রমাণ আমাদের নযরে পড়েনি। পরিবারের সদস্য সংখ্যা সর্বমোট ৫ জন। মিসরের মাটিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে গোটা পরিবারটাই ছিলো এক ইস্পাত কঠিন ঘাঁটি। তার ছোট ভাই মোহাম্মদ কুতুব নিজেও ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা, বোন হামিদা ও আমিনা দু'জনই যালেমদের কারাগারে বহু অত্যাচার সয়ে এক সময় খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছেন।

শৈশবেই মায়ের ইচ্ছানুযায়ী তিনি কোরআন শরীফ মুখস্থ করেন গ্রামের মাকতাবে। পরে পিতার সান্নিধ্যে চলে আসেন কায়রো শহরের উপকণ্ঠে-হুলওয়ান নামক স্থানে। সেখানে তিনি তাজহিযিয়াত দারুল উলুম মাদ্রাসায় পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯২৯ সালে সেখানকার পড়া শেষ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি মাদ্রাসা দারুল উলুম কায়রো থেকে বিএ ডিগ্রী হাসিল করে আপন যোগ্যতার বলে সেখানেই অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন।

কিছুকাল পর তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কুল ইন্সপেক্টর হিসেবে নিয়োগপত্র পান। একপর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্যে তাকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। দু'বছর ধরে আধুনিক পৃথিবীর পাপের দেশে বাস করার সময় তিনি সচক্ষে দেখলেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতায় ধস নেমেছে। এই সর্বগ্রাসী ধস রুখতে হলে মানবজাতিকে পুনরায় আল্লাহ তায়ালার কেতাবের দিকে ফিরে না এসে কোনো উপায় নেই, এই পরিপক্ক ঈমান নিয়েই তিনি ১৯৪৫ সালে শহীদ হাসানুল বান্নার জেহাদী কাফেলা ইখওয়ানুল মোসলেমুনে যোগদান করেন।

নিজের যোগ্যতা ও অসামান্য প্রতিভার বলে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। সাইয়েদ ছিলেন একজন মহান শিক্ষাবিদ। সাহিত্য সংস্কৃতি তথা জ্ঞানের জগতে বিপ্লব সৃষ্টির ওপরই তিনি বেশী জোর দিয়েছিলেন। জ্ঞানের জগতে পা দিয়ে তিনি লিখতে শুরু করলেন 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর মতো এক অমূল্য তাফসীর গ্রন্থ। এর মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষকে তিনি ডাক দিলেন, জাহেলিয়াতের বাধা-বিপত্তির বাঁধ ভেঙ্গে এসো আমরা সবাই আশ্রয় নেই 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা কোরআনের সুনিবিড় ছায়াতলে।

মানব জাতির গোটা ইতিহাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, এই ডাক যিনিই দিয়েছেন তাকেই যালেমরা হয় কারার অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করেছে, না হয় তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ইতিহাসের এ অমোঘ ভাগ্য থেকে কেউই মাহরূম হয়নি, কিন্তু যালেমরা কখনোই মযলুম মোজাহেদদের মনোবল ভাংতে পারেনি। এই দীর্ঘ ইতিহাসের কোথাও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাওয়া যাবে না যেখানে সংগ্রামী নবী রসূল, সাহাবী ও তাদের অনুসারীরা যালেমদের কাছে ক্ষমার আবেদন জানিয়ে নিজেদের জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের এই ধারায় শহীদ কুতুব ছিলেন এক দুর্লভ ব্যক্তিসত্তার অধিকারী।

১৯৫৫ সালে যখন আদালতের প্রহসন করে তাকে নাসের সরকার ১৫ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করলো তখন তিনি দন্ডাদেশ শুনে শুধু মন্তব্য করলেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন (অবশ্যই আমরা আল্লাহ তায়ালার জন্যে এবং আমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে)। পরে নাসের সরকার তার কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব পেশ করে বললো, তিনি যদি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তাহলে তার দন্ডাদেশ লঘু করে দেয়া হবে। সাইয়েদ কুতুব এ হাস্যকর প্রস্তাব শুনে মন্তব্য করলেন, 'যালেমের পক্ষ থেকে এই ধরনের হীন প্রস্তাবে আমি ঘৃণা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তায়ালার কসম, যদি 'ক্ষমা' শব্দটি আমাকে নাসেরের ফাঁসির কাষ্ঠ থেকেও বাঁচাতে পারে তবু আমার জীবন থাকতে আমি যালেমের কাছে ক্ষমা চাইবো না। আমি আমার মালিকের দরবারে এমনভাবে হাযির হতে চাই, যেখানে আমি তাঁর ওপর সন্তুষ্ট থাকবো এবং তিনিও আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন।' (রচনাঃ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ)

তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের ভূমিকা

কোরআনের ছায়াতলে

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আমার জীবনের কতিপয় পবিত্র দিবারাত্রি, যা কোরআনের অধ্যয়নে অতিবাহিত হয়েছে–

'কোরআনের ছায়াতলে' জীবন অতিবাহিত করা, তার অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং আল্লাহ তায়ালার এই শেষ কেতাব অনুধাবনের চেষ্টায় লেগে থাকা এমন মহামূল্যবান সৌভাগ্যের ব্যাপার, যার অনুধাবন শুধু তিনিই করতে পারেন, যিনি তার সময়গুলোকে কোরআন বোঝার কাজে লাগিয়ে রেখেছেন এবং কোরআনের পথে চলে নিজের জীবনকে পূত ও পবিত্র করে নিতে পেরেছেন।'

আমি আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, যিনি আমাকে এই মহান কাজের তওফীক দান করেছেন। আমি এই কোরআন অধ্যয়নে নিজের সময় ব্যয় করে এমন একটি মূল্যবান সম্পদ হাসিল করতে পেরেছি, যার মূল্য ও মর্যাদার কোনো ধারণা ও পরিমাপ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার মতো অধম ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তায়ালার এ ছিলো এক বিরাট অনুগ্রহ। আমি যখন কোরআনের ওপর চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছি তখন তিনি আমার জন্যে রহমতের সব কয়টি দরজাই খুলে দিয়েছেন এবং আমাকে কোরআনের 'রূহের' এতো নিকটবর্তী করে দিয়েছেন, মনে হয় যেন কোরআন নিজেই বুঝি আমার ওপর তার সত্যসমূহ খুলে খুলে বর্ণনা করছে।

কোরআনুল কারীম অধ্যয়নের সময় আমার মনে হয়েছে যেন আমি মর্ত্যলোক থেকে অনেক ওপরে উঠে গেছি, আর এই ওপর থেকে আমি নিচের পৃথিবীর দিকে আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি, আর অবলোকন করছি জাহেলিয়াত যেন এক প্রলয়ংকরী ও সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে সমগ্র দুনিয়ার ওপর ছেয়ে আছে। আর এই জাহেলিয়াতে মাতোয়ারা মানুষগুলো যেন নিজ নিজ অন্ধকার আবেষ্টনীতে আটকা পড়ে আছে এবং এমন এক গভীর খাদের ভেতর চাপা পড়ে আছে যে, তাদের কর্ণকুহরে এই আসমানী ডাক পৌঁছুতে পারছে না। সমগ্র মানবতা যেন পাগলের ন্যায় নেশাগ্রস্ত হয়ে জাহেলিয়াতে ডুবে আছে এবং জাহেলিয়াতের কর্মতৎপরতায় তারা সবাই আনন্দে আত্মহারা, যেমন এক শিশু তার খেলনাসমূহ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

এই দৃশ্য থেকে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ি এবং ভাবতে থাকি, কোরআনের উপস্থাপিত পূর্ণাংগ স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন জীবনাদর্শকে দেখেও মানবতা কেন জাহেলিয়াতের এই দুর্গন্ধময় স্থানের দিকে ধাবিত হচ্ছে? এই অধপতনের দিকে তারা কেন নিমজ্জিত হচ্ছে এবং অন্ধকারের আবেষ্টনীতে তারা কেন ঘুরপাক খাচ্ছে, যেখানে কোরআন তাদের পরিচ্ছন্ন জীবনের দাওয়াত দিচ্ছে, জীবনের উচ্চতর স্থানের দিকে বারবার ডাক দিচ্ছে, চীৎকার দিয়ে তাদের ডাকছে, 'এসো, হে মানুষরা। আমি তোমাদের অন্ধকারের অতল থেকে বের করে আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে নিয়ে আসি।'

কোরআন অধ্যয়নকালে আমি একথা অনুধাবন করেছি যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে জীবন কাঠামো ও জীবন বিধান নির্ধারণ করেছেন তার সাথে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট-এই কায়েনাতের একটা গভীর মিল রয়েছে এবং এর সর্বত্র একটা সামঞ্জস্য বিরাজ করছে।

অতপর এটা আমি অনুধাবন করেছি যে, মানবতার বিপর্যয়ের মূল কারণ হচ্ছে সামঞ্জশীল এই প্রাকৃতিক নিয়মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করা, অপর কথায় এই নীতিমালার সাথে সংঘর্ষ বাঁধানো। মূলত শয়তান মানব জাতিকে এমন এক জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিয়েছে যেখানে 'আফসোস' ছাড়া আর কোনো উপায়ই তার জন্যে বাকী থাকেনি। কোরআন অধ্যয়নের সময় আমি এ কথাটা খুব ভাল করে জেনে নিয়েছি যে, এই বিশ্বজগতের ব্যাপকতা অসীম এবং অদৃশ্যমান বিশ্ব এই দৃশ্যমান বিশ্বের চেয়ে অনেক ব্যাপক।

মানবীয় জীবন এই বৈষয়িক দুনিয়ার রাস্তা ধরে আখেরাতের অসীম ব্যাপকতার দিকে ধাবিত হয়। মৃত্যু কোনো শুরুর শেষ নয়-বরং তা হচ্ছে এক অন্তিম যাত্রার সূচনা মাত্র। দুনিয়া ও আখেরাতের দীর্ঘ দূরত্বের ওপর বিস্তৃত হয়ে আছে মানুষের এই জীবন। এই জীবনে মানুষ যা কিছুই অর্জন করুক না কেন, শুধু সেটুকুই নয়-আরো অনেক কিছুই তার জন্যে রয়েছে। কোনো মানুষ এই দুনিয়ায় স্বীয় কর্মকান্ডের দন্ড থেকে বাঁচতে পারলেও ওখানে তার মুক্তি নেই। কারণ সেখানে কোনো যুলুম নেই, কিছুর অভাব নেই, কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। এই দুনিয়ায় একজন মোমেনের জীবন বিশ্ব চরাচরের সবকিছুর সাথেই সামঞ্জস্যশীল। মোমেন ব্যক্তি নিজেও আল্লাহ তায়ালার দিকে নিবিষ্ট এবং সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিও আল্লাহ তায়ালার হুকুমের দিকে নিবিষ্ট, তাঁর হুকুমের সামনে সেজদারত।

'আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝে যতো কিছু রয়েছে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়-সবকিছুই তাঁর সামনে মাথানত করছে এবং তাঁরই আশ্রয়তলে সবাই সকাল সন্ধ্যা অবনত মস্তকে নিমগ্ন আছে।' (সূরা আর রা'দ-১৫)

'এই সাত আসমান ও যমীনে এবং তার মধ্যে যতো সৃষ্ট জীব রয়েছে সবাই তাঁর গুণ গায়। এই সমগ্র সৃষ্টিকূলের মাঝে এমন একটি বস্তুও নেই, যা প্রশংসার সাথে তার তাসবীহ আদায় করছে না।' (সূরা বনি ইসরাঈল-৪৪)

আমি কোরআন অধ্যয়নকালে একথা অনুধাবন করেছি যে, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমন এক সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, যার সাথে তারা ইতিপূর্বে কখনো পরিচিত হতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতপর তাতে 'রূহ' দান করে জীবন দিয়েছেন।

'যখন আমি তাকে (মানব আকৃতিতে) ঠিক করে নেবো এবং তাতে আমার 'রূহ' দান করবো তখন তোমরা তার সামনে সেজদাবনত হয়ে পড়বে।' (সূরা আল হেজর-২৯)

এরপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করলেন।

'যখন তোমার মালিক বললেন, আমি যমীনের বুকে আমার একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে যাচ্ছি এবং যা কিছুই এই বিশ্বজগতে রয়েছে তার সবটুকুকেই আমি তোমার অধীনস্থ করে রেখেছি।' (সূরা আল বাকারা-৩০)

আল্লাহ তায়ালা যেহেতু মানব জাতিকে মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত করেছেন এবং নিজস্ব রূহ দিয়ে তার মধ্যে জীবন দান করেছেন তাই এই আল্লাহকেন্দ্রিক বিশ্বাসই মানব জাতিকে একত্রিত

করে রাখার মাধ্যম হিসেবে নির্ধারিত হবে। এই বিশ্বাসই হচ্ছে মোমেনের দেশ, মোমেনের জাতি ও মোমেনের খান্দান। এই কারণেই এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে মোমেন যে কোনো সময়ই একই প্লাটফরমে একত্রিত হতে পারে। মানুষ কোনো জন্তু-জানোয়ারের দল নয় যে, তাদের এক স্থানে একত্রিত করার জন্যে ঘাস কিংবা চারণভূমির ব্যবস্থা করতে হবে। দেশ, জাতি ও তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের স্থান তো সত্যিকার অর্থে মানবতার আসন থেকে অনেক অনেক নিচে।

ইতিহাসের প্রতি স্তরে মোমেনদের খান্দান ছিলো একটাই। সর্বাবস্থায় সে ঈমানী কাফেলায় শামিল থাকবে। যে কাফেলার সর্দার ছিলেন- নূহ (আ.), ইবরাহীম (আ.), ইসমাইল (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.), ইউসুফ (অ.), মূসা (আ.), ঈসা (আ.), ও মোহাম্মদ (স.)।

'এই যে তোমাদের দল, মূলত তা একই দল এবং আমিই তোমাদের মালিক, অতএব তোমরা আমাকেই ভয় করো।' (সূরা আল মোমেনুন- ৫৩)

যখন থেকে মানুষ এই যমীনে পা রেখেছে তখন থেকেই-ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে, যুগের প্রতিটি বিবর্তনে ঈমানদারদের একটা কাফেলা এখানে সতত মওজুদ ছিলো, আর ঈমানদারের এই কাফেলাকে ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি অধ্যায়ে একই ধরনের অবস্থা, একই ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। তাদের সংগ্রাম ছিলো জাহেলিয়াতের সাথে। গোমরাহীর বিরুদ্ধে তারা সর্বদাই আল্লাহদ্রোহিতাকে উচ্ছেদ কাজে তৎপর ছিলেন। তারা সর্বদাই অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। এই কাফেলা কঠিন থেকে কঠিনতর মুহূর্তেও সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে হামেশা এগিয়ে গেছে, সব সময়ই তারা আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, কুফর ও ইসলামের প্রতিটি রণক্ষেত্রে তারা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই সাহায্য প্রার্থনা করেছে।

'এবং যারা কাফের, আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাসী ছিলো, তারা তাদের নবীদের বললো, আমরা হয় তোমাদের এই জনপদ থেকে বের করে দেবো অথবা তোমাদেরকে আমাদের দলে শামিল হতে হবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে ওহী পাঠিয়ে বললেন যে, আমি যালেমদের ধ্বংস করে দেবো এবং অতপর এই যমীনের ওপর তোমাদের আমি 'আবাদ' করাবো। একথা তাদের বেলায় প্রযোজ্য যারা কেয়ামতের দিন আমার সামনে দাঁড়ানোকে এবং আমার আযাবকে ভয় করে।' (সূরা ইবরাহীম- ১৩, ১৪)

কোরআন অধ্যয়নের বিভিন্ন স্তরে আমার অন্তরে এ কথাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এই বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টি কোনো ঘটনাচক্র নয় এবং এমনি এমনি তা সৃষ্টি করা হয়নি বরং আল্লাহ তায়ালা একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই তা তৈরী করেছেন।

'আমি প্রতিটি জিনিসকে সঠিক পরিমাপের ভিত্তিতে বানিয়েছি।' (সূরা আল ক্বামার- ৪৯)

'এবং তিনিই প্রতিটি জিনিসকে তৈরী করেছেন এবং অতপর তার একটি পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।' (সূরা আল ফোরকান- ২)

কিন্তু এসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার হেকমতসমূহ মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়নি।

'এতে ব্যথিত হবার কিছু নেই যে, তোমরা কোনো জিনিসকে হয়তো পছন্দ করছো না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাতে অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।' (সূরা আন নেসা- ১৯)

'এতেও আশ্চর্যন্বিত হবার কিছু নেই যে, কোনো বিষয় তোমাদের ভালো লাগে না, অথচ আল্লাহ তায়ালা তাতে তোমাদের জন্যে মংগল নিহিত রেখেছেন, আবার অন্য একটি জিনিস যা তোমাদের ভালো লাগে অথচ তা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর। এ বিষয়গুলো আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন এবং তোমরা কিছুই জানো না। (সূরা আল বাকারা- ২১৬)

উপায়-উপকরণের ওপর কখনো ফলাফল নির্ভর করে, আবার কখনো করেও না। উপকরণ কখনো কার্যকর হয়, আবার কখনো তা ব্যর্থও হয়ে যায়, আর উপায়-উপকরণ সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার হাতে।

'তোমার তো জানা নেই, হয়তো আল্লাহ তায়ালা অতপর এর কোনো রাস্তা বের করে দেবেন।' (সূরা আত্ তালাক-১০)

'তোমরা কিছুই আশা করতে পারো না-হ্যাঁ আল্লাহ তায়ালার যা মঞ্জুর আছে তা ছাড়া।' (সূরা আত্ তাকওয়ীর ২৯)

মোমেন ব্যক্তি উপায়-উপকরণ এ জন্যেই ব্যবহার করে যে তাকে তা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার বিশ্বাস থাকে যে, এসব কিছুর কাংখিত ফলাফল আল্লাহ তায়ালার হাতেই। মোমেন তাঁর সমস্ত মনোনিবেশ আল্লাহ তায়ালার প্রতিই নিবদ্ধ রাখে। তাঁর হেকমত, জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রতি সে সদা সজাগ থাকে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের ওপর তার প্রগাঢ় আস্থা থাকে। এ কারণেই মোমেন ব্যক্তি সব রকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে দূরে থাকতে পারে।

'শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং তোমাদের অশ্লীল কাজ করতে বলে, (অপর দিকে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন, আল্লাহ তায়ালা বিশাল ব্যাপক ও অনেক প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আল বাকারা-২৬৮)

কোরআনের ছায়াতলে আমি গভীর প্রশান্তিময়, নিশ্চিন্ত ও পবিত্র জীবন কাটিয়েছি। আমি প্রতিটি দিগন্তে আল্লাহ তায়ালার লীলা পর্যবেক্ষণ করেছি এবং জীবনের প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমি তার বহু ধরনের গুণাবলীর বিকাশ পর্যবেক্ষণ করেছি।

'যখন সে তাঁর কাছে দোয়ার হাত ওঠায় তখন, এমন কে আছেন যিনি অস্থির হৃদয়ের আকুতি শ্রবণ করেন, আবার কে এমন আছেন যিনি তাঁর কষ্টসমূহ দূরীভূত করেন।' (সূরা আন নামল ৬২)

'তিনি স্বীয় বান্দাদের ওপর বিপুল ক্ষমতাবান।' (সূরা আল আনয়াম -৬১)

'তিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও সম্যক অবগত।' (সূরা আল আনয়াম-৭৪)

'আল্লাহ তায়ালা নিজ কার্যকলাপের ওপর অসীম ক্ষমতাবান, যদিও অধিকাংশ লোক তা জানে না।' (সূরা ইউসূফ-২১)

'জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার মনের মাঝে প্রাচীর হয়ে থাকেন।' (সূরা আল আনফাল-২৪)

'যা তিনি চান তাই তিনি করেন।' (সূরা আল বুরুজ-১৬)

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে কোনো না কোনো 'পথ' বের করে আনেন এবং তাকে এমন সব স্থান থেকে রেযেক সরবরাহ করেন, যার কোনো ধারণাও সে করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করবে, তিনি নিজেই তার জন্যে যথেষ্ট হবেন এবং তিনি যা করতে চান তা সহজেই সম্পন্ন করে দেন। (সূরা আত্ তালাক ৩)

'এই ভূখন্ডে বিচরণশীল প্রতিটি প্রাণীকেই তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণে ধরে রেখেছেন।' (সূরা হুদ-৫৬)

'আল্লাহ তায়ালা কি তাঁর বান্দাদের জন্যে যথেষ্ট নন? এবং তাঁকে ছাড়া তারা তোমাদের অন্য লোকদের দিয়ে ভয় দেখায়।' (সূরা আঝ ঝুমার-৩৬)

'আল্লাহ তায়ালা যাকে অপদস্থ করেন তাকে সম্মান দান করার কেউ নেই।' (সূরা আল হজ্জ-১৮)

'আল্লাহ তায়ালা যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই।'(সূরা আঝ ঝুমার ২৩)

আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়া জোড়া সবকিছু বানিয়ে একে অন্ধ প্রাকৃতিক নিয়মনীতির ওপর ছেড়ে দিয়ে রাখেননি বরং এখানে সর্বদাই প্রতিটি ক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়ার পেছনে আল্লাহ তায়ালার নিজ ইচ্ছা ও এরাদাই কার্যকর থাকে।

মানুষের চলার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে জীবন বিধান রচনা করেছেন, তা মানবীয় উৎকর্ষের প্রতিটি ধাপে এবং উন্নতির প্রতিটি যুগে সমভাবে উপকারী, মুক্তি ও কল্যাণের ক্ষেত্রে একই ধরনের নিশ্চয়তা বিধানকারী প্রমাণিত হয়েছে। এই জীবন বিধান এমন সব মানুষদের জন্যে যারা এই দুনিয়ায় বসবাস করে, এ কারণেই তাতে তার প্রকৃতি, যোগ্যতা ও ক্ষমতার পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

ইসলাম এই ভূখন্ডে মানুষকে এবং তার ক্রিয়াকান্ডকে কখনো হীন করে দেখে না। ব্যক্তিগত, সামষ্টিক কিংবা কোনোক্ষেত্রেই তার গুরুত্বকে খাটো করে তাকে জন্তু-জানোয়ারের স্তরে নামিয়ে দেয় না। আবার তার ওপর তার যোগ্যতা, প্রতিভা ও ক্ষমতার বাইরে অতিরিক্ত কোনো দায়িত্বও চাপিয়ে দেয় না। ইসলামের মতে মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এতো ঠুনকো নয় যে, মনগড়া কতিপয় দর্শন তৈরী করে তাকে পালটে ফেলা যাবে। মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার প্রদর্শিত 'সেরাতুল মোস্তাকীমে' কদম রাখে তখন মূলত সে তার প্রতিভা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালার বিধি-নিষেধের ওপর চলতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে আল্লাহ তায়ালার পথে সে অগ্রসর হতে থাকে।

তবে ইসলামের এই পথ দীর্ঘ সহজ ও সরল। আল্লাহ তায়ালা এটা চান না যে, মানবীয় প্রকৃতিকে পদদলিত করে তার ওপর আধ্যাত্মিক কর্মের বোঝা চাপিয়ে ইসলামের উদ্দেশ্যসমূহ সিদ্ধ হোক। মানুষের তৈরী নতুন মতবাদগুলো মানুষকে যন্ত্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আদর্শের বাস্তবায়ন দেখে নিতে চায়। এতে যদি দুনিয়ায় রক্তের নদী বয়ে যায়, মানুষের সামাজিক জীবন কাঠামো তছনছ হয়ে যায়, কিংবা তার অতীত ইতিহাসের অর্জিত পাওনাগুলো সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাতেও কিছু আসে যায় না।

ইসলাম তো মানুষের প্রকৃতির সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে মিলে মিশে উন্নতির পথে কদম রাখতে চায়। দরকার মতো তাকে পথ প্রদর্শন করে অগ্রসর হতে চায়। এই প্রকৃতি যখন কল্যাণের দিকে পা বাড়ায় তখন ইসলাম তাকে আশ্রয় দেয়। আবার যখন অকল্যাণের দিকে ধাবিত হয় তখন এই প্রবণতা থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখে। ইসলাম প্রকৃতিকে পদদলিত করে অগ্রসর হতে চায় না বরং বুদ্ধিমত্তা ও হেকমতের সাথে প্রয়োজনে তাকে চলার পথ দেখায় এবং তাকে সাথে নিয়েই চলতে চায়। এই উন্নতির শীর্ষে পৌছানোর জন্যে এক যুগ, দু'যুগ সময়ও লাগতে পারে, আবার এই উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্যে বহু শতাব্দীরও প্রয়োজন হতে পারে।

ইসলামের উদাহরণ হচ্ছে একটি ছোট চারা গাছের মতো। একটি ছোট বীজ থেকে যার উদ্ভব, আস্তে আস্তে তা বড়ো হয় আবহাওয়ার বিবর্তনে ঝড়ঝঞ্ঝা ও দমকা হাওয়ার মোকাবেলা করে এক দীর্ঘ সময় পরে তা শক্ত বৃক্ষে পরিণত হয়। এই গাছ যিনি লাগিয়েছেন তিনি অধিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন, জ্ঞানী ও সর্বদ্রষ্টা। তিনি ভালো করেই জানেন একদিন না একদিন এই চারাগাছ বৃক্ষে পরিণত হবে। প্রাকৃতিক উৎস থেকে তাকে তার আহার পরিবেশন করা হবে এবং আস্তে আস্তে তা বড়ো হবে। আবহাওয়ার পরিবর্তন ও ঝড় তুফানে তা দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা যে প্রাকৃতিক নিয়মনীতির ওপর মানুষকে তৈরী করেছেন তাকে পদদলিত করে জোর করে চাপিয়ে দেয়া একটা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করলে তার ফলাফল হয়তো তাড়াতাড়িই দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু তেমন কিছু করার আল্লাহ তায়ালার কোনোই প্রয়োজন নেই।

'এবং তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিয়মনীতিতে কখনো কোনো রদবদল দেখতে পাবে না।' (সূরা আল আহযাব-৬২)

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে জীবন বিধান ও বিশ্বচরাচরের জন্যে যে নিয়ম নীতি নির্ধারণ করেছেন তার মূল ও একমাত্র বুনিয়াদ হচ্ছে 'হক'। কেননা প্রতিটি জিনিসই আপন অস্তিত্বের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে ঋণী এবং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন 'হক'।

'এটি এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব সত্য ও সঠিক, আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদের ডাকে তারা মিথ্যা এবং আল্লাহ তায়ালা মহান, মর্যাদাবান ও সর্বশ্রেষ্ঠ।' (সূরা লোকমান-৩০)

'আল্লাহ তায়ালা একে 'হক' ছাড়া আর কিছু দিয়েই তৈরী করেননি।'

'হে পরোয়ারদেগার, তুমি এই সৃষ্টিকূলকে নিরর্থক তৈরী করোনি, তুমি পবিত্র।' (সূরা আলে ইমরান-১৯১)

মোটকথা, এই বিশ্বজগতের মূল কথা হচ্ছে এই 'হক'। যখনি সৃষ্টি এই মৌলিক 'হক' থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে তখনই তার মেরুদন্ড ভেংগে পড়বে।

যদি 'হক' তাদের ইচ্ছাসমূহের আনুগত্য করে তাহলে আসমানসমূহ ও যমীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়ে যাবে। এই কারণেই 'হক'কে ফলে ফুলে সুশোভিত হতে হবে এবং বাতিলকে মিটিয়ে যেতে হবে।

'আমি বরং সত্যকে মিথ্যার ওপর নিক্ষেপ করি সত্য তখন মিথ্যার মাথা কেটে ফেলে এবং মিথ্যা মিটে যায়।' (সূরা আল আম্বিয়া-১৮)

'তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি নাযিল করেছেন, তারপর তা থেকে নদী-নালাসমূহ নিজেদের পাত্র মোতাবেক পানি গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে। এরপর এই নদী-নালায় প্লাবন এলো, ফলে পানির উপরিভাগে কিছু ফেনাও সৃষ্টি হলো। অলংকারাদি বানাবার কালে মূল ধাতু আগুনে গলাবার সময়ও একই ধরনের ফেনা তাতে জেগে ওঠে। এই উপমা পেশ করে আল্লাহ তায়ালা হক ও বাতিলের ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করে তোলেন।' (সূরা আর রাদ-১৭)

(নদীনালা ও গলিত ধাতুর বেলায় যা সত্য) তেমনি যা ফেনা হয়ে উড়ে যায় আর যা মানুষের জন্যে কল্যাণকর তাই শুধু যমীনে অবশিষ্ট থেকে যায়।

'তোমরা কি দেখোনি যে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কালামসমূহের কি ধরনের উপমা পেশ করেছেন। তা যেন একটি মূল্যবান ও পবিত্র বৃক্ষ, যার ভিত্তি অত্যন্ত মযবুত ও শাখা প্রশাখা আসমানসমূহে বিস্তৃত। নিজ মালিকের আদেশে তা সর্বদাই ফলমূল সরবরাহ করে যাচ্ছে। আল্লাহ

তায়ালা মানুষের জন্যে উদাহরণ পেশ করেন। যেন তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। অপবিত্র কথাসমূহের উদাহরণ হচ্ছে একটি বৃক্ষের মতো যাকে যমীনের উপরিভাগ থেকে উপড়ে ফেলা হয়। যমীনের ওপর তার কোনোই স্থায়িত্ব নেই। আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সঠিক ও পরিশুদ্ধ কথাসমূহের দ্বারা দুনিয়ার জীবনেও তাদের দৃঢ়ভাবে রাখেন এবং আখেরাতের জীবনেও তাদের তিনি সেভাবেই রাখবেন। আল্লাহ তায়ালা না ইনসাফ লোকদের পথভ্রষ্ট করে দেন এবং তিনি যা চান তা-ই করেন। (সূরা ইবরাহীম ৩৪-৩৭)

মোটকথা, ইসলামী জীবনাদর্শ মানুষকে যেমনি প্রশান্তি, স্থিরতা ও সত্যনিষ্ঠ আস্থা প্রদান করে তা অন্য কোনো জীবনাদর্শের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়।

আমি কোরআন অধ্যয়ন কালে এ বিষয়টি গভীরভাবে বুঝতে পেরেছি এবং এ বিষয়ের ওপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, দুনিয়ার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, মানবতা কোনোরকম শান্তি পেতেই পারে না, তার ভাগ্যে কোনোরকম মানসিক শান্তিই জুটতে পারে না, কোনো ব্যক্তিই উচ্চতা, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পেতে পারে না, সর্বোপরি মানব জাতি কখনো বিশ্বচরাচরের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও আসমানী নীতিমালা ও বিধি-নিষেধের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না–যতক্ষণ পর্যন্ত সে মানুষ আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত না হবে। আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত হবার একমাত্র পন্থা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত জীবন ব্যবস্থাকে মানুষ সর্বাংশে গ্রহণ করবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কেতাব ও তাঁর রসূল (স.)–এর সুন্নতের কাছ থেকে পথের দিশা নেবে, এই পন্থা ছাড়া আর সবকিছুই এক একটা ভাংগন-বিপর্যয়, অপবিত্রতা তথা জাহেলিয়াত।

'অতপর যদি এরা তোমার কথা না মেনে নেয়, তাহলে জেনে রাখো যে, এরা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির দাসত্বই করে বেড়ায়। তার চেয়ে গোমরাহ ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহ তায়ালার হেদায়াতকে উপেক্ষা করে নিজস্ব মনোবৃত্তির আনুগত্য করে। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যালেম লোকদের পথ দেখান না।' (সূরা আল কাসাস-৫০)

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার কেতাবকে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী বানানো এমন কোনো কথা নয় যে, মন চাইলো তা মানলাম আবার মনে চাইলো–না বলে তা উপেক্ষা করলাম বরং এর ওপরই ঈমানের সমগ্র ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত।

'কোনো মোমেন পুরুষ কিংবা নারীর এ অধিকার নেই যে, যখন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল (স.) কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন, তা গ্রহণ না করে তাতে নিজেদের কোনোরকম অধিকার খাটাবে।' (সূরা আল আহযাব-৩৬)

'অতপর আমি তোমাদের দ্বীনের সঠিক পথে বসিয়ে দিয়েছি, তোমরা এই পথই অনুসরণ করো। অজ্ঞ ও জাহেল ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর চলো না। এরা সেদিন আল্লাহ তায়ালার সামনে তোমাদের কোনো কাজেই আসবে না। যালেমরা একে অন্যের বন্ধুই হয়ে থাকে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই শুধু পরহেযগারদের একমাত্র বন্ধু।' (সূরা আল জাসিয়া-১৮-১৯)

এ ব্যাপারটা খুব সামান্য ও সহজ কিছু নয়, গোটা মানবজাতির সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সাথে রয়েছে এর সম্পর্ক। আল্লাহ তায়ালা ইসলামী জীবন পদ্ধতির মাঝেই মানুষের সব ধরনের দুঃখ মুসীবত ও জ্বালা– যন্ত্রণার সমাধান পেশ করেন।

'আমি কোরআনের মাধ্যমে সেসব কিছু নাযিল করি যা মোমেনদের জন্যে শেফা ও রহমত।' (সূরা বনী ইসরাঈল-৮৩)

'এই কোরআন সে রাস্তাই দেখায় যা সবচেয়ে সহজ।' (সূরা বনি ইসরাইল-৯০)

আজ মানব জাতির দুর্ভাগ্য ও বদনসীবীর মূল কারণ হচ্ছে, তারা আজ তাদের জীবনের সব কার্যকলাপ বিশ্ব স্রষ্টার দিকে ধাবিত হয় না। যতোদিন পর্যন্ত তারা আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট না হবে ততোদিন পর্যন্ত তারা এভাবেই দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে এবং এভাবেই তারা দুর্ভাগ্যের শিকার হতে থাকবে। ইসলামকে উপেক্ষা করা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা, মানব জাতির ইতিহাসের এমন ভয়াবহতম দুর্ঘটনা, যা গোটা মানব ইতিহাসে দ্বিতীয়বার ঘটেনি।

ইসলাম এমন এক সময় এসেছে যখন সমগ্র মানবজাতি জাহেলিয়াতের অন্ধকারে ঠোকর খাচ্ছিলো। গোটা জনপদ দুর্নীতি ও কদাচারে ভরে উঠেছিলো, পাপে সমগ্র দুনিয়া ছেয়ে গিয়েছিলো। এমন সময় ইসলাম এসে মানুষদের এক নতুন জীবন দান করলো। সর্বোপরি মানুষকে পেশ করলো আল্লাহর আখেরী কেতাব আল কোরআন–যা মানুষকে তার জীবন ও চারদিকের বিশ্ব সম্পর্কে নতুন এক মূল্যবোধের শিক্ষা দিলো।

জীবন ধারণের এই নতুন পদ্ধতিকে সমাজে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করে সে দেখিয়ে দিলো। যখন এই নতুন ব্যবস্থা তার সঠিকরূপ নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তাতে এমন ধরনের পবিত্রতা, এমন ধরনে সহজ সরলতা, এমন ধরনের জ্ঞানের ব্যাপকতা, এমন ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও সাম স্যতার বিকাশ ঘটলো, যা সমাজে প্রতিষ্ঠা করে দেখানো তো দূরের কথা–মানুষের জ্ঞান প্রতিভা এমন কিছুর কল্পনাও করতে পারেনি।

অতপর মানুষের দুর্ভাগ্য তাকে আস্তে আস্তে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলো। জাহেলিয়াত বারবার তার লেবাস বদল করে মানুষের ওপর সওয়ার হয়ে পড়লো। তাই ধোঁকা ও প্রতারণায় অভ্যস্ত এই নব্য জাহেলিয়াতের লোকেরা বললো, 'বৈষয়িক উন্নতি ও ইসলাম' এর যে কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে। কারণ, এদের উভয়ের রাস্তা নাকি আলাদা ও পরস্পরের সাথে সাংঘর্ষিক। এটা এতো বড়ো ধোঁকা যে, তার তুলনা সম্ভবত মানব জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাস্তব কথা হচ্ছে, ইসলাম বৈষয়িক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার শত্রু নয়, বরং ইসলাম মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভার উৎকর্ষ সাধন করেছে এবং তাকে পূর্ণাংগ পথ প্রদর্শন করেছে। ইসলাম তো মানুষকে দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠিয়েছে। এই বিশ্ব চরাচরের সমস্ত গুপ্ত শক্তিসমূহকে তাঁর হাতে ন্যস্ত করে এদের তাঁর অনুগত বানিয়ে দিয়েছে। অবশ্য একটাই শর্ত তাতে জুড়ে দেয়া হয়েছে এবং তা হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর প্রদর্শিত 'সেরাতুল মোস্তাকীম' অনুযায়ী কাটাতে হবে, আর তার জীবনের সমগ্র কর্মসূচী আল্লাহ তায়ালার নির্বাচিত হেদায়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। যদি এমন হয় তাহলে মানুষের প্রতিটি কাজই আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর এবাদাতের শামিল।

সমাজে এমন কিছু সরল প্রকৃতির লোক আছে যাদের নিয়তে কোনো খুঁত না থাকলেও তাদের জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব থাকে। এরা মনে করেন মানুষের ঈমানী মূল্যবোধ আলাদা বস্তু এবং তাদের বৈয়ষিক উন্নতি উৎকর্ষ ও প্রাকৃতিক নিয়ম নীতি আলাদা বস্তু। 'প্রাকৃতিক নিয়মনীতি আমাদের ওপর সব সময়ই তার প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তার প্রভাব সৃষ্টিতে ঈমান থাকা না থাকায় তেমন কোনো তারতম্য সৃষ্টি হয় না'–এমন মনে করা মোটেই ঠিক নয়। এরা আল্লাহর বিধি-বিধান ও

আইন-কানুনের দু'টি বিভাগকে আলাদা আলাদা ভেবে নিয়েছে। মূলত ব্যাপারটা তা নয়, প্রাকৃতিক বিধি-বিধান যেমনি আল্লাহর আইনমালার অংশ তেমনি ঈমানী মূল্যবোধও তাঁর কানুনের একটি অংশ। এই উভয়বিধ আইনের ফলাফল পরস্পর সম্পৃক্ত ও একক। এটাই হচ্ছে সঠিক ধারণা। আল্লাহ তায়ালা একথাই কোরআনে পেশ করেছেন,

'যদি আহলে কেতাবের লোকেরা ঈমান আনতো এবং পরহেযগার হতো, তাহলে আমি তাদের গুনাহ-খাতা মিটিয়ে দিতাম এবং তাদের জান্নাতের সুন্দরতম বাগানসমূহে প্রবেশ করিয়ে দিতাম। যদি তাওরাত, ইঞ্জিল ও তাদের ওপর নাযিল করা অন্যান্য কেতাবের ওপর তারা ঈমান আনতো তাহলে তাদের ওপর আল্লাহর করুণা এভাবে বর্ষিত হতো যেন তারা ওপর থেকেও খেতে পারতো আবার নিচ থেকেও ভোগ করতে পারতো।' (সূরা আল মায়েদা- ৬৫-৬৬)

'আমি অতপর তাদের বললাম, আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা চাও, তিনি মহান ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর থেকে পানি বর্ষণ করবেন এবং সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদের তিনি বিভিন্ন ধরনের বাগান দান করবেন, সেখানে আবার তোমাদের জন্যে ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করবেন।' (সূরা নূহ)

'আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতির ওপর অর্পিত নেয়ামতকে কখনো বদলে দেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে।' (সূরা আর রা'দ -১১)

আল্লাহর ওপর ঈমান, তাঁর এবাদাত ও তাঁর যমীনে তাঁরই আইনের প্রতিষ্ঠা মূলত তাঁর নীতিমালার চূড়ান্ত পূর্ণতার নাম। এরই এক অংশের নাম হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম নীতি। এমন অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় যে, মানুষ ঈমানী মূল্যবোধের কোনো পারোয়া না করে শুধু প্রাকৃতিক আইনেরই গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং তাতে সফলকামও হয়ে যায়। ঈমানী মূল্যবোধকে উপেক্ষা করার বাহ্যিক পরিণাম তেমন একটা দেখা যায় না। যদিও শুরুর দিকে এই পরিণামের বহিপ্রকাশ অনুভূত হয় না কিন্তু পরবর্তী কোনো যুগে কিংবা কোনো পর্যায়ে এসে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখা যাবেই।

ইসলামী সমাজ তখনি উন্নতির শিখরে উপনীত হতে পেরেছে যখন মুসলমানরা একই সময় ইসলামী মূল্যবোধ ও মানবীয় গুণাবলীতে নিজেদের সাজাতে পেরেছে, যতোই এই উভয়ের মাঝে দূরত্ব বিস্তৃত হতে থাকলো ততোই তাদের অধপতন বাড়তে লাগলো, আর যখন তারা এই উভয়টাকেই ভুলে গেলো তখন তারা অধপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নেমে গেলো।

ইসলামী সমাজের পাশাপাশি আধুনিক সভ্যতার কথা চিন্তা করা যায়। এর উদাহরণ হচ্ছে, এমন একটি পাখীর ন্যায় যার একটি পাখা কেটে দেয়া হয়েছে। একটি পাখার ওপর ভিত্তি করেই সে এখন শূন্যে ঝুলে আছে, ঠিক এভাবেই আজ আধুনিক সভ্যতা যে পরিমাণ বৈষয়িক উন্নতি অর্জন করতে পারলো সেই পরিমাণ নৈতিক অবক্ষয়ে নিমজ্জিত হলো। যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহর দিকে ধাবিত না হবে ততেক্ষণ পর্যন্ত তারা এই ধ্বংস থেকে মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পাবে না।

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্যে যে আইন নির্ধারণ করেছেন তা সেই সামগ্রিক আইনেরই অংশ বিশেষ যা তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য বানিয়েছেন। এই শরীয়তের অনুসরণই মানব প্রকৃতিকে গোটা বিশ্বের নিয়মনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে দেয়, আর এই শরীয়ত তথা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ঈমানের উপস্থিতি এবং একটি ইসলামী সমাজের উপস্থিতি একান্ত জরুরী। এর

সাথে সাথে 'শরীয়াতে এলাহীর' পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্যে জরুরী হলো তাকওয়া, পরহেযগারী ও দৃঢ়তার সাথে কাজ চালিয়ে রাখা। এটাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা যার মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলী ও ইসলামী মূল্যবোধের সামঞ্জস্য সৃষ্টি হতে পারে। এই দু'টো বিষয়ই আল্লাহর অমোঘ বিধানের অধীন, যার ভিত্তিতে সমগ্র দুনিয়ার নিয়ম নীতি চলছে।

মানুষ যেহেতু নিজেও বিশ্বজগতের এক অংশ তাই তার সৃষ্টি ও অস্তিত্ব, তার কাজ ও ইচ্ছা, তার নেকী ও ঈমান, তার এবাদাত এবং নিষ্ঠা এর সব কিছুই এই বিশ্ব চরাচরের একটা 'হ্যাঁ' বোধক জবাব মাত্র। এর সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার ব্যাপক ও সাধারণ নীতিমালার সাথে সম্পৃক্ত, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তার জন্ম হয়। এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েই সে ফলাফল সৃষ্টি করে, আর মানুষের জীবন যখন এই নিয়ম নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে তা থেকে দূরে সরে পড়ে তখনি তাতে বিশৃঙ্খলা ও পেরেশানি দেখা দিতে শুরু করে। জীবনের কাঠামো ভেংগে পড়ে এবং দুর্ভাগ্য ও বদনসীবির ছায়া তাদের ওপর আস্তে আস্তে বড়ো ও বিস্তৃত হতে থাকে।

'এটি এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতিকে যখন এই নেয়ামত দান করেন যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষরা নিজেদের মনের অবস্থা পরিবর্তন না করে ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তাকে পরিবর্তন করেন না।' (সূরা আল আনফাল–৫৩)

মোটকথা, মানুষের বোধশক্তি ও তার কার্যকলাপের সাথে আল্লাহর নিয়ম নীতির অধীনে পৃথিবীতে সংঘটিত ঘটনাসমূহের এক গভীর সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য রয়েছে। এই সম্পর্ককে সে ব্যক্তিই বিনষ্ট করতে পারে, সে-ই এই সামঞ্জস্যে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, সে-ই এই নিয়মনীতি ও মানুষের মাঝে ক্ষতির কারণ হতে পারে–যে ব্যক্তি মানবতার দুশমন, যে ব্যক্তি হেদায়াতকে উপেক্ষা করে দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাচ্ছে। সর্বোপরি এইভাবে ঘুরে বেড়ানোই মূলত যার ভাগ্যের লিখন হয়ে গেছে। আল্লাহর দরবারে হাযির হওয়া পর্যন্ত সে এভাবেই ঠোকর খেতে থাকবে।

আমি যখন আমার জীবনের মূল্যবান সময়গুলো 'কোরআনের ছায়াতলে' অতিবাহিত করছিলাম তখন এই কয়টি চিন্তা ও ভাবনা আমার মনে বারবার দানা বেঁধে উঠেছে। এই কথাগুলোকেই আমি 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর ভূমিকাস্বরূপ এখানে পেশ করলাম। হতে পারে এই কথাগুলোকে আল্লাহ তায়ালা কারো জন্যে হেদায়াতের উৎস বানিয়ে দেবেন। আল্লাহ তায়ালার ভাষায়, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো না।'

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আল আনফাল
সংক্ষিপ্ত আলোচনা

দু'টি মক্কী সূরা আনয়াম ও আরাফের পর এবার আমরা পুনরায় মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর দিকে ফিরে আসছি। ইতিপূর্বে আমরা আল বাকারা, আলে ইমরান, আন নেসা ও আল মায়েদা এই ক'টি মাদানী সূরার তাফসীর করে এসেছি। তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনে আমরা কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে এসেছি– কোরআন নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা নয়। কেননা নাযিল হওয়ার কালগত ধারাবাহিকতার ব্যাপারে এখন আমাদের পক্ষে কোনো কিছু নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র এক একটি অংশকে দেখিয়ে সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে যে, এটুকু মক্কী কোরআন এবং এটুকু মাদানী কোরআন। এতে সামান্য কিছু মতভেদ থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যেক আয়াত, আয়াত সমষ্টি বা সূরার অবতারণের সময় চিহ্নিত করে, নিশ্চিতভাবে কালগত ধারাবাহিকতা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। আমরা এ ক্ষেত্রে আজও কোনো অকাট্য তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। তবে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা কিছু কিছু আয়াত সম্পর্কে জানা যায় যে, সেটা মক্কী যুগের আয়াত, না মাদানী যুগের। যদিও কোরআনের আয়াত ও সূরাগুলোর নাযিল হওয়ার কালগত ধারাবহিকতা জানবার চেষ্টা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে করে ইসলামী আন্দোলনের গতিধারা, স্তরসমূহ ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভেও সহায়তা পাওয়া যায়, কিন্তু এই ধারাবাহিকতার ব্যাপারে নিশ্চয়তার অভাব থাকায় এ কাজটা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। আর এই চেষ্টা দ্বারা যে তথ্য লাভ করা যায়, তাও চূড়ান্ত ও নিশ্চিত তথ্য নয়– তা হচ্ছে আনুমানিক। এই সব আনুমানিক তথ্যের ফলাফল অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এজন্যে আমি এই তাফসীরে কোরআনের সূরাগুলোকে ওসমানী কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসারে সাজানোই ভালো মনে করেছি, সেই সাথে মোটামুটিভাবে ও অধিকতর বিশ্বস্ত সূত্রের ভিত্তিতে প্রত্যেক সূরার ঐতিহাসিক পটভূমি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। এভাবে আমি আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তত্ত্ব ও তথ্য সংক্ষেপে ও অধিকতর নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুসারে বিবৃত করেছি। পূর্ববর্তী সূরাগুলোতে এবং এই সূরাতে আমি এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছি।

অধিকতর নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুসারে আলোচ্য সূরা আনফাল সূরা বাকারার পরে বৃহত্তর বদর যুদ্ধের সময় অর্থাৎ হিজরতের উনিশ মাস পরে দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে নাযিল হয়। তবে সূরা বাকারার পরেই যে এটি নাযিল হয়েছে এটা কোনো চূড়ান্ত ও অকাট্য তথ্য নয়। কেননা সূরা বাকারা এক সাথে নাযিল হয়নি। এর কিছু অংশ মাদানী যুগের প্রথম ভাগে এবং কিছু অংশ শেষ ভাগে নাযিল হয়েছে। এই শেষ ভাগ ও প্রথম ভাগের মাঝে প্রায় নয়টি বছর রয়েছে। সূরা আনফাল যে এই সময়ের ভেতরেই নাযিল হয়েছে, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সূরা বাকারা এই সূরার আগে ও পরে কিছু কিছু করে নাযিল হয়েছে এবং রসূল (স.)-এর নির্দেশ মোতাবেক এগুলোকে সূরা বাকারার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। তাই সূরা আনফাল বাকারার পরে নাযিল হওয়ার অর্থ এই যে, বাকারার প্রথমাংশের পরে নাযিল হয়েছে। সূরা বাকারার পরিচিতি পর্বে আমরা এ কথা বলে এসেছি।

কোনো কোনো রেওয়ায়াত অনুসারে সূরা আনফালের ৩০ নং থেকে ৩৬ নং আয়াত পর্যন্ত অংশটি মক্কী যুগের। এগুলো হচ্ছে,

'যখন কাফের তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকায় তোমাকে বন্দী করা, হত্যা করা অথবা বের করে দেয়ার জন্যে......... *(আয়াত ৩০-৩৬)*

যারা এ আয়াতগুলোকে মক্কী বলেছেন, তারা সম্ভবত এ আয়াতগুলোতে মক্কায় সংঘটিত ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখেই তা বলেছেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়। কেননা বহু মাদানী যুগের আয়াতে হিজরতের পূর্বে মক্কায় সংঘটিত ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে। এমনকি এই সূরার ২৬ নং আয়াতে স্পষ্টতই মক্কী যুগের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে,

'স্মরণ করো, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ও দুর্বল ছিলে ....'

অনুরূপভাবে ৩৬ নং আয়াতে বদর যুদ্ধের পরে মোশরেক কর্তৃক ওহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতিকল্পে অর্থ ব্যয়ের উল্লেখ রয়েছে। যেমন,

'নিশ্চয় কাফেররা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফেরানোর জন্যে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে.........'

যে সকল বর্ণনায় এসব আয়াতকে মক্কী আয়াত বলা হয়েছে, সে সব বর্ণনায় এসব আয়াতের শানে নুযুল বা নাযিল হওয়ার উপলক্ষ হিসাবে যে ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে তা আপত্তিকর। বলা হয়েছে যে, আবু তালেব রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার জাতি তোমার ব্যাপারে কি সলাপরামর্শ করছে?' রসূল (স.) বললেন, 'ওরা আমাকে জাদু করতে, হত্যা করতে অথবা বের করে দিতে চায়।' আবু তালেব বললেন, 'তোমাকে এ কথা কে বলেছে? রসূল (স.) বললেন, 'আমার প্রতিপালক'। আবু তালেব বললেন, হাঁ, ওই প্রতিপালক তো তোমারই প্রতিপালক। তাঁর কাছে তুমি সদুপদেশ চাও। রসূল (স.) বললেন, 'আমি তাঁর কাছে সদুপদেশ চাইবো কেন? বরং তিনিই আমাকে সদুপদেশ দেবেন।' এই সময় নাযিল হয় 'স্মরণ করো, যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো আটক রাখা, হত্যা করা অথবা বহিষ্কার করার জন্যে....' (আয়াত ৩০)

ইবনে কাসীর এই বর্ণনার উল্লেখ করেছেন এবং এর ওপর আপত্তি জ্ঞাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, এখানে আবু তালেবের উল্লেখ শুধু বিস্ময়করই নয়, বরং অগ্রহণযোগ্যও। কেননা এ আয়াত মাদানী যুগের। তাছাড়া এই ষড়যন্ত্রের ঘটনা, কোরায়শদের এই ষড়যন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং রসূল (স.)-কে গ্রেফতার, হত্যা কিংবা বহিষ্কারের সলাপরামর্শ হয়েছিলো শুধু হিজরতের রাতে। আর এটা হয়েছিলো আবু তালেবের মৃত্যুর প্রায় তিন বছর পর। যে আবু তালেব তাঁকে সাহায্য সংরক্ষণ এবং তাঁর যাবতীয় দায়ভার বহন করছিলেন, তার মৃত্যুর পরই কোরায়শদের এতোটা ক্ষমতা ও ধৃষ্টতা জন্মেছিলো– তার আগে নয়।

ইবনে ইসহাক কোরায়শ কর্তৃক সারা রাত জেগে এই ষড়যন্ত্র ও সলাপরামর্শ সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের শেষে তিনি বলেন, 'এই সময়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মক্কা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। অতপর তিনি মদীনায় পৌঁছার পর আল্লাহ সূরা আনফাল নাযিল করেন। এতে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দেয়া তাঁর নেয়ামত ও পরীক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই বলে, 'স্মরণ করো, যখন কাফেররা তোমাকে আটক করা, হত্যা করা বা বহিষ্কার করার জন্যে ষড়যন্ত্র করছিলো। তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ ষড়যন্ত্রকারী।'

এই হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। এটিই এই আয়াতের পূর্বাপর সেই সকল আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে ও মোমেনদেরকে ইতিপূর্বে কৃত সকল অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করা, আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয়া এবং যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে না পালিয়ে অবিচল থাকার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এভাবে সূরার অন্য

সকল আলোচিত বিষয়ের সাথেও এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর সমগ্র সূরার মতো এই আয়াতগুলো মাদানী আয়াত– এই বক্তব্যই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

যা হোক, সূরা আনফালের নাযিল হওয়া সংক্রান্ত রেওয়াতগুলোতে এই সব সমস্যা থাকার কারণে আমরা এই তাফসীরে হযরত ওসমানের সংকলিত কোরআনের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করাই অগ্রগণ্য মনে করেছি– কোরআন নাযিল হওয়ার ধারাবাহিকতা নয়। কেননা এখন আর সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়। এই সাথে নাযিল হওয়ার কারণ বা উপলক্ষ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ও যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করেছি।

এই সূরাটা নাযিল হয়েছে বৃহত্তর বদর যুদ্ধ প্রসংগে। আর এই যুদ্ধের কারণ এবং ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে ও সার্বিকভাবে মানব জাতির ইতিহাসে তার যে ফলাফল দেখা দিয়েছে, তার নিরিখে বলা যায়, বদর যুদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের পথের ও মানবেতিহাসের পথের একটা বিরাট মাইলফলক।

আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধের দিনকে 'হক ও বাতিলের বিভক্তি ও দুই পক্ষের সংঘর্ষের দিন' নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর শুধু ইহকালে নয় এবং শুধু ইহকালীন জীবনের মানবেতিহাসেও নয়, বরং আখেরাতেও এটা হকপন্থী ও বাতিলপন্থী– এ দুই গোষ্ঠীকে পৃথক করে দিয়েছে। যেমন বদর যুদ্ধ উপলক্ষে নাযিল হওয়া সূরা আল হজ্জের ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এই দুই বিবদমান পক্ষ তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। যারা কুফরী করেছে, তাদের (পরানোর) জন্যে জাহান্নামের আগুন থেকে কিছু কাপড় কাটা হবে ....'

বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতগুলো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মোমেন ও কাফেরদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আর শুধু তাদের যুদ্ধ সম্পর্কেই নয় এবং তাদের পার্থিব জীবনে বিভক্ত হয়ে থাকা সম্পর্কেই নয়, বরং তাদের আখেরাত সম্পর্কে এবং তাদের অনন্তকালের জীবন সম্পর্কেও এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। ওই দিনটির দৃশ্য তুলে ধরা ও তার মূল্যায়ন সম্পর্কে আল্লাহর এ ঘোষণাই যথেষ্ট। পরবর্তীতে এই ঘটনা এবং তার কারণ ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি এই ঘটনার গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করবো।

বদর যুদ্ধের গুরুত্ব ও বিশালত যতোই হোক, এর সুদূরপ্রসারী ফলাফলের মূল্যায়ন ততোক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতোক্ষণ আমরা এ যুদ্ধের সত্যিকার প্রকৃতি ও পরিচয় না জানবো। যতোক্ষণ এ যুদ্ধকে 'ইসলামী জেহাদের' একটা ঘটনা হিসাবে না দেখবো এবং এই জেহাদের প্রেরণার উৎসসমূহ ও তার উদ্দেশ্যসমূহ না বুঝবো। আবার 'ইসলামী জেহাদের' প্রকৃত পরিচয় এবং তার প্রেরণার উৎসসমূহ ও উদ্দেশ্যসমূহ বুঝতে হলে আমাদেরকে সর্বাগ্রে জানতে হবে ইসলামের প্রকৃত পরিচয়।

ইমাম ইবনে কাইয়েম স্বীয় গ্রন্থ 'যাদুল মা'য়াদ' এ ইসলামের জেহাদ শীর্ষক বিষয়টির সার সংক্ষেপ একটি অধ্যায় তুলে ধরেছেন। এই অধ্যায়টির শিরোনাম দিয়েছেন, 'রসূল (স.)-এর নবুওত লাভ থেকে শুরু করে ইন্তেকাল পর্যন্ত কাফের ও মোনাফেকদের ব্যাপারে অনুসৃত নীতি।' এই অধ্যায়ে তিনি বলেন, 'মহান আল্লাহ সর্ব প্রথম তাঁর কাছে যে ওহী নাযিল করেন তা ছিলো এই যে, তিনি যেন তাঁর সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে পাঠ করেন। এটি ছিলো তাঁর নবুওতের সূচনা। এ

সময় তিনি শুধু তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে পাঠ করার নির্দেশ দেন। এ সময় তাঁকে তাবলীগ বা প্রচারের কোনো আদেশ দেননি। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ওপর নাযিল করা হয়, 'হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো এবং সতর্ক করো।' সুতরাং 'ইকরা' বা পাঠ করো বলে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে নবী বানালেন, 'আর হে কম্বলাচ্ছাদিত, ওঠো এবং সতর্ক করো' বলে তাঁকে রসূল পদে উন্নীত করলেন। অতপর তিনি তাঁর নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করলেন, অতপর তাঁর গোত্রকে সতর্ক করলেন, অতপর প্রতিবেশী আরবদেরকে সতর্ক করলেন, অতপর সমগ্র আরব জাতিকে সতর্ক করলেন, অতপর সমগ্র বিশ্ববাসীকে সতর্ক করলেন। এভাবে তাঁর নবুওতের পর তিনি দশ বছরেরও অধিক সময় কোনো লড়াই বা জিযিয়া কর আরোপ ছাড়াই শুধু দাওয়াতের কাজ করে কাটালেন। এই সময়ে তাঁকে কোনো অস্ত্র ধারণ থেকে বিরত থাকা, ধৈর্য ধারণ করা ও ক্ষমা করার আদেশ দেয়া হয়েছিলো। অতপর তাঁকে হিজরত করার ও যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো। প্রথমে তাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো শুধু যারা তাঁর ওপর আক্রমণ চালায় তাদের বিরুদ্ধে, আর যারা তাঁর ওপর আক্রমণ করে না এবং দূরে সরে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয়া হলো। অতপর তাঁকে সকল মোশরেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হলো। যাতে সমস্ত আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো আইন ও হুকুম মান্য করা না হয়।

অতপর জেহাদের নির্দেশ দেয়ার পর তাঁর কাছে কাফেররা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হলো, (১) যাদের সাথে আপোষ ও সন্ধির নীতি অবলম্বন করা হবে। (২) যাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে এবং (৩) যাদেরকে সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত হবে। প্রথম শ্রেণীটার সাথে করা সন্ধি চুক্তি তাঁকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হলো। যতোক্ষণ তারা চুক্তি মেনে চলে, ততোক্ষণ মুসলমানদেরও তা মেনে চলতে হবে। কিন্তু যখন তাদের পক্ষ থেকে চুক্তি লংঘণের আশংকা দেখা দেবে, তখন মুসলমানরা চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করবে। কিন্তু তারা চুক্তি লংঘণ করা শুরু করেছে এমন সুনির্দিষ্ট তথ্য না জানা পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ চালাবে না। যারা চুক্তি লংঘন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হলো।

সূরা তাওবা নাযিল করার মাধ্যমে এই তিন প্রকারের কাফেরদের সকলের ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যারা মুসলমানদের শত্রু, তারা ইসলাম গ্রহণ কিংবা জিযিয়া কর প্রদান না করলে মুসলমানদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ও তাদের ওপর কঠোরতা আরোপের আদেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রশক্তি এবং মোনাফেকদের বিরুদ্ধে বাকশক্তি ও যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জেহাদ করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কাফেরদের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিল করার আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করলেন। প্রথমত, যারা চুক্তি লংঘন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হলো। তিনি তাদের সাথে লড়াই করলেন ও তাদেরকে পরাজিত করলেন। দ্বিতীয়ত, যাদের সাথে মুসলমানদের নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি রয়েছে, কিন্তু তারা চুক্তি লংঘনও করেনি এবং মুসলমানদের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রমণও চালায়নি। তাদের সাথে কৃত চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। তৃতীয় যাদের সাথে মুসলমানদের কোনো চুক্তি ছিলো না কিংবা মেয়াদহীন চুক্তি ছিলো এবং তারা রসূল (স.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়নি। এই শ্রেণীর

লোকদেরকে চার মাস সময় দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। এই চার মাস অতিবাহিত হলে তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রসূল (স.) চুক্তি লংঘনকারীদেরকে হত্যা করলেন। যাদের সাথে চুক্তি ছিলো না কিংবা চুক্তির কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ ছিলো না, তাদেরকে চার মাস সময় দিলেন। আর চুক্তি মান্যকারীর সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। এই সব লোক ইসলাম গ্রহণ করলো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কুফরীর ওপর অবিচল থাকলো না। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থাকার অংগীকারে আবদ্ধ অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করলেন।

এভাবে সূরা তাওবা নাযিল হবার পর রসূল (স.)-এর কাছে তিন শ্রেণীর কাফের অবশিষ্ট রইলো ১. যুদ্ধরত, ২. চুক্তিবদ্ধ এবং ৩. ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত। অতপর চুক্তিবদ্ধ কাফেরদের ভাগ্য মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত হলো। ইসলামের আওতায় এরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত ও বিদ্রোহী। যারা বিদ্রোহী, তারা রসূল (স.)-কে ভয় পেতো। এভাবে গোটা দুনিয়ার মানুষ তিন রকমের দাঁড়ালো- মুসলমান, নিরাপদ আপোষকামী অমুসলিম এবং ভীরু বিদ্রোহী। মোনাফেকদের ব্যাপারে তাঁর নীতি ছিলো এই যে, আপাতদৃষ্টিতে তাদেরকে যেমন দেখা যায়, তেমনিই বিবেচনা করা, তাদের মনের অবস্থা আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা, তাদেরকে এড়িয়ে চলা, তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ ও কঠোর নীতি অবলম্বন, হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দ্বারা তাদের মন জয় করা, তাদের জানাযা না পড়া এবং তাদের কবর যেয়ারত না করা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এরূপ আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, কোনো মোনাফেকের জন্যে তিনি ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন না। এই ছিলো রসূল, ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন কাফের ও মোনাফেকদের প্রতি রসূল (স.)-এর নীতি।'

ইসলামে জেহাদের বিভিন্ন স্তরের বিধান সম্বলিত দীর্ঘ আলোচনার এই চমৎকার সারসংক্ষেপ থেকে ইসলামের আন্দোলন পদ্ধতির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য জানা গেলো, যা বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু আমি এ তাফসীরে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করবো!

প্রথম বৈশিষ্ট্য, জীবন পদ্ধতির বাস্তবমুখিতাই ইসলামের পয়লা বৈশিষ্ট্য। এটা মানব সমাজের বিদ্যমান একটা বাস্তব অবস্থার মোকাবেলা করে এবং পৃথিবীতে ইসলামের অস্তিত্বকে সংরক্ষণ করার জন্যে সম্ভাব্য যাবতীয় পন্থা অবলম্বন করে। ইসলাম জাহেলী মতবাদ ও আদর্শের মোকাবেলা করে। এই জাহেলী মতবাদ ও মতাদর্শের ভিত্তিতে বহু বাস্তব রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং বস্তুগত শক্তিতে বলীয়ান বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান সেগুলোকে সমর্থন ও সাহায্য করে। এ জন্যে ইসলাম এই গোটা বাস্তব অবস্থাটারই মোকাবেলা করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে। একদিকে আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার সংশোধনকল্পে দাওয়াত ও প্রচারমূলক কাজের মাধ্যমে এবং অপরদিকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্ছেদকল্পে শক্তি প্রয়োগ ও জেহাদের মাধ্যমে এর মোকাবেলা করে। কেননা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রচার ও দাওয়াতের মাধ্যমে জনগণের ধারণা বিশ্বাস সংশোধনে বাধা দেয়, তাদেরকে বলপ্রয়োগ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির মাধ্যমে নতি স্বীকার করায় এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যান্য প্রভুদের গোলামে পরিণত করে। বস্তুগত শক্তির মোকাবেলায় কেবল প্রচার ও দাওয়াতের মধ্যে এ আন্দোলনের তৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকে না। অনুরূপভাবে তা মানুষের বিবেকের ওপর কোনো বস্তুগত বলও প্রয়োগ করে না।

ইসলামের জীবন পদ্ধতিতে ওই দুটো জিনিসই সমান গুরুত্বসম্পন্ন। মোট কথা, ইসলামের যাবতীয় তৎরপতার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে আল্লাহর বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু আল্লাহর অনুগত বান্দায় পরিণত করা। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে আরো আলোচনা করা হবে।

ইসলামের জীবন পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো এর আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবমুখিতা। এ হচ্ছে ধাপে ধাপে অগ্রসরমান একটা আন্দোলন। এর প্রত্যেকটি ধাপের দাবী ও বাস্তব প্রয়োজন পূরণের উপকরণাদি এর হাতে রয়েছে। প্রতিটি ধাপ এমন যে, তা স্বয়ংক্রিয়াভাবে পরবর্তী ধাপ পর্যন্ত আন্দোলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ইসলাম শুধুমাত্র মতবাদ ও মতাদর্শ দ্বারা বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির মোকাবেলা করে না। অনুরূপভাবে তা নিষ্ক্রিয় উপকরণাদি দ্বারাও বিরাজমান পরিস্থিতি ও পরিবেশের মোকাবেলা করে না। যারা কোরআনের আয়াতগুলোকে ইসলামের জেহাদ সংক্রান্ত বিধান প্রমাণ করার কাজে ব্যবহার করে, কিন্তু এই পর্যায়ক্রমিকতা ও ধারাবাহিকতার বৈশিষ্ট্যকে হিসাবে ধরে না এবং ইসলাম যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় ও এর প্রতিটি ধাপের সাথে যে কোরআনের আয়াতসমূহের সম্পর্ক রয়েছে তা উপলব্ধি করে না, তারা মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত হয় এবং আয়াতগুলোর ভুল অর্থ করে তা থেকে এমন সব মতবাদ ও মতাদর্শ বের করে, যা আদৌ ওই আয়াতগুলোর বক্তব্য নয়। এরূপ হওয়ার কারণ হলো, তারা কোরআনের প্রতিটি উক্তিকে অন্যান্য উক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একমাত্র ও সর্বশেষ উক্তি মনে করে। তাদের ধারণা যে, ওই আয়াতেই ইসলামের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ নীতিমালা ব্যক্ত করা হয়েছে। তারা বিরাজমান শোচনীয় পরিস্থিতি ও পরিবেশের চাপের কাছে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরাজিত হয়ে মুসলমানদের নতুন প্রজন্মকে বলে যে, ইসলাম শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্যে জেহাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে। এভাবে তারা পৃথিবী থেকে সকল খোদাবিমুখ শাসনের অবসান ঘটানো এবং সকল মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে শুধু আল্লাহর গোলামে পরিণত করার মহান দায়িত্ব থেকে ইসলামকে অব্যাহতি দিয়ে ইসলামের একটা উপকার সাধন করলেন বলে মনে করেন। বস্তুত ইসলাম কাউকে তার আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। কিন্তু মানুষ যাতে তার আকীদা বিশ্বাস স্বাধীনভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে, সে জন্যে যমীনে বিদ্যমান স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস অথবা পরাভূত করতে চায়। এই শাসন ব্যবস্থাকে জিযিয়া দিতে ও ইসলামের অধীনতা বরণ করতে সে বাধ্য করে, যাতে মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে ইসলামকে গ্রহণ বা বর্জনের ফয়সালা করতে পারে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলামের চিরস্থায়ী আন্দোলন ও তার নিত্য নতুন উপায় উপকরণ ইসলামকে কখনো তার স্থায়ী ও শাশ্বত নীতিমালা ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে না। প্রথম থেকেই এ আন্দোলন শুধু কোরায়শদেরকে নয় এবং শুধু আরবদেরকে নয়, বরং সমগ্র মানব জাতিকে একই মূলনীতি ও একই লক্ষ্যের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে। এক আল্লাহর এবাদাত ও আনুগত্য করা, এবং আল্লাহর বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। এই মূলনীতির ব্যাপারে তার কোনো আপোষ নেই। অতপর সে এই মূলনীতিকে পর্যায়ক্রমে ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাস্তবায়িত করে, যেমন দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রসংগে আমি বলে এসেছি।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, মুসলমানদের সাথে সকল অমুসলমানের সম্পর্ক আইনানুগভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে 'যাদুল মায়াদ' থেকে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত নির্দেশিকার আলোকে। সেই নির্দেশিকা এই যে,

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা অথবা অন্ততপক্ষে নমনীয় হওয়া তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা, তাঁর এবাদাত ও আনুগত্যে কাউকে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক উপকরণাদি দ্বারা বাধা না দেয়া এবং সবাইকে ইসলাম গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান নিশ্চিত করা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের কর্তব্য। কোনো মানুষ নিজে ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক এ ব্যাপারে সে পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু সে যদি অন্য কাউকে বাধা দেয়, তবে ইসলাম তা বরদাশত করে না। যে ব্যক্তি অন্যকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেবে, ইসলাম তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করবে, যতোক্ষণ না সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অথবা বাধা দান থেকে বিরত হয় ও বশ্যতা স্বীকার করে।

যে সব লেখক পাশ্চাত্যের কাছে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে পরাজিত বিধায় 'ইসলামের জেহাদ' শুধুমাত্র আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমিত এই বলে ইসলামকে 'দোষমুক্ত' করার চেষ্টায় নিয়োজিত, তারা বিশ্বাসের ব্যাপারে বল প্রয়োগ না করা এবং মানুষের ইসলাম গ্রহণে বাধা দানকারী রাজনৈতিক শক্তিকে উৎখাত করা– ইসলামের এই দুটো নীতির পার্থক্য বুঝতে পারেনি, বরং এই দুটোর মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। যে রাজনৈতিক শক্তি মানুষকে জোরপূর্বক মানুষের গোলামী করতে বাধ্য করে এবং মানুষকে আল্লাহর এবাদাত ও আনুগত্য করতে জোরপূর্বক বাধা দেয়, সেই রাজনৈতিক শক্তিকে উৎখাত করা ও মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বল প্রয়োগ না করা– এই উভয়টির মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই এবং তালগোল পাকানোর কোনো অবকাশ নেই। আসলে এ দুটো নীতির মোদ্দা কথা হলো, ইসলাম মানুষকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দানকে নিশ্চিত করতে চায়। সে নিজেও তার ওপর বলপ্রয়োগ করে না, অন্যকেও বল প্রয়োগ করতে দিতে চায় না। উক্ত পরাজয় ও পরাজয়জনিত তালগোল পাকানোর কারণেই তারা ইসলামের জেহাদকে 'প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের' মধ্যে সীমিত করে ফেলে। অথচ ইসলামের জেহাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এ যুগের মানুষদের মধ্যে যে সব যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়, যে সব উপকরণ এসব যুদ্ধ বিগ্রহকে উস্কে দেয় এবং যে সব উপকরণ এগুলোর মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, তার সাথে ইসলামের জেহাদের কোনোই সম্পর্ক নেই। ইসলামী জেহাদের কারণ খোদ ইসলামের অভ্যন্তরেই খুঁজে দেখতে হবে, খুঁজে দেখতে হবে ইসলাম পৃথিবীতে কী ভূমিকা পালন করতে এসেছে, কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ায় ইসলামকে, রসূলদেরকে ও বিশেষভাবে সর্বশেষ রসূলকে প্রেরণ করেছেন এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে।

সমগ্র বিশ্বজগতে আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সার্বভৌম শাসক, আইনদাতা, প্রভু ও প্রতিপালক– এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইসলাম প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে আল্লাহর দাসদের দাসত্ব ও গোলামদের গোলামী থেকে এবং নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মানুষের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। আল্লাহকে সর্ব জগতের প্রতিপালক ঘোষণা করার অর্থ হলো মানুষের সার্বভৌমত্বকে খতম করা এবং মানুষের ওপর বা পৃথিবীর কোনো অংশের ওপর মানুষের শাসন ও বিচার ফয়সালার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা করা, তা সে সার্বভৌমত্ব ও শাসন যে আকারেই থাক না কেন। অন্য কথায় বলা যায়, ইসলাম মানুষের খোদায়ীর বিলোপ ও অবসান ঘটাতে চায়। আর যেখানে শাসনের সর্বশেষ, সর্বোচ্চ ও সর্বময় ক্ষমতা মানুষের হাতে এবং মানুষই তার সকল ক্ষমতার উৎস, সেখানেই মানুষ মানুষের খোদা হয়ে বসে আছে বলে ইসলাম মনে করে। কেননা সেখানে মানুষ মানুষের ওপর এমন সর্বময় প্রভুত্ব চালায়, যার জন্যে সে আল্লাহর বিকল্প প্রভু ও খোদা হয়ে

বসে। ইসলামের পক্ষ থেকে 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা খোদা নেই' এই ঘোষণা দানের অর্থ হলো অবৈধভাবে আল্লাহর ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া, প্রভুত্ব বা খোদায়ী আল্লাহকেই ফেরত দেয়া। যারা এটিকে অবৈধভাবে হস্তগত করে মানুষের ইলাহ হয়ে বসে নিজেদের মনগড়া আইন দ্বারা মানুষকে শাসন করে, তারা কার্যত মানুষের ইলাহের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং জনগণ তাদের গোলামে পরিণত হয়। ইসলাম এই অন্যায় প্রভুত্ব ও অবৈধ গোলামী খতম করতে চায়। সে চায় পৃথিবীতে মানুষের রাষ্ট্র ও সরকার উৎখাত করে আল্লাহর রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা করতে। কোরআনের ভাষায়,

'তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি আকাশেও ইলাহ এবং পৃথিবীতেও ইলাহ। 'শাসন ও বিচার ফয়সালার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই, তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো এবাদাত ও আনুগত্য করো না। এটাই সঠিক দ্বীন।'

'বলো, হে আহলে কেতাব, এসো, আমরা এমন এক কথার ওপর একমত হই, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো যেন এবাদাত ও গোলামী না করি, তার সাথে অন্যকে শরীক না করি এবং আমরা একে অপরকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু হিসাবে গ্রহণ না করি। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তাহলে তুমি বলো, তোমরা সাক্ষী থেকো যে, আমরা মুসলমান।'

পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্র এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না যে, কতিপয় নিদিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তি কোনো দেশের সার্বভৌম শাসন ক্ষমতার মালিক হয়ে বসলো, যেমনটি খৃষ্টীয় গীর্জা শাসিত রাষ্ট্রে হতো, অথবা থিওক্রাসি বা পবিত্র খোদায়ী শাসনের নামে এমন লোকদের শাসন কায়েম করা হলো, যারা দেবতাদের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র। বরঞ্চ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় কেবল তখনই, যখন আল্লাহর আইনের নিরংকুশ শাসন কায়েম হয় এবং আল্লাহর আইন অনুযায়ী সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়।

আর পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, অনৈসলামী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ, সার্বভৌম ক্ষমতাকে অবৈধভাবে কুক্ষিগতকারীদের হাত থেকে ছিনিয়ে তার প্রকৃত মালিক এক আল্লাহর কাছে অর্পণ করা, আল্লাহর আইনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা ও মানব রচিত আইন বাতিল করা– এসব কাজ কেবল বক্তৃতা বিবৃতি ও প্রচার দ্বারা সম্পন্ন হতে পারে না। কেননা বান্দাদের ওপর জোরপূর্বক নিজেদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়া ও আল্লাহর ক্ষমতাকে জবরদখলকারী লোকেরা শুধু বক্তৃতা শুনে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবে না। তা যদি হতো, তবে পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে নবীদের কাছে এর চেয়ে সহজ পন্থা আর কিছু ছিলো না। কিন্তু নবীদের ইতিহাস এবং আল্লাহর এই দ্বীনের ইতিহাস যুগ যুগ কাল ধরে যেভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে এসেছে, তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

আল্লাহকে সারা বিশ্ব জগতের একমাত্র ইলাহ ও রব তথা সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মনিব ও প্রভু ঘোষণার মধ্য দিয়ে মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া অন্য সকল দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়ার এই সার্বজনীন ঘোষণা কোনো তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও নেতিবাচক ঘোষণা ছিলো না। এটা ছিলো বাস্তব, ইতিবাচক ও আন্দোলনগত ঘোষণা। এমন একটা সরকারের মাধ্যমে এ ঘোষণার বাস্তবায়ন কাম্য, যে সরকার আল্লাহর আইন দ্বারা মানুষকে শাসন করে এবং কার্যকরভাবে তাদেরকে বান্দাদের গোলামী থেকে অব্যাহতি দিয়ে আল্লাহর একক গোলামীর অধীন করে। তাই প্রচার ও বক্তৃতার পাশাপাশি এর একটা আন্দোলন ও সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করাও জরুরী। এতে করে তা মানব

জাতির বাস্তব অবস্থার সকল দিকের সাথে উপযুক্ত উপায় উপকরণ নিয়ে মিলিত ও সমন্বিত হতে পারবে।

পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য সমস্ত কর্তৃত্বের নাগপাশ থেকে মুক্তকারী আদর্শ হিসাবে ইসলাম যখন আজকের, অতীতের ও ভবিষ্যতের মানব সমাজের মুখোমুখি হয়, তখন তা একদিকে যেমন তাত্ত্বিক ও আদর্শিক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়, তেমনি সম্মুখীন হয় বস্তুগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, শ্রেণীগত ও প্রজাতিগত বাধা বিপত্তিরও। উপরন্তু বিকৃত ও অবৈধ আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারাও তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই সব বাধা বিপত্তি মিলিত হয়ে একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে।

বক্তৃতা বিবৃতি ও প্রচার দ্বারা যেখানে বাতিল আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারার মোকাবেলা করা হয়, সেখানে আন্দোলন ও সংগ্রাম দ্বারা সেই বস্তুগত বাধা বিপত্তির মোকাবেলা করা হয় যা অত্যন্ত জটিল ও পরস্পরবিরোধী সামাজিক, অর্থনৈতিক, শ্রেণীগত, জাতিগত, চিন্তাগত ও আদর্শগত উপাদানসমূহের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার আকারে বিদ্যমান। এই প্রচার ও আন্দোলন একত্রে বিরাজমান গোটা সমাজ ব্যবস্থার মোকাবেলা ও পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। আর সমগ্র পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতিকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দান করার জন্যে এই উভয় জিনিস অর্থাৎ প্রচার ও আন্দোলন অপরিহার্য। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এর পুনরাবৃত্তি করা জরুরী মনে হচ্ছে।

আল্লাহর এই দ্বীন ইসলাম শুধু আরব জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির ঘোষণা নয় এবং শুধু আরবদের মধ্যেই এর বক্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। এর আলোচ্য বিষয় হলো গোটা মানব জাতি এবং এর কর্মক্ষেত্র হলো গোটা পৃথিবী। আল্লাহ তায়ালা শুধু আরবদের আল্লাহ নন, এমনকি তিনি শুধু মুসলমানদেরও আল্লাহ নন। তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রভু, মনিব, রব ও খোদা তথা 'রব্বুল আলামীন'। ইসলাম চায় গোটা বিশ্বজগতকে আল্লাহর অনুগত বানাতে এবং আল্লাহর বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত করতে। আর ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যের গোলামীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও মারাত্মক রূপ হলো, মানুষ কর্তৃক মানুষের তৈরী আইনের আনুগত্য করা। এটা সেই এবাদাত, যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে করা যায় না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইনের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায়, চাই সে যতোই আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী বলে নিজেকে জাহির করুক। রসূল (স.) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, কারো আইন ও হুকুমের অনুসরণই এবাদাত। এ ধরনের এবাদাত আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে করার দরুনই ইহুদী ও খৃষ্টানরা মোশরেক হয়ে গেছে। কেননা তারা এক আল্লাহর হুকুম ও আইনের আনুগত্য করার পরিবর্তে অন্যদের আনুগত্য করেছে– যাদের আনুগত্য করতে আল্লাহ তায়ালা হুকুম দেননি।

তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জাহেলী যুগে খৃষ্টধর্ম গ্রহণকারী আদী ইবনে হাতেমকে যখন রসূল (স.) ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তার বোন ও গোত্রের আরো কিছু লোক বন্দী হলো। রসূল (স.) তার বোনকে অনুগ্রহপূর্বক মুক্ত করে দিলে তিনি তার ভাইয়ের কাছে গিয়ে তাকে রসূল (স.)-এর কাছে আসতে ও ইসলাম গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। সহসা মদীনায় তার আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়লো। আদী গলায় একটা রূপোর ক্রুশ ঝুলিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন রসূল (স.) এ আয়াত পড়ছিলেন, ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের মধ্যকার ধর্মীয় পন্ডিতদেরকে ও সংসার

বিরাগীদেরকে আল্লাহর বিকল্প 'রব' বা প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছিলো।' আদি বলেন, আমি বললাম, তারা তো তাদের এবাদাত করে না। রসূল (স.) বললেন, 'অবশ্যই করে। ঐ পন্ডিতরা ও দরবেশরা তাদের জন্যে হালাল জিনিসকে হারাম করে এবং হারাম জিনিসকে হালাল করে এবং সাধারণ ইহুদী ও খৃষ্টানরা তার অনুসরণ করে। এই অনুসরণেরই নাম হচ্ছে এবাদাত।'

এখানে আল্লাহর উক্তির যে ব্যাখ্যা রসূল (স.) করেছেন, তা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আইন ও হুকুমের আনুগত্য করাই সেই এবাদাত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দিতে সক্ষম, যদি তা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো আইন ও হুকুম হয়। এরূপ আনুগত্যই একজন কর্তৃক আর একজনকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু রূপে গ্রহণ করার শামিল। অথচ এ জিনিসটার উচ্ছেদের উদ্দেশ্যেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। পৃথিবীতে আল্লাহর গোলামী ছাড়া আর সব রকমের গোলামী থেকে মানুষকে স্বাধীন করাই ইসলামের উদ্দেশ্য।

এ জন্যে বক্তৃতা ও আন্দোলনের মাধ্যমে ওই স্বাধীনতা ঘোষণার বিপরীত পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে পাল্টে দেয়া এবং সেই সব রাজনৈতিক শক্তির ওপর আঘাত হানা ছাড়া ইসলামের উপায়ান্তর নেই, যারা মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্যের গোলামে পরিণত করে, অর্থাৎ আল্লাহর আইন ও সনদ ব্যতীত জনগণের ওপর শাসন চালায় এবং যারা মানুষকে স্বাধীনভাবে ইসলামী আদর্শের প্রচারণা শুনতে ও ওই আদর্শ গ্রহণ করতে দেয় না। এরপর ইসলাম এমন এক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যা চলমান বিজয়ী শক্তিকে উৎখাত করার পর মুক্তির আন্দোলনকে কার্যকরভাবে চালু হবার সুযোগ দেয়, চাই সে মুক্তি আন্দোলন নিরেট রাজনৈতিক আন্দোলন হোক, অথবা বর্ণ মিশ্রিত হোক অথবা একই বর্ণের মধ্যে শ্রেণীভেদযুক্ত আন্দোলন হোক।

ইসলাম কখনো তার আকীদা ও আদর্শ গ্রহণে মানুষকে বাধ্য করতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু ইসলাম শুধু একটা আকীদা বিশ্বাসই নয়। বরং আগেই বলেছি যে, ইসলাম মানুষকে সৃষ্টির গোলামী থেকে মুক্তি দান সম্বলিত একটা সর্বাত্মক ও সর্বজনীন ঘোষণাও বটে। এর সর্বপ্রথম লক্ষ্য মানুষের ওপর মানুষের সার্বভৌম ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব পরিচালনা এবং মানুষ কর্তৃক মানুষের গোলামী করার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সরকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিলোপ সাধন। এই লক্ষ্য অর্জনের পর এবং জনগণের ওপর থেকে রাজনৈতিক চাপ অপসারণ ও তাদের মনমগযের কাছে সত্য ও মিথ্যার পরিষ্কার ও স্বচ্ছ বিবরণ দেয়ার পর ইসলাম তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় যেন তারা স্বেচ্ছায় তাদের মনোনীত আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই স্বাধীনতার অর্থ এমন কোনো লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতা নয়, যার ভিত্তিতে মানুষ তার প্রবৃত্তিকে নিজের খোদা বানিয়ে বসবে, একে অপরের গোলামী করতে শুরু করবে এবং একে অপরকে খোদা হিসাবে গ্রহণ করবে। পৃথিবীতে যে শাসন ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, তার ভিত্তিমূল এক আল্লাহর দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহর আইন অনুসারেই তাকে চলতে হবে। এরূপ একটা শাসন ব্যবস্থার আওতায় জনগণ যে কোনো আকীদা তথা ধর্ম অবলম্বন করার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। এতে করে ওই সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক আনুগত্য পুরোপুরিভাবে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত থাকবে। মনে রাখা দরকার যে, 'দ্বীন' শব্দের অর্থ 'আকীদা' শব্দের অর্থ থেকে ব্যাপকতর। 'দ্বীন' হচ্ছে সামষ্টিক পরিচালনা ও শাসন ব্যবস্থা। ইসলামে এটা আকীদা ও আদর্শের তথা ধর্মের

আলোকেই পরিচালিত হয়। কিন্তু এটা আকীদার চেয়ে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর। ইসলামে এটা সম্ভব যে, তার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি অনুগত থেকেও বিভিন্ন ব্যক্তি ও দল ইসলামের আকীদা ও বিশ্বাসকে গ্রহণ নাও করতে পারে। অর্থাৎ অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থেকেও নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত ও আকীদা বিশ্বাস বজায় রাখতে পারে।

ইসলামের যে চরিত্র ও স্বভাব প্রকৃতি ওপরে বর্ণনা করা হলো, তা যে ব্যক্তি উপলব্ধি করে, তার পক্ষে এটাও অনুধাবন করা সহজ হয়ে যায় যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্যে সশস্ত্র যুদ্ধ ও প্রচারণা যুদ্ধ দুটোই অপরিহার্য। সে একথাও হৃদয়ংগম করতে পারবে যে, ইসলামের আন্দোলন বর্তমান যুগের সংকীর্ণ পরিভাষা 'প্রতিরক্ষা যুদ্ধ' থেকে প্রাপ্ত ধারণা ভিত্তিক নিছক প্রতিরক্ষার আন্দোলন নয়, যেমন মানসিকভাবে পরাজিত লোকেরা চলমান পরিস্থিতির চাপে এবং প্রাচ্যবাদীদের শঠতাপূর্ণ আক্রমণের মুখে ইসলামের জেহাদী আন্দোলনকে চিত্রিত করে থাকে। আসলে এ আন্দোলন ছিলো পৃথিবীতে মানুষের পূর্ণাংগ স্বাধীনতা ও মুক্তির পর্যায়ক্রমিক আন্দোলন।

আর যদি ইসলামী জেহাদী আন্দোলনকে প্রতিরক্ষামূলক আন্দোলন নামে আখ্যায়িত করা একান্তই জরুরী হয়ে পড়ে, তাহলে 'প্রতিরক্ষা' শব্দটার অর্থ পরিবর্তন করতে হবে এবং বলতে হবে যে, প্রতিরক্ষা বলতে বুঝায়, 'বর্তমান যুগের ও ইসলামের অভ্যুদয়কালের জাহেলী সমাজে অর্থনৈতিক, শ্রেণীগত ও জাতিগত বৈষম্য ভিত্তিক রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিষ্ঠানসমূহের আকারে এবং মানব রচিত বিভিন্ন মতবাদ ও মতাদর্শের আকারে মানুষের স্বাধীনতাকে খর্বকারী যে সব উপকরণ বিদ্যমান ছিলো ও আছে, তা থেকে মানুষকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করা।

'প্রতিরক্ষা' শব্দটির এই ব্যাপকতর বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি পৃথিবীতে ইসলামের জেহাদী অভিযাত্রাই বা কী কী কারণে সংঘটিত হয় এবং ইসলামের প্রকৃত পরিচয়ই বা কী। বস্তুত ইসলাম হচ্ছে এমন একটা সর্বজনীন ঘোষণা, যা দ্বারা মানুষের গোলামী থেকে মানুষের মুক্তি, সারা বিশ্বের ও সকল সৃষ্টির জন্যে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব ও খোদায়ী প্রতিষ্ঠা, মানুষের মনগড়া আইন ও বিধান দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান এবং মানব জগতে আল্লাহর আইনের নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যারা বর্তমান যুগে প্রচলিত প্রতিরক্ষা যুদ্ধের সংকীর্ণ অর্থের আলোকে ইসলামী জেহাদকে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করে এবং এ কথাও প্রমাণ করার চেষ্টা চালায় যে, তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্র তথা আরব উপদ্বীপের ওপর থেকে প্রতিবেশী দেশগুলোর আগ্রাসন প্রতিহত করাই ইসলামী জেহাদের সংঘাতময় ঘটনাবলীর উদ্দেশ্য ছিলো, তাদের এই চেষ্টা ইসলামের প্রকৃত পরিচয় ও ভূমিকা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারারই ফল। উপরন্তু এটা ইসলামের জেহাদ বা সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের শঠতাপূর্ণ আক্রমণের সামনে ও চলমান পরিস্থিতির চাপের সামনে পরাজয় বরণেরও ফল।

ভেবে দেখুন তো হযরত আবু বকর, ওমর ও ওসমানের যদি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য কর্তৃক আরব উপদ্বীপ আক্রান্ত হওয়ার আশংকা নাও থাকতো, তাহলেও কি তাঁরা ইসলামের দাওয়াতকে

পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছানোর চেষ্টা না করে চুপচাপ ঘরে বসে থাকতেন? আর এই দাওয়াতের পথে যখন সব রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, শ্রেণীগত ও বর্ণগত বাস্তব বাধা-বিপত্তি রয়েছে, তখন সেই সব বাধা বিপত্তি দূর করার সংগ্রাম ছাড়া কিভাবে এ দাওয়াতকে দিকে দিকে তারা ছড়িয়ে দিতেন?

বস্তুত যে দাওয়াত সারা পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তার সামনে এই সব বাস্তব বাধা বিপত্তি উপস্থিত হলে তাকে শুধু প্রচার ও বক্তৃতা বিবৃতির জোরে দূর করার চিন্তা করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। জনগণ যদি এ দাওয়াতকে গ্রহণ বা বর্জনে স্বাধীন থাকতো, তাহলে বক্তৃতা বিবৃতি ও প্রচার দ্বারা এ সব বাধা প্রতিহত করা যেতো। জনগণকে স্বাধীনভাবে বুঝানো যেতো এবং তারাও সব রকম চাপ ও প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতো। এরূপ ক্ষেত্রে 'লা ইকরাহা ফি দ্বীন' অর্থাৎ 'ইসলামে বল প্রয়োগের অবকাশ নেই' কথাটা যথার্থ। কিন্তু সেই সব বাস্তব বাধা ও প্রতিকূলতা যখন বিদ্যমান, তখন সবার আগে ঐ বাধাকে শক্তি দিয়ে অপসারণ করা অপরিহার্য। যাতে শৃংখলমুক্ত ও প্রভাবমুক্ত পরিবেশে স্বাধীনভাবে মানুষের মন ও বিবেককে বুঝানো যায়।

দাওয়াতের উদ্দেশ্য যখন বিদ্যমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রভাব থেকে মানুষকে কার্যকরভাবে মুক্ত করা এবং নিছক তাত্ত্বিক ও দার্শনিক প্রচারণা নয়, তখন দাওয়াতের সাফল্যের জন্যেই জেহাদ অপরিহার্য– চাই মুসলিম আবাসভূমি প্রতিবেশীদের আগ্রাসনের আশংকা থেকে মুক্ত থাক বা না থাক। কেননা ইসলাম যখন শান্তির অন্বেষণে ব্যাপৃত, তখন সে শুধু ইসলামী আকীদা বিশ্বাস অবলম্বনকারীদের আবাসভূমির নিরাপত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ সস্তা শান্তি চায় না। সে এমন শান্তি চায়, যার ফলে পৃথিবীতে শুধু আল্লাহর আইন ও বিধানের নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্যই চলবে, অন্য কিছু নয়। সে এমন শান্তি চায়, যার আওতায় পৃথিবীতে মানুষ শুধু আল্লাহর গোলাম থাকবে, অন্য কারো নয় এবং মানুষ একে অপরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করবে না, বরং শুধু আল্লাহকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করবে। ইসলামের জেহাদী আন্দোলন আল্লাহর আদেশ বলে চালু হবার পর তা সর্বশেষে যে পর্যায়ে উপনীত হয়, সেটাই প্রকৃত বিবেচ্য বিষয়– মধ্যবর্তী বা প্রাথমিক স্তর নয়। ইমাম ইবনুল কাইয়েম এই সর্বশেষ স্তর সম্পর্কে বলেন, 'সূরা আত তাওবা নাযিল হবার পর রসূল (স.)-এর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে কাফেররা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়– (১) যারা তাঁর সাথে যুদ্ধরত, (২) যারা তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং (৩) যারা ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে বশ্যতা স্বীকারকারী। এরপর চুক্তিবদ্ধ ও সন্ধিবদ্ধদের ভাগ্য ন্যস্ত হয় ইসলামী রাষ্ট্রের কাছে। ফলে কাফেররা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হলো, যুদ্ধরত ও বশ্যতা স্বীকারকারী বা যিম্মী তথা অমুসলিম নাগরিক। আর যারা যুদ্ধরত ছিলো, তারা রসূল (স.) তথা ইসলামী রাষ্ট্রের ভয়ে ভীত হয়ে রইলো। এভাবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মোট তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হলো মুসলিম, বশ্যতা স্বীকারকারী অমুসলিম এবং যুদ্ধরত কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত। এ তিনটি শ্রেণীর যে পৃথক পৃথক অবস্থান ও ভূমিকা, তা ইসলামের স্বভাব প্রকৃতি ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিরাজমান পরিস্থিতির চাপের মুখে ও ধড়িবাজ প্রাচ্যবিদদের শঠতাপূর্ণ আক্রমণের মুখে যারা পরাজিত, তারা এ বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে মক্কায় ও হিজরতের পর মদীনায় প্রথম দিকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছেন। তিনি মুসলমানদেরকে বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের হাত যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে সংযত রাখ এবং নামায কায়েম করো ও যাকাত দাও।' অতপর আরেক পর্যায়ে তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'যাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যুদ্ধ করার। কেননা তারা মযলুম। ...... (সূরা হজ্জ, আয়াত ৩৯, ৪০, ৪১) এরপর অনুমতি থেকে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে তাদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হলো শুধু প্রথম

আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে। যারা প্রথম আক্রমণ চালায়নি, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। বলা হলো, 'যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাদের সাথে যুদ্ধ করো।' এরপর হুকুম এলো, সমগ্র মোশরেক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। 'এবং সকল মোশরেকের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।' আরো বলা হলো, 'যে সব আহলে কেতাব আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে নিষিদ্ধ মানে না এবং সত্য দ্বীনের আনুগত্য করে না, তারা যতোক্ষণ না অবনত মস্তকে স্বহস্তে জিযিয়া দেবে, ততোক্ষণ তাদের সাথে লড়াই করো।' সুতরাং ইমাম ইবনুল কাইয়েমের মতানুসারে যুদ্ধ প্রথমে ছিলো নিষিদ্ধ, তারপর অনুমোদিত, তারপর প্রথম আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ফরয এবং সর্বশেষে আক্রমণকারী ও অনাক্রমণকারী নির্বিশেষে সকল মোশরেকের বিরুদ্ধে ফরয হলো।'

জেহাদ সংক্রান্ত আয়াতগুলো, জেহাদের উৎসাহদায়ক হাদীসগুলো এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের দীর্ঘস্থায়ী জেহাদী ঘটনাগুলোতে জেহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে এতো অকাট্য বক্তব্য রয়েছে যে, এর উপস্থিতিতে ইসলামী জেহাদ সংক্রান্ত সেই সব অপব্যাখ্যা মোটেই হৃদয়গ্রাহী হয় না, যা চলমান পরিস্থিতির চাপে ও কুচক্রী প্রাচ্যবাদীদের আগ্রাসনের মুখে মানসিকভাবে পরাজিত বিশ্লেষকরা দিয়ে থাকে।

জেহাদ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ এবং জেহাদের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা ও অধ্যয়ন করার পর কোনো সুস্থ মস্তিষ্কধারী মানুষ এ মত পোষণ করতে পারবে না যে, ইসলামে জেহাদ কেবল বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে ও নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে করতে হয় এবং আত্মরক্ষার ও সীমান্ত রক্ষার মধ্যেই তাকে সীমিত রাখতে হয়।

জেহাদের অনুমতি দানকারী উপরোক্ত তিনটি আয়াতের দ্বিতীয়টিতেই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, পার্থিব জীবনের একটা চিরন্তন স্বাভাবিক মূলনীতি এই যে, পৃথিবী থেকে অশান্তি ও নৈরাজ্য দূর করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা এক মানুষের সাহায্যে আরেক মানুষকে প্রতিহত করেন। (অর্থাৎ সৎ মানুষের সাহায্যে অসৎ মানুষকে দমন করেন) আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা যদি মানুষের মধ্য থেকে একজনের সাহায্যে আরেকজনকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে বহু মসজিদ, মন্দির ও গীর্জা ধ্বংস হয়ে যেতো। ....'

সুতরাং এটা কোনো অস্থায়ী ব্যবস্থা নয়, বরং চিরস্থায়ী ব্যবস্থা। পৃথিবীতে হক ও বাতিলের সহাবস্থান যে অসম্ভব সেটা একটা শাশ্বত সত্য। ইসলাম যখনই সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর একক ও সর্বময় প্রভুত্ব কায়েম করা ও মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়ার কথা ঘোষণা করবে, তখনই পৃথিবীতে যারা আল্লাহর ক্ষমতাকে অবৈধভাবে হস্তগত করেছে, তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেবে এবং কখনো তার সাথে আপোষ করবে না। ইসলাম মানুষকে ওই অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য থেকে মুক্ত করার জন্যে প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেয়, প্রয়োজনে তাদেরকে ধ্বংস করার নীতি অব্যাহত রাখে। পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরি বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার এই চিরন্তন মানব মুক্তির সংগ্রাম কখনো বন্ধ হয় না।

মক্কায় মুসলমানদেরকে সশস্ত্র জেহাদ থেকে নিবৃত্ত করার পেছনে সংগত কারণ ছিলো। কেননা মক্কায় প্রচারের স্বাধীনতা ছিলো। বনু হাশেম গোত্রের সংঘবদ্ধ তরবারিগুলো রসূল (স.)-এর জন্যে এতোটুকু নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছিলো, যাতে তিনি খোলাখুলিভাবে সবাইকে দাওয়াত দিতে পারেন এবং সবাইকে এই দাওয়াতের বাণী শুনাতে ও বুঝাতে পারেন। সেখানে এমন কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছিলো না, যা তাঁকে ইসলাম

প্রচার করা থেকে বা জনগণকে তা শ্রবণ থেকে বিরত রাখতে পারে। কাজেই এ পর্যায়ে শক্তি প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। এ ছাড়া এই স্তরে আরো কিছু কারণ ছিলো, যা আমি সূরা নেসার ৭৭ নং আয়াতের তাফসীর প্রসংগে উল্লেখ করেছি। এখানে তার কিছু উদ্ধৃতি দেয়া সমীচীন মনে করছি,

'সম্ভবত এর কারণ এই ছিলো যে, মক্কী যুগ ছিলো প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির যুগ। একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ও নির্দিষ্ট পরিবেশে নির্দিষ্ট একটা জাতির জন্যেই ছিলো এই প্রশিক্ষণ। এই পরিবেশে প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের একটা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো আরব জনগণকে এমন একটা জিনিসের ব্যাপারে সহনশীল ও ধৈর্যশীল বানানো, যে ব্যাপারে সাধারণত সহনশীল হওয়া যায় না। সে জিনিসটা হলো নিজের ওপর বা প্রিয়জনের ওপর অত্যাচার। এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, জীবনের বৃহত্তর লক্ষ্য হাসিলে মানুষ যেন সাময়িকভাবে নিজের ও নিজের প্রিয়জনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে ও ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। নিজের ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণও তাদেরকে দেয়া হয়েছিলো, যাতে তারা প্রথম উস্কানিতেই উত্তেজিত হয়ে না যায়। অথচ এটাই ছিলো তাদের স্বভাব। এই স্বভাবটাকে নিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের চালচলনে ও আচরণে ভারসাম্য স্থাপন করতে চাওয়া হয়েছিলো। এই প্রশিক্ষণ দেয়ার আরো একটা উদ্দেশ্য ছিলো তাদেরকে এমন একটা সংগঠনের আনুগত্য করতে অভ্যস্ত করা, যার নেতৃত্বকে সবাই জীবনের সকল বিষয়ের শেষ ফয়সালা গ্রহণের স্থান বলে মান্য করবে এবং তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে না, তা সে যতোই তার ইচ্ছা ও অভ্যাসের পরিপন্থী হোক। এই প্রশিক্ষণ ছিলো গোত্রীয় সংকীর্ণতার উর্ধের এক সৎ, মার্জিত, সুসভ্য ও প্রগতিশীল নেতৃত্বের অনুগত 'ইসলামী সমাজ' গড়ার পথে ব্যক্তি গঠনের প্রথম পদক্ষেপ।'

মক্কী জীবনে সশস্ত্র লড়াইয়ের নির্দেশ না দেয়ার একটা কারণ এও হতে পারে যে, শান্তিপূর্ণ, উদার ও অহিংস পন্থায় যে দাওয়াত দেয়া হয়, তা অধিকতর প্রভাবশালী ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। বিশেষত কোরায়শদের মতো মানষিকতা সম্পন্ন মানুষের পরিবেশে এটা আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেননা তারা ছিলো অত্যধিক আভিজাত্যের গর্বে গর্বিত। তাই এ স্তরে সশস্ত্র লড়াই তাদেরকে আরো উগ্র ও উত্তেজিত করে তুলতে পারতো এবং দাহিস, গাবরা, বাসূস প্রভৃতি জাহেলী যুগের দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের মতো নতুন নতুন লড়াইয়ের জন্ম দিতে পারতো। ওই সকল লড়াইতে বহু গোত্র একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। নতুন করে ওই ধরনের লড়াই সংঘটিত হলে এবং তার প্রতিশোধ স্বরূপ নতুন নতুন ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হলে তা মানুষের মনে ও স্মৃতিতে ইসলামের সাথেই জড়িত হতো। ফলে এই উত্তেজনা আর কখনো প্রশমিত হতো না। ফলে ইসলাম একটা দাওয়াত থেকে প্রতিশোধের আন্দোলনে রূপান্তরিত হতো। এভাবে দাওয়াতের শুরুতেই তার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সবাই ভুলে যেতো। পরে আর কেউ তাকে স্মরণ করতো না।

ঘরে ঘরে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশংকাও হয়তো এর আর একটা কারণ ছিলো। কারণ তৎকালে সুসংগঠিত কোনো রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ছিলো না, যা মুসলমানদেরকে শাস্তি দিতে বা নির্যাতন করতে সক্ষম ছিলো। প্রত্যেক ইসলাম গ্রহণকারীর অভিভাবককেই দায়িত্ব দেয়া হতো শাস্তি দেয়া ও দমন করার। এরূপ পরিস্থিতিতে সশস্ত্র লড়াইয়ের অনুমতি বা নির্দেশ দেয়া হলে প্রত্যেক ঘরে ঘরে লড়াই বেধে যেতো। আর তখন বলা হতো, 'এই হচ্ছে ইসলাম'। এমনকি লড়াই করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও এই অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। ব্যবসা ও হজ্জের মওসুমে কোরায়শ নেতারা বহিরাগতদেরকে বলতো, 'মোহাম্মদ শুধু নিজের গোত্রে ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই নয়, বরং পিতা পুত্রের মধ্যেও গন্ডগোল বাধিয়েছে। সুতরাং ইসলাম যদি মক্কায় কাফেরদের সাথে সশস্ত্র

লড়াই-এর নির্দেশ দিতো, তবে তা হতো প্রত্যেক বাড়ীতে ও প্রত্যেক পাড়ায় পিতাকে হত্যা করতে পুত্রের প্রতি ও মনিবকে হত্যা করতে দাসদাসীর প্রতি নির্দেশ দানের শামিল। আর এরূপ হলে ইসলামের কি সাংঘাতিক দুর্নাম রটতো, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এর আরো একটা কারণ এও হতে পারে যে, প্রথম যুগে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে ইসলাম ত্যাগ করানোর চেষ্টা করেছে এমন বহু কট্টর বিরোধীও যে পরবর্তীকালে ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক ও সৈনিকে এমনকি নেতায় পরিণত হবে, তা আল্লাহ জানতেন। হযরত ওমর (রা.)ও তো এ ধরনেরই একজন ছিলেন।

এর অপর একটা কারণ এও হতে পারে যে, একজন মযলুমের ক্রমাগত নীরবে অত্যাচার সহ্য করে যাওয়া এবং কোনো অবস্থাতেই আদর্শ ত্যাগ করতে রাযী না হওয়ার দৃশ্য দেখে আরবের গোত্রীয় পরিবেশে আরবীয় সহানুভূতি ও সৌহার্দ বোধের স্বতস্ফূর্ত বিস্ফোরণ ঘটা অনিবার্য ছিলো, বিশেষত নির্যাতন যখন সমাজের গণ্যমান্য লোকদের ওপরও পতিত হতো। কিছু কিছু ঘটনা এই ধারণার সত্যতা প্রমাণও করেছে। যেমন ইবনুদ্ দাগানা নামক জনৈক আরব গোত্রপতি আবু বকরের ন্যায় সৎ ও নিরীহ ব্যক্তিকে মক্কা ছেড়ে হিজরত করে যেতে দিতে চাননি। কেননা এটা তার কাছে আরব জাতির জন্যে কলংকজনক ঘটনা মনে হয়েছিলো। তিনি হযরত আবু বকরকে পূর্ণ নিরাপত্তাসহ আশ্রয় দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মক্কায় থেকে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করেন। এর সর্বশেষ প্রমাণ ছিলো শিয়াবে আবু তালেবে বনু হাশেমকে অবরুদ্ধ রাখা সম্পর্কে যে চুক্তি হয়েছিলো, তা গোপনে এক অজানা ব্যক্তি কর্তৃক ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা। বনু হাশেমের ক্ষুধা ও নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার পর এক পর্যায়ে এ ঘটনাটা ঘটে। অথচ তৎকালীন কোনো কোনো সমাজের রীতি এমন অদ্ভুত ছিলো যে, নীরবে নির্যাতন সহ্য করলে মযলুমকে উল্টো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতো এবং অত্যাচারীকে করা হতো সম্মান।

এর আরো একটা কারণ ছিলো সম্ভবত তৎকালীন মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতা এবং তাদের মক্কায় কেন্দ্রীভূত থাকা। কেননা মক্কার বাইরে আরব উপদ্বীপের অন্য কোথাও ইসলামের দাওয়াত তখনো পৌঁছেনি, অথবা ছিটে ফোঁটা উড়ো খবরের আকারে পৌঁছেছে। মক্কার বাইরের গোত্রগুলো এসব খবরের ভিত্তিতে যেটুকু জেনেছিলো, তাতে তারা পুরো ব্যাপারটাকে কোরায়শ গোত্রের একটা অভ্যন্তরীণ কোন্দল ভেবে তার প্রতি নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করেছিলো। তারা শুধু অপেক্ষা করতো এই কোন্দলের পরিণাম কি দাঁড়ায় তা দেখার জন্যে। এরূপ পরিস্থিতিতে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমানকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হলে এই সীমিত যুদ্ধে হয়তো ওই মুষ্টিমেয় মুসলিম দলটি গণহত্যার কবলে পড়ে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। এমনকি তারা নিজেদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী কাফের নিধনে সক্ষম হলেও তাতে কোনো লাভ হতো না। পৌত্তলিকতা ও শেরক যেমন ছিলো, তেমনই থেকে যেতো। পৃথিবীতে ইসলামের কোনো রাষ্ট্র বা সরকারও কোনো দিনই গঠিত হতো না, তার কোনো বাস্তব অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যেতো না। অথচ এটা এমন একটা ধর্ম, যা পৃথিবীতে এসেছেই একটা বাস্তব জীবন ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে। ....'

ওদিকে মদীনায় হিজরতের পরের প্রথম দিককার সময়টিও সশস্ত্র লড়াই-এর উপযোগী ছিলো না। মদীনার অধিবাসী ইহুদীদের সাথে এবং মদীনার ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মোশরেক আরবদের সাথে রসূল (স.) যে সব চুক্তি সম্পাদন করেন, তা ছিলো ওই স্তরেরই একটা স্বভাবজাত উপাদান এবং সশস্ত্র লড়াই থেকে মুসলমানদের বিরত থাকাই ছিলো ওই উপাদানের স্বাভাবিক দাবী।

এর প্রথম কারণ হলো, সেখানে প্রচারের সুযোগ অবশিষ্ট ছিলো। এমন কোনো রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সেখানে ছিলো না, যা প্রচারে বাধা দেয় এবং জনসাধারণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সেখানকার সকল অধিবাসী নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছিলো এবং সেই রাষ্ট্রের যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় রসূল (স.)-এর নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছিলো। চুক্তিতে এই মর্মে সুস্পষ্ট অংগীকার লিখিত ছিলো যে, কোনো মদীনাবাসী রসূল (স.)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে কারো সাথে কোনো সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করবে না, কোনো যুদ্ধ বাধাবে না এবং কোনো বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না। মদীনায় প্রকৃত ক্ষমতা যে মুসলিম নেতৃত্বেরই হাতে নিবদ্ধ ছিলো, তা সবাই জানতো। সুতরাং দাওয়াতের সুযোগ ছিলো অবারিত ও উন্মুক্ত এবং মানুষের যে কোনো মত, পথ ও বিশ্বাস অবলম্বনের পথে কোনো বাধা ছিলো না।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রসূল (স.) এই পর্যায়ে একান্তভাবে শুধু কোরায়শদের প্রতি মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন। কেননা তাদের ইসলাম বিরোধিতাই আরবের অন্যান্য গোত্রের জন্যেও ইসলামে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিলো, যারা কোরায়শ গোত্রের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের পরিণতি কী দাঁড়ায় তা দেখার জন্যে প্রতীক্ষারত ছিলো। এ জন্যে রসূল (স.) ছোটো ছোটো 'সামরিক অভিযান' পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। হিজরতের ৭ম মাসে পবিত্র রমযানে হযরত হামযা (রা.)-এর নেতৃত্বে তিনি প্রথম 'ক্ষুদ্র সামরিক অভিযান' প্রেরণ করেন।

এরপর ক্রমাগত ছোট ছোট সামরিক অভিযান প্রেরণের পালা চলতে থাকে নবম মাসে, ত্রয়োদশ মাসে, ষোড়শ মাসে এবং আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে সপ্তদশ মাসে। এই শেষোক্ত সামরিক অভিযানটি প্রথমবারের মতো সশস্ত্র সংঘর্ষ ও হত্যাকান্ডে জড়িয়ে পড়ে। এ হত্যাকান্ড নিষিদ্ধ মাসে সংঘটিত হওয়ার কারণে তা নিয়ে সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়!

'তোমার কাছে তারা নিষিদ্ধ মাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা নিদারুণ অপরাধ বটে। তবে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে জোরপূর্বক ফিরিয়ে রাখা, আল্লাহর প্রতি কুফরী করা, মসজিদুল হারামের দিকে যেতে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা তো আরো বড় অপরাধ। আর মানুষকে নির্যাতন করা হত্যাকান্ড ঘটানোর চেয়েও মারাত্মক অপরাধ। সম্ভব হলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকেই ফিরিয়ে আনতে চায় এবং এটা করতে না পারা পর্যন্ত তোমাদের সাথে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যেতে চায়। ......' (আয়াত ২১৭)

এরপর ওই বছরেরই রমযান মাসে সংঘটিত হয় বদরের ভয়াবহ যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধ নিয়েই নাযিল হয়েছে আলোচ্য সূরা আনফাল।

এই সময়কার পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করলে এ কথা বলার কোনোই অবকাশ থাকে না যে, প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে 'আত্মরক্ষাই ছিলো ইসলামী আন্দোলনের মূলনীতি, যেমনটি পরিস্থিতির চাপে ও কুচক্রী ওরিয়েন্টালিস্টদের আগ্রাসী অপপ্রচারের মুখে পরাজিত মানসিকতাধারীরা বলে থাকে।

ইসলামের সম্প্রসারণমুখী অগ্রাভিযানের পেছনে যারা নিছক প্রতিরক্ষামূলক কার্যকারণ অনুসন্ধান করে থাকেন, তারা নিশ্চিতভাবে প্রাচ্যবাদীদের তাত্ত্বিক আগ্রাসনের শিকার। এ তাত্ত্বিক আগ্রাসন দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা এমন এক সময়ে চালাচ্ছে যখন মুসলমানদের কোনো শক্তি সামর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তি তো নেই-ই, এমনকি সত্যিকার অর্থে ইসলামও তাদের মধ্যে নেই। তবে সেই সব ভাগ্যবান লোকের কথা স্বতন্ত্র, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এরূপ অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন

এবং যারা পৃথিবীতে মানব জাতিকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য ছাড়া আর সকল কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ইসলামের উদার আহবানকে বাস্তবায়িত করতে বাস্তবে কাজ শুরু করেছে যাতে করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর দ্বীন ও আল্লাহর আনুগত্য বিজয়ী হয়। এ সব ভাগ্যবান মানুষ ইসলামের জেহাদ সংক্রান্ত বিধানের পেছনে আত্মরক্ষার ওজুহাত খোঁজার পরিবর্তে নৈতিক কারণ অন্বেষণ করে থাকেন।

ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার প্রসারের পেছনে পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে যে নৈতিক কারণসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার চেয়ে বেশী আর কোনো নৈতিক কারণ অনুসন্ধানের আবশ্যকতা নেই।

......'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং নির্যাতিত নারী পুরুষ ও শিশুদের মুক্তির জন্যে লড়াই করো না? ....(সূরা নেসা আয়াত ৭৪, ৭৫ ও ৭৬)

'..... তাদের সাথে সেই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও যখন আর কোনো ফেতনা তথা অরাজকতা ও যুলুম অবশিষ্ট থাকবে না এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীন জয়ী হবে। (সূরা আনফাল, আয়াত ৩৮, ৩৯ ও ৪০ এবং সূরা তাওবার আয়াত ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩২)

এ আয়াতগুলোতে পৃথিবীতে আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, মানব জীবনে আল্লাহর আইন ও বিধান বাস্তবায়ন, শয়তান ও তার রীতিনীতির উচ্ছেদ এবং মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধকারী মানুষের কর্তৃত্ব উৎখাতের পক্ষে অকাট্য যুক্তি আলোচিত হয়েছে। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলা হয়েছে যে, মানব জাতি শুধু আল্লাহর গোলাম, আর কারো নয়। তাই আল্লাহর আর কোনো বান্দার এ অধিকার নেই যে, নিজের শক্তি বলে তাদের ওপর নিজের শাসন চালায় এবং নিজের মনগড়া আইন জারী করে। এই সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, 'ধর্ম গ্রহণে কোনো জোরজবরদস্তি নেই।' অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত হবার পর মানুষ আল্লাহর দ্বীনকে গ্রহণ করবে কি করবে না, সে ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। মানুষের গোলামী বর্জনের মাধ্যমেই সে আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব ও সর্বাত্মক আনুগত্যের প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছে।

এগুলো হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষকে আল্লাহর দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আল্লাহর একক ও সর্বাত্মক দাসত্বের বন্ধনে অবদ্ধ করার পক্ষের যুক্তি। এ যুক্তির পরে অন্য কিছুর প্রয়োজন থাকে না। এ যুক্তিগুলো মুসলিম বীরদের মনেও উৎকীর্ণ ছিলো। তাই তাদের কেউ 'কী কারণে জেহাদে এসেছো': এ প্রশ্নের সম্মুখীন হলে এ কথা কখনো বলেননি যে, আমাদের দেশ বিদেশী আক্রমণের হুমকির সম্মুখীন ছিলো, তাই দেশরক্ষার প্রয়োজনে এসেছি, কিংবা মুসলমানদের ওপর রোমক ও পারসিকদের আগ্রাসন প্রতিহত করতে এসেছি অথবা আমাদের দেশের সীমানা সম্প্রসারণ ও অধিকতর গনিমতের সম্পদ লাভের জন্যে এসেছি।

কাদেসিয়ার যুদ্ধে পারসিক বাহিনীর অধিনায়ক রুস্তম যখন রারনী ইবন আমের, হোযায়ফা ইবনে মুহসান এবং মুগীরা ইবনে শো'বাকে এক নাগাড়ে তিন দিন যাবত পালাক্রমে জিজ্ঞাসা করেন যে, কী উদ্দেশ্যে তোমরা এসেছো, তখন তারা যে জবাব দিয়েছিলেন, প্রত্যেক মুসলিম বীরই সে রকম জওয়াব দিতো। ওই তিন জনের জওয়াব ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন যেন আমরা তাঁর বান্দাদেরকে বান্দাদের গোলামী থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর বান্দা হবার আহ্বান জানাই, পৃথিবীর সংকীর্ণ পরিসর থেকে বিস্তীর্ণ পরিসরে নিয়ে যাই, বিভিন্ন ধর্মের শোষণ নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে ইসলামের ইনসাফের দিকে নিয়ে যাই। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির কাছে তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছেন। যে ব্যক্তি আমাদের এই দাওয়াতকে গ্রহণ করবে, আমরা তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করবো, ফিরে যাবো এবং তার ভূমি তার হাতে

সোপর্দ করে দেবো। আর যে অস্বীকার করবে, তার সাথে যুদ্ধ করবো, যতোক্ষণ না বিজয়ী হই অথবা জান্নাতে যাই।'

বস্তুত ইসলামের স্বভাব প্রকৃতিতে, তার সর্বজনীন ঘোষণায় ও আবেদনে এবং মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন পর্যায়ে অনুসরণের জন্যে বিদ্যমান তার বাস্তব বিধানে তার একটা মৌলিক ও স্বতন্ত্র ইতিবাচক যুক্তি রয়েছে। কোনো মুসলিম দেশ বা তার অধিবাসীদের ওপর কোনো দিক থেকে আগ্রাসনের ঝুঁকি না থাকলেও ওই মৌলিক যুক্তি প্রথম থেকেই বহাল রয়েছে। ইসলামী বিধানে ও তার বাস্তবতার স্বাভাবিক আবেদনেই এ যুক্তি নিহিত রয়েছে এবং মানব সমাজে বিরাজমান বাস্তব সমস্যার সমাধানে এর স্বাভাবিক কার্যকারিতা বিদ্যমান। সুতরাং শুধু সাময়িক আত্মরক্ষার প্রয়োজনের মধ্যেই ইসলাম সীমাবদ্ধ নয়।

একজন মুসলমানের জন্যে যে কোনো পার্থিব স্বার্থের প্রলোভনমুক্ত হয়ে শুধু ওইসব নৈতিক মূল্যবোধের খাতিরে 'আল্লাহর পথে' জেহাদ করার উদ্দেশ্যে নিজের জান ও মাল বাজি রেখে বেরিয়ে পড়া নিসন্দেহে এক মহান ব্রত। এর জন্যে তার অন্য কোনো যুক্তির প্রয়োজন নেই।

একজন মুসলমান রণাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগে নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে, লোভ লালসা ও কামনা বাসনার বিরুদ্ধে, নিজের ও নিজের আপনজনদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, বৃহত্তর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকে। ইসলামের পরিচয় ব্যতীত অন্য যে কোনো পরিচয়ের বিরুদ্ধে, আল্লাহর দাসত্ব ব্যতীত অন্য যে কোনো দাসত্বের বিরুদ্ধে এবং আল্লাহর অধিকারকে জবরদখলকারী তাগুতী শক্তিসমূহকে উৎখাত করে পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর আইন প্রচলনের উদ্দেশ্যেও সে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

পক্ষান্তরে যারা শুধুমাত্র 'মুসলিম আবাসভূমি' রক্ষার জন্যে ইসলামী জেহাদের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন, তারা 'ইসলামী আদর্শ ও বিধান'কে উপেক্ষা করেন এবং তাকে 'আবাসভূমি'র চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। অথচ এ ধারণা ইসলামের দৃষ্টিভংগির সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এ ধারণা ইসলামী চেতনা ও অনুভূতির সাথে বেমানান ও বেখাপ্পা। আসলে আকীদা বিশ্বাস, আকীদা বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত জীবন বিধান এবং এই জীবন বিধানের অনুসারী সমাজ বা মানব গোষ্ঠীই হলো ইসলামী চেতনার কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। নিছক ভূমির কোনো গুরুত্ব বা মূল্য ইসলামে নেই। ইসলামী চিন্তা চেতনায় ভূমির যদি কোনো মূল্য থেকে থাকে, তবে সেটা ওই ভূমিতে আল্লাহর বিধান ও সার্বভৌমত্ব কতোটা কার্যকর আছে তার ভিত্তিতেই। আল্লাহর বিধান ও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়িত থাকলেই ওই ভূমি হবে 'দারুল ইসলাম' বা ইসলামের দেশ। ইসলামী আকীদা ও আদর্শের লালন ক্ষেত্র এবং ওই ভূমি থেকেই সূচনা হবে মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করনের অভিযাত্রার।

একথা সত্য যে, 'দরুল ইসলাম'কে রক্ষা করলে ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদেরই রক্ষা করা হয়। কিন্তু সেটা চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে পারে না। মুসলিম আবাসভূমিকে রক্ষা করা ইসলামী জেহাদ আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। ওটা শুধু ওই ভূমিতে আল্লাহর রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যম মাত্র। একমাত্র আল্লাহর রাজত্বকে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার সংগ্রাম পরিচালনার ঘাঁটি হলেই ওই ভূমি ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যবান– অন্যথায় নয়। ইসলামের মূল প্রতিপাদ্য হলো মানুষ এবং ভূমি হলো তার বিশাল কর্মক্ষেত্র মাত্র।

আগেই বলেছি যে, পৃথিবীতে আল্লাহর আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠার যে কোনো চেষ্টা বিরাজমান রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, সমাজ ব্যবস্থা ও সামগ্রিক পরিস্থিতি পরিবেশের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। ইসলাম এই সব প্রতিবন্ধকতা সর্বশক্তি দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে চায়, যাতে সে জনগণের কাছে অবাধে পৌঁছতে পারে এবং স্বাধীনভাবে তার বিবেক ও মনের কাছে নিজের বক্তব্য রাখতে

পারে। এজন্যে সর্ব প্রথম সে জনগণকে বস্তুগত বাধা বিপত্তি থেকে মুক্ত করে এবং তারপর তাকে যে কোনো মত ও পথ গ্রহণের স্বাধীনতা প্রদান করে।

ইসলামের জেহাদ তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবাদীরা যে আগ্রাসী অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, তা দ্বারা আমাদের বিভ্রান্ত বা ভীত হওয়া উচিত নয়। বিশ্ব শক্তির মাপকাঠিতে প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে আমাদের এতোটা ঘাবড়ে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নয় যে, আমরা ইসলামের জেহাদ নীতির জন্যে ইসলামের স্বভাব বিরোধী কিছু নৈতিক যুক্তির অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হব এবং তাকে সাময়িক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করবো। কেননা কোনো সাময়িক প্রতিরক্ষার প্রয়োজন দেখা দিক বা না দিক, ইসলামের জেহাদ যথারীতি অব্যাহত থাকে।

ইসলামের ঐতিহাসিক বাস্তবতার কথা বিবেচনায় রেখে আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এর স্বভাব প্রকৃতিতে এর সর্বজনীন ঘোষণায় এবং এর বাস্তব জীবন বিধানেই জেহাদের আবশ্যকতা সুপ্ত রয়েছে এবং এ আবশ্যকতাকে সাময়িক আত্মরক্ষার আবশ্যকতার সাথে মিলিয়ে জগাখিচুড়ি করা যায় না। এ কথা সত্য বটে যে, আগ্রাসন পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করে ইসলামের উপায় থাকে না। কেননা পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবার গোলামী থেকে মুক্তিদানের সংকল্প প্রকাশের মাধ্যমে ইসলাম যদি নিছক নিজের অস্তিত্বের ঘোষণাও দেয়, আর তার এ অস্তিত্ব যদি জাহেলী নেতৃত্ব ব্যতীত নতুন কোনো নেতৃত্বের অধীন এমন একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলনরত মানব গোষ্ঠীর আকারে আত্মপ্রকাশ করে, যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে না। তাহলে পৃথিবীতে ইসলামের এরূপ অস্তিত্বের বিদ্যমানতাও সমকালীন জাহেলিয়াত বরদাশত করতে পারে না, মানুষ কর্তৃক মানুষের দাসত্বের নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমকালীন জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা এ ধরনের ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে যে উঠে পড়ে লেগে যাবে, তা অবধারিত। কেননা এটা জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই প্রয়োজন। আর এমতাবস্থায় নতুন ইসলামী সমাজের পক্ষে নিজের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করে গত্যন্তর থাকে না।

এটা একটা অনিবার্য ব্যাপার। ইসলামের জন্মের সাথেই এর জন্ম হয়ে থাকে। ইসলামের ঘাড়ে এ যুদ্ধ অবধারিতভাবেই চেপে বসে। সে ইচ্ছা না করলেও এ যুদ্ধে তাকে লিপ্ত হতেই হয়। এ হচ্ছে এমন দুটো সত্ত্বার স্বাভাবিক সংঘাত, মুহূর্তের জন্যেও যাদের সহাবস্থান সম্ভব নয়।

এ সবই সত্য কথা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং তার ওপর চাপিয়ে দেয়া প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে।

তবে এখানে এর চেয়েও অধিকতর মৌলিক একটা সত্য নিহিত রয়েছে। সেটি এই যে, পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের গোলামী থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে যাওয়া ইসলামের অস্তিত্বের একটা স্বভাবগত দাবী। এই অগ্রাভিযানে সে কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা মানতে পারে না এবং কোনো বর্ণ বা বংশগত জাতিসত্ত্বার মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। নিজেকে এভাবে সীমিত গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে সে পৃথিবীর অধিবাসী গোটা মানব জাতিকে অরাজকতা, অসততা ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ হতে দিতে পারে না।

ইসলামের শত্রুদের জীবনে কখনো এমন সময় আসাও বিচিত্র নয় যখন সে ইসলামের ওপর আগ্রাসী আক্রমণ না চালানোকেই হয়তো অগ্রাধিকার দেবে। ইসলাম যদি তাদেরকে তাদের আঞ্চলিক সীমার ভেতরে মানুষ কর্তৃক মানুষের হুকুমের গোলামীর নীতি চালাতে দেয়, তাদেরকে মানব মুক্তির ঘোষণার আওতাভুক্ত না করে এবং তাদেরকে তার আকীদা ও আদর্শের দাওয়াত না

দেয়, তাহলে এমন একটা অনাক্রমণের নীতি মেনে চলতে বাতিল শক্তি কোনো এক সময় রাযী হয়েও যেতে পারে। কিন্তু ইসলাম কোনো অবস্থাতেই তাকে এই ছাড় দিতে বা তার সাথে আপোষ করতে পারে না যতোক্ষণ না সে ইসলামের আধিপত্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে কর দিতে প্রস্তুত হবে এবং এভাবে কোনো প্রশাসনিক বাধা বিঘ্ন ছাড়াই সেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর পথ উন্মুক্ত করে দেবে।

এটা ইসলামের শুধু স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য নয়, বরং সারা পৃথিবীতে আল্লাহর একক প্রভুত্ব বিস্তার এবং মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য সকলের গোলামী থেকে মুক্ত করার সর্বজনীন ও শাশ্বত ঘোষণা দাতা হিসাবে এটা তার কর্তব্যও বটে।

ইসলামের এই দায়িত্বটাকে একটা মৌলিক স্বভাবসুলভ দায়িত্ব মনে করা এবং একটা নির্দিষ্ট প্রজাতিক বা আঞ্চলিক সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ দায়িত্ব মনে করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। একমাত্র আগ্রাসনের আশংকা ছাড়া আর কোনো জিনিস তাকে শেষোক্ত ধরনের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে সে স্বয়ংক্রিয় ও স্বতস্ফূর্তভাবে দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হতে পারে না।

ইসলামী জেহাদের সপক্ষে অকাট্য যুক্তি কেবল তখনই স্পষ্টভাবে ও গভীরভাবে উপলব্ধি করা যাবে যখন এ কথা হৃদয়ংগম করা হবে যে, ইসলাম সমগ্র মানব জাতির জন্যে আল্লাহর রচিত জীবন বিধান– কোনো শ্রেণী বা গোষ্ঠী বিশেষের জন্যেও নয় এবং শ্রেণী বা গোষ্ঠী বিশেষ কর্তৃক রচিতও নয়। আমরা জেহাদের বহিরাগত কারণ অনুসন্ধানে তখনই ব্যাপৃত হয়ে থাকি, যখন উপরোক্ত ধারণা আমাদের চেতনা থেকে লুপ্ত হয় এবং আমরা ভুলে যাই যে, জেহাদ জিনিসটা মূলত পৃথিবীতে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও আল্লাহর বান্দাদের গোলামী উচ্ছেদের সাথে জড়িত। যে ব্যক্তি এই মহা সত্যটি স্মরণ রাখে, তার পক্ষে ইসলামী জেহাদের অন্য কোনো যুক্তি অন্বেষণ করা সম্ভব নয়।

ধারণা করা যেতে পারে যে, ইসলাম স্বেচ্ছায় না হলেও বাধ্য হয়ে একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলো। কেননা অন্যান্য জাহেলী সমাজের উপস্থিতিতে তার অস্তিত্বই তাদের জন্যে যথেষ্ট উস্কানি বহন করতো এবং তারা তার ওপর আক্রমণ না করেই ছাড়তো না। আবার এমনও ধারণা করা যেতে পারে যে, ইসলাম নিজেই প্রথমে লড়াইয়ের সক্রিয় উদ্যোগ না নিয়ে পারেনি। প্রাথমিক বিবেচনায় এই দুই ধারণার মধ্যে তেমন বড় কোনো পার্থক্য নেই। কেননা উভয় অবস্থায়ই সে অনিবার্যভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। কিন্তু চূড়ান্ত বিবেচনায় এ দুই ধারণার মধ্যে বিরাট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। উভয়টি ইসলামের চেতনায় ও তাৎপর্যে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করে।

ইসলামকে দু'ভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমত তা এমন এক ঐশী জীবন ব্যবস্থা, যা পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহকে সর্বময় প্রভু এবং মানব জাতিকে একমাত্র তাঁরই গোলাম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছে। আর এই জীবন ব্যবস্থাকে সে এমন একটা বাস্তব মানবীয় সামাজিক অবকাঠামোতে রূপান্তরিত করতে চায়, যার ভেতরে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ শুধু আল্লাহর বান্দা হবে এবং তাঁর বান্দাদের বান্দা হবে না। তাই ওই সামাজিক অবকাঠামোতে আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইন কার্যকর হবে না। আর এই আইনের মাধ্যমে সমাজের সর্বত্র কেবল আল্লাহরই সর্বময় কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি এই বিবেচনাটাই সঠিক বলে মেনে নেয়া হয়, তা হলে ইসলাম নিশ্চয়ই তার পথ থেকে সকল বাধা দূর করার অধিকার রাখে, যাতে সে বিনা বাধায় মানুষের মন ও বিবেকের কাছে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে। তার এ কাজে দেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে বাধা আসুক অথবা সামাজিক পর্যায় থেকে বাধা আসুক, সে বাধাকে গুঁড়িয়ে

দেয়ার ন্যায্য অধিকার তার রয়েছে। দ্বিতীয়ত, তা একটা নির্দিষ্ট ভূখন্ডের স্থানীয় ব্যবস্থা। সে ক্ষেত্রে তার শুধু তার সীমার অভ্যন্তরে বসে যে কোনো বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের অধিকার থাকে। উল্লিখিত দুটো ধারণারই প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। ইসলাম যদিও উভয় অবস্থাতেই লড়াই করবে। কিন্তু এই লড়াই বা জেহাদের প্রেরণা, উদ্দেশ্য ও ফলাফল দুই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পৃথক। দুই ক্ষেত্রেই জেহাদ সংক্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস, পরিকল্পনা ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের হতে বাধ্য।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট জাতি গোষ্ঠীর বা কোনো নির্দিষ্ট ভূখন্ডের জীবন ব্যবস্থা নয়, বরং বিশ্ব প্রভু আল্লাহর রচিত এ জীবন ব্যবস্থা গোটা বিশ্বের জন্যে। তাই প্রথমে সক্রিয় হয়ে মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্নকারী সকল সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বাধা বিপত্তি অপসারণের অধিকার ইসলামের রয়েছে। অবশ্য সে তার আকীদা বিশ্বাসকে গ্রহণ করার জন্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কারো ওপর চাপ সৃষ্টি করে না। সে শুধু এতোটুকুই ছাড় দিয়ে থাকে– এর চেয়ে বেশী নয়। যে সমস্ত সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-ব্যবস্থা জনগণের ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, মানুষের সহজাত সদিচ্ছা ও সদগুণাবলীকে বিনষ্ট করে এবং মানুষের মত, পথ ও লোক নির্বাচনের স্বাধীনতাকে শৃংখলিত করে, সেই সব বিধি ব্যবস্থাকে সে নিজের পথের বাধা মনে করে এবং তা দূর করা তার শুধু ন্যায্য অধিকারই নয় বরং তার ওপর অর্পিত অপরিহার্য্য দায়িত্ব।

মানুষকে আল্লাহর গোলামদের গোলামী থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা ইসলামের ন্যায় সংগত অধিকার। কেননা সূচনাতেই সে যে আল্লাহকে সারা বিশ্ব জগতের একমাত্র রব ও প্রতিপালক বলে ঘোষণা করেছে এবং সকল মানুষকে স্বাধীনতা দানের সংকল্প ব্যক্ত করেছে, সেই সংকল্প বাস্তবায়নের একমাত্র উপায় হলো মানুষকে আল্লাহর বান্দায় পরিণত করার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ। আর মানুষকে আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতা ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়– ইসলামের দৃষ্টিতেও নয়, বাস্তবতার দৃষ্টিতেও নয়। কারণ একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই আল্লাহর সেই আইন চালু হয়ে থাকে, যা তিনি তাঁর সকল বান্দার উপযোগী করে রচনা করেছেন। শাসক শাসিত, সাদা কালো, আত্মীয় অনাত্মীয়, ধনী গরীব সকলের জন্যে ইসলামের একই আইন রয়েছে এবং সকল নাগরিক তার সমান অনুগত, ইসলাম ছাড়া অন্যান্য বিধি ব্যবস্থায় মানুষ আল্লাহর বান্দাদের গোলামী করে থাকে। কেননা তারা নিজেদের জীবন যাপনের আইন ও বিধান বান্দাদের কাছ থেকেই গ্রহণ করে। আর এটা হলো খোদায়ী বৈশিষ্ট্য। কোনো মানুষ যখনই দাবী করে যে, সে জনগণের জন্যে আইন রচনা করে দেয়ার আধিকার রাখে, তখন সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে ওই জনতার ইলাহ তথা খোদা বা মাবুদ বলে ঘোষণা করে– চাই সে এরূপ ঘোষণা প্রকাশ্যে করুক বা না করুক। আর যখনই কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের এ ধরনের অধিকার, দাবী স্বীকার করে, তখন সে তাকে নিজের ইলাহ বা খোদা বলেই স্বীকার করে– চাই সে কথা সে স্পষ্ট করে বলুক বা না বলুক।

ইসলাম শুধু একটা অকীদা-বিশ্বাস বা মতবাদ নয় যে, তা কোনো প্রচার মাধ্যম দ্বারা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়াই যথেষ্ট হবে। ইসলাম হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থা এমন একটা আন্দোলনমুখী সুসংগঠিত সমাজের আকারে আত্মপ্রকাশ করে, যা সকল মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দানের জন্যে সক্রিয় অভিযান চালায়। ইসলামী সমাজ ছাড়া অন্যান্য সমাজ ইসলামকে এমন সুযোগ দেয় না যাতে সে তার বিধান অনুসারে এ সব সমাজের লোকদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারে। তাই মানুষের স্বাধীনতার পথের বাধা এই সব সমাজ ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা ইসলামের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এটাই হলো, 'সমস্ত আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার' প্রকৃত মর্মার্থ। এতে করে আল্লাহর কোনো বান্দার প্রতি অন্য

বান্দাদের কোনো মৌলিক আনুগত্য থাকবে না, যেমনটি থাকে মানুষের প্রতি মানুষের আনুগত্য ভিত্তিক অন্য সকল বিধি ব্যবস্থায়। সমকালীন যে সমস্ত ইসলামী গবেষক বর্তমান বিজয়ী বাতিল সমাজ ব্যবস্থা ও কুচক্রী প্রাচ্যবাদীদের দুরভিসন্ধিমূলক অপপ্রচারণার প্রভাবের কাছে পরাজিত, তারা ওই সত্যটি খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। কারণ প্রাচ্যবাদীরা ইসলামকে এমন একটা আন্দোলন হিসাবে চিত্রিত করেছে, যা তরবারির জোরে মানুষকে তার আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে। অথচ ওই সকল ঘৃণ্য প্রাচ্যবাদী ভালোভাবেই জানে যে, তাদের ওই কথা সত্য নয়। তবু তারা এভাবে ইসলামী জেহাদের উদ্দীপনার উৎসগুলোকে বিকৃত করার চেষ্টা করে। আর এরই প্রভাবে ইসলামের দুর্নামের ভয়ে ভীত হয়ে এক শ্রেণীর মুসলিম বুদ্ধিজীবী এই অভিযোগ খন্ডন করার প্রয়াসে আত্মরক্ষামূলক যুক্তির আশ্রয় নেয়। অথচ তারা ইসলামের স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে তার দায়িত্ব ও অধিকারের কথা ভুলে যায়।

পরাজিত মানসিকতাসম্পন্ন গবেষকদের চিন্তাধারার ওপর 'ধর্মের' প্রকৃতি সম্পর্কে যে পাশ্চাত্য ধারণাটা সওয়ার হয়ে আছে তা এই যে, ধর্ম হলো নিছক অন্তরে বিদ্যমান ব্যক্তিগত আকীদা বিশ্বাস। এর সাথে জীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই ধর্মের জন্যে জেহাদের আবশ্যকতার কথা বললেই তারা মনে করে, জনগণের বিবেকের ওপর ইসলামী আকীদা বিশ্বাসকে বল প্রয়োগে চাপিয়ে দেয়ার কথাই বলা হচ্ছে। অথচ ইসলামের আসল ব্যাপার মোটেই তা নয়। ইসলাম হচ্ছে মানব জীবনের জন্যে আল্লাহর রচিত জীবন বিধান। এ জীবন বিধান আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ তথা সার্বভৌম মনিব, প্রভু ও শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং সকল দৈনন্দিন খুঁটিনাটি সহ বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়িত করে। কাজেই ইসলামের জন্যে যে জেহাদ, তা হচ্ছে ইসলামের আইন ও বিধি-ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জেহাদ বা সংগ্রাম। কিন্তু ইসলামের মূল আকীদা-বিশ্বাস চাপিয়ে দেয়ার জন্যে কোনো জেহাদ বা সংগ্রাম করতে বলা হয়নি। আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করা বা না করা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তবে এই স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে এমন কোনো উপাদান থেকে থাকলে তা অপসারণের জন্যে সে প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রামের আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেটা ওই পর্যন্তই। স্বাধীনতা ক্ষুণ্নকারী উপাদান দূর হওয়ার পর সে মানুষের বিবেককে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। সুতরাং ধর্ম সংক্রান্ত পাশ্চাত্যের ও ইসলামের ধ্যান ধারণায় মৌলিক পার্থক্য রয়েছে এবং এর ইসলামী চিত্র সম্পূর্ণ আলাদা ও অভিনব।

পৃথিবীর যেখানেই আল্লাহর বিধান অনুসারী কোনো ইসলামী সমাজ থাকবে, সেখানে আল্লাহ তায়ালা সেই সমাজকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ ও শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার আন্দোলন ও অভিযান পরিচালনার অনুমতি দেন। কেবল আকীদা বিশ্বাসের বিষয়টি জনগণের বিবেকবুদ্ধির স্বাধীনতার ওপর ছেড়ে দেন। এরূপ একটা সমাজকে আল্লাহ তায়ালা যদি কিছু কালের জন্যে সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে বিরত রাখেন, তাহলে সেটা নীতিগত নয় বরং কৌশলগত ব্যাপার বলে পরিগণিত হবে। সেটা হবে আন্দোলনের চলমান স্তরের দাবী ও চাহিদার ব্যাপার মাত্র, আদর্শ ও আকীদাগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার নয়। এই সুস্পষ্ট নীতিগত বিশ্লেষণের আলোকে ইতিহাসের নিত্য নতুন স্তরে আমরা কোরআনের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে পারি। এসব বক্তব্যের আলোকে ইসলামী আন্দোলনের সুদীর্ঘ ও অপরিবর্তনীয় মূলনীতির সাধারণ দাবী ও নির্দিষ্ট স্তরের সাময়িক দাবী একেবারেই স্বতন্ত্র। এ দুই দাবীকে মিলিয়ে একাকার করে ফেলার কোনো অবকাশ নেই।

এরপর ইসলামী জেহাদের প্রকৃতি ও ইসলামী জীবন বিধানের প্রকৃতি সম্পর্কে আরো কিছু কথা অবশিষ্ট থেকে যায়। এ ব্যাপারে আমাদেরকে অত্যন্ত মূল্যবান ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপহার

দিয়েছেন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর 'আল্লাহর পথে জেহাদ' শীর্ষক পুস্তিকায়। এই পুস্তিকা থেকে আমাদের একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইসলামী আন্দোলনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে নির্ভুল ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভে আগ্রহী পাঠকদের জন্যে এ উদ্বৃতিগুলো অত্যন্ত জরুরী। সাইয়েদ মওদূদী বলেন,

'সাধারণত ইংরেজী ভাষায় জেহাদ শব্দের অনুবাদ 'হোলি ওয়ার' বা পবিত্র যুদ্ধ করা ইংরেজদের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপরন্তু দীর্ঘকাল যাবত এ শব্দটির এমন অবাঞ্ছিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে যে, এটা এখন উন্মত্ততা, 'হিংস্রতা', 'রক্তপাত' ও 'অসভ্যপনার' প্রতিশব্দে পরিণত হয়েছে। এ শব্দটা শোনার সাথে সাথে শ্রোতার কল্পনার দৃষ্টিতে এমন এক ভয়াবহ দৃশ্য ভেসে ওঠে যেন ধর্মোন্মাদদের একটা দল রক্ত-পিপাসু চোখে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে ধেয়ে আসছে আর কাফেরদের পাওয়া মাত্র গ্রেফতার করে তাদের ঘাড়ে তলোয়ার রেখে বলছে, 'কলেমা পড়ো, নতুবা এখনই তোমার মস্তক ছেদন করা হবে। মতলববাজ লেখকরা শঠতার সাথে আমাদের এরূপ চিত্র এঁকেছে এবং তার সাথে মন্তব্য জুড়ে দিয়েছে যে, 'এ জাতির ইতিহাস থেকে রক্তের গন্ধ আসে।'

'বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আমাদের এ চিত্র যারা এঁকেছে, তারা নিজেরাই বিগত কয়েক শতাব্দীকাল যাবত মারাত্মক নোংরা যুদ্ধে (un holy war) লিপ্ত রয়েছে। তাদের চরিত্র এতো জঘন্য ও বীভৎস যে, তারা সম্পদ ও শক্তির লোভে সকল প্রকার অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দস্যুর ন্যায় সারা পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারা সর্বত্র ব্যবসায়ের বাজার, কাঁচামাল, উপনিবেশ স্থাপনের অঞ্চল ও মূল্যবান দ্রব্যাদির খনি সন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছে। লালসার আগুনের ইন্ধন সংগ্রহ করে তাকে চির প্রজ্বলিত রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের এ যুদ্ধ আল্লাহর পথে নয়, বরং উদরের পথে। লালসা ও লোভের পংকিল পথেই তাদের সকল চেষ্টা নিয়োজিত। ....'

'আমরা যা কিছু করেছি তা অতীতের ব্যাপার। কিন্তু তাদের এ কীর্তিকলাপ তো আধুনিক যুগের। সাম্প্রতিক কালের প্রত্যেকটি দিন ও রাতে সভ্য জগতের অধিবাসীদের চোখের সামনেই তাদের হীন কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা এক কথায় পৃথিবীর একটি অংশও এই লালসা পংকিল যুদ্ধলিপসু জাতির নিষ্ঠুর ও অপবিত্র আক্রমণের আঘাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। তথাপি তারা আমাদের চিত্র এতো বিভীষিকাময় করে এঁকেছে যে, তাদের নিজস্ব কদর্য চিত্র তার অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেছে।'

'পক্ষান্তরে আমাদের সরলতা বড়ই মর্মান্তিক। শত্রুপক্ষ কর্তৃক আমাদের চিত্র দেখে আমরা এতোদূর ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছি যে, তার পশ্চাতে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্বয়ং চিত্র নির্মাতাদের চেহারাটা দেখার কথা পর্যন্ত আমরা একদম ভুলে গেছি। আমরা বরং কাতর কণ্ঠে ও অনুতাপের সাথে বলতে শুরু করেছি যে, 'হুযুর, যুদ্ধ ও প্রাণনাশের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তো বৌদ্ধ ভিক্ষু, পাদ্রী ও দরবেশদের ন্যায় শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রচারক মাত্র। নির্দিষ্ট কয়েকটা বিশ্বাসের প্রতিবাদ এবং তদস্থলে অপর কয়েকটা আকীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও লোকদেরকে তা মানার আবেদন জানানোই আমাদের কাজ। তরবারির সাথে তো আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ হয়তো আমরা কখনো কখনো অন্যদের আগ্রাসনের শিকার হওয়ার কারণে নিয়ে ফেলেছি। তবে সে সব তো অনেক দিন আগের কথা। এখন আমরা তাও বাদ দিয়েছি। এমনকি আপনাদের যাতে অস্বস্তি দূর হয় ও শান্তিতে ঘুমাতে পারেন, সেজন্যে তরবারির যুদ্ধকে আমরা সরকারীভাবে বাতিল করে দিয়েছি। এখন শুধু মুখ ও লেখনীর মধ্যেই ধর্ম প্রচারকে সীমিত রেখেছি। কামান, বন্দুক ও গোলাবারুদ ব্যবহার তো আপনাদের কাজ। মুখ ও কলম প্রয়োগই আমাদের একমাত্র উপায়।'

'শুধু রাজনৈতিক কূটকৌশলের পরিণামেই এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু সে সব কারণে আল্লাহর পথে জেহাদের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করা কেবল অমুসলমানই নয় বরং মুসলমানদের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় ব্যাপারটা যাচাই করলে তাতে দুটি প্রধান ও মৌলিক ভুল ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম ভুল ধারণা এই যে, ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের ন্যায়, সাধারণত যে অর্থে ধর্ম শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তদনুযায়ী নিছক একটা ধর্ম বলে মনে করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় ভুল ধারণা এই যে, মুসলমানদেরকে অন্যান্য জাতির ন্যায় সাধারণত যে অর্থে জাতি শব্দটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে তদনুযায়ী নিছক একটা জাতি মনে করা হয়েছে।'

'এই দুটো ভ্রান্ত ধারণা শুধু জেহাদের ব্যাপারটাই নয়, বরং সামগ্রিকভাবে গোটা ইসলামের রূপকেই পরিবর্তিত ও বিকৃত করে দিয়েছে এবং অনেকের জন্যে ইসলামী জেহাদের তাৎপর্য অনুধাবন করার পথ বাধাগ্রস্ত করে দিয়েছে। এমনকি পৃথিবীতে মুসলমানদের স্থান ও মর্যাদাও সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট করে ফেলেছে।'

'সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী ধর্ম বলতে কতকগুলো আকীদা-বিশ্বাস ও কয়েকটা এবাদাত অনুষ্ঠানের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু বুঝা যায় না। এ অর্থের দিক দিয়ে ধর্ম নিসন্দেহে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। এমতাবস্থায় যে কোনো আকীদা মনে স্থান দেয়া, মন যার এবাদাত করতে ইচ্ছুক তারই এবাদাত করা, যেভাবে ইচ্ছা তাকে ডাকা ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তিই লাভ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট ধর্মের জন্যে খুব বেশী দরদ ও প্রেম বোধ করলে পৃথিবী ব্যাপী নিজ আকীদার প্রচার করা এবং অন্যান্য আকীদাপন্থীদের সাথে বিতর্ক ও বাহাস করার অধিকারও তার রয়েছে। এতোটুকু কাজের জন্যে তরবারি ধারণ করার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? লোকদেরকে মারধোর করে তো কোনো আকীদার প্রতি বিশ্বাস জন্মানো যায় না।

বস্তুত ইসলামকে যদি সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী একটা 'ধর্ম' হিসেবেই মেনে নেয়া হয় এবং ইসলাম যদি আসলেই তাই হয়, তাহলে বাস্তবিকপক্ষে জেহাদের সমর্থনে কোনো সংগত যুক্তিই পেশ করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে 'জাতি' বলতে সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট এমন একটা জনসমষ্টিকে (A homogeneous group of men) বুঝায়, যারা কয়েকটা মৌলিক ব্যাপারে অংশীদার হওয়ার কারণে একত্রিত এবং অন্যান্য সমষ্টি থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ অর্থের দিক দিয়ে যে মানব সমষ্টি একটা জাতির মর্যাদা পাবে, তাদের পক্ষে তরবারি ধারণ তথা সশস্ত্র সংগ্রাম করার মাত্র দুটো কারণই থাকতে পারে। এক, তাদের ন্যায়সংগত অধিকার হরণ করার জন্যে কেউ তাদের ওপর আক্রমণ করলে। দুই, তারা নিজেরাই অপরের ন্যায়সংগত অধিকার কেড়ে নেয়ার জন্যে আক্রমণ করতে চাইলে। প্রথম অবস্থায় তরবারি ধারণের কিছু না কিছু নৈতিক বৈধতা রয়েছে, যদিও কোনো কোনো শান্তিবাদীর দৃষ্টিতে এটাও অন্যায় ও অবৈধ। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থাটাকে চরম ডিক্টেটর ছাড়া আর কেউ বৈধ বলে দাবী করতে পারে না। এমনকি আমেরিকা ও বৃটেনের ন্যায় বিশাল সাম্রাজ্যের কূটনীতিকরাও একে সংগত বলার ধৃষ্টতা দেখাবে না।'

'সুতরাং ইসলাম যদি নিছক একটা ধর্ম হয়ে থাকে এবং মুসলমান যদি নিছক একটা জাতি হয়, তবে জেহাদ কিছুতেই সর্বোত্তম এবাদাত হতে পারে না। বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তার অর্থহীনতা ও অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আসলে ইসলাম কোনো ধর্ম নয় এবং মুসলমানও প্রচলিত অর্থে নিছক কোনো জাতির নাম নয়। ইসলাম একটা বিপ্লবী মতাদর্শ। সমগ্র পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে তার নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী নতুন করে তা ঢেলে গঠন করাই ইসলামের চরম ও পরম লক্ষ্য। আর মুসলমান একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দল বিশেষ (International Revolutionary party)। ইসলামের বাঞ্ছিত কার্যসূচী বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সংঘবদ্ধ করা হয়েছে। আর এ

উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যে ইসলামী দলের বিপ্লবী চেষ্টা সাধনা ও চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগের (Revolutionary struggle) নামই জেহাদ।'

অন্যান্য বিপ্লবী মতাদর্শের ন্যায় ইসলামও সাধারণভাবে প্রচলিত শব্দ পরিত্যাগ করে নিজস্ব একটা পরিভাষা ব্যবহার করেছে। ফলে তার বিপ্লবী ধারণা প্রচলিত সাধারণ ধারণা হতে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। জেহাদ শব্দটাও এই বিশেষ পরিভাষার অন্যতম। 'হারব' (যুদ্ধ) বা এই অর্থবোধক অন্য কোনো আরবী শব্দ ইসলাম স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই ব্যবহার করেনি। এর পরিবর্তে সে ব্যবহার করেছে 'জেহাদ' শব্দটা। এটা সংগ্রামের সমার্থক, বরং এর আধিক্যের অর্থ জ্ঞাপক। কিন্তু পুরনো ও সাধারণ প্রচলিত শব্দ ত্যাগ করে এই নতুন শব্দ কেন ব্যবহার করা হলো। এর একমাত্র উত্তর হলো, ব্যক্তি কিংবা দলসমূহের পংকিল স্বার্থ উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও সাম্রাজ্যগুলো যে সব যুদ্ধ ও গণহত্যা চালিয়েছে, যুদ্ধ শব্দটা সেটাই বুঝাবার জন্যে চিরদিন ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এ সব যুদ্ধের লক্ষ্য হয়ে থাকে ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধি। তাতে কোনো মতাদর্শ অথবা কোনো নিয়ম নীতির সমর্থন ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মোটেই থাকে না। কিন্তু ইসলামের যুদ্ধ এ ধরনের নয় বলে গোড়াতেই এ শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। বিশেষ কোনো জাতির লাভ বা ক্ষতি সাধন এর লক্ষ্য নয়। দেশের ওপর কোন শাসকের শাসন চলবে সে বিষয়েও তার ভ্রুক্ষেপ নেই। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে শুধু মানবতার কল্যাণ সাধন। এই কল্যাণের জন্যে ইসলাম একটা বিশেষ আদর্শ ও বাস্তব কর্মসূচী পেশ করেছে। এই নীতি ও মতাদর্শের বিপরীত যেখানেই যে শাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, ইসলাম তাকেই নির্মূল করতে চায়– তা যে জাতি বা দেশেই হোক না কেন। ইসলাম তার নিজস্ব আদর্শ ও কর্মসূচী অনুযায়ী নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কে তার পতাকা বহন করছে, আর কার শাসন ও কর্তৃত্বের ওপর তার চরম আঘাত পড়ে, সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। ইসলাম চায় গোটা পৃথিবী, পৃথিবীর কোনো অংশ নয়। সমগ্র পৃথিবীই তার লক্ষ্য। কিন্তু বিশেষ কোনো জাতি বা বহু জাতির হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অন্য কোনো বিশেষ জাতির হাতে তুলে দেয়া ইসলামের লক্ষ্য নয়। এর একমাত্র লক্ষ্য হলো, গোটা মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্যে সৃষ্টিকুলের একচ্ছত্র অধিপতির পক্ষ থেকে প্রদত্ত তার যে মতাদর্শ ও কর্মসূচী রয়েছে– যার নাম ইসলাম– তার দ্বারা সমগ্র বিশ্বমানবকে পরিতৃপ্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ করতে হবে। এই মহান উদ্দেশ্যে বিপ্লব সৃষ্টির অনুকূলে ইসলাম সমগ্র কার্যকর শক্তিকেই প্রয়োগ করতে চায়। এভাবে সমস্ত শক্তি প্রয়োগের সমষ্টিগত নামই হচ্ছে জেহাদ। মুখের ভাষা ও লেখনীর সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগিতে পরিবর্তন সাধন এবং তার মধ্যে অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টি করাকেও জেহাদ বলা যায়। তরবারি তথা অস্ত্রশক্তি প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠিত বাতিল জীবন ব্যবস্থাকে নির্মূল করে নবতর সুবিচারমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাকেও জেহাদ বলা হয়। এই পথে ধন সম্পদ ব্যয় ও শারীরিক শক্তি-সামর্থ নিয়োগ করাও জেহাদ।

কিন্তু ইসলামের জেহাদ কোনো উদ্দেশ্যহীন জেহাদ নয়। এ জেহাদ হবে শুধু আল্লাহর পথে। 'আল্লাহর পথে' কথাটা এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ শব্দ দুটো ইসলামের বিশেষ পরিভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য 'আল্লাহর পথে' কথাটা দ্বারা অনেকের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তারা মনে করেছে যে, মানুষকে জোরপূর্বক ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসে দীক্ষিত করাই বুঝি আল্লাহর পথে জেহাদ। সংকীর্ণমনা লোকেরা 'আল্লাহর পথে' কথাটার এই বিকৃত অর্থই গ্রহণ করেছে। কারণ এ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ তাদের মনে স্থান পায়নি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ এতো ব্যাপক যে, তা তাদের ধারণা-কল্পনারও অতীত।'

'কোনো ব্যক্তি কিংবা দল যখন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধন অথবা ইসলামী মতাদর্শ অনুযায়ী নব বিধান প্রণয়ন করতে অগ্রসর হবে, তখন তার এই প্রচেষ্টায় ও আত্মদানে ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ

তার লক্ষ্য হতে পারবে না– এটাই ইসলামের 'আল্লাহর পথে জেহাদে'র মর্মার্থ। 'তাগূতী শক্তিকে বিতাড়িত করে সে নিজে যেন আরেক তাগূতী শক্তি সাজার ইচ্ছা পোষণ না করে। নিজের জন্যে ধন সম্পদ, খ্যাতি, মান সম্মান, কোনো কিছু লাভ করাই যেন তার চেষ্টা-শ্রমের মূল লক্ষ্য না হয়। তার সমস্ত ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে মানব সমাজে এক ইনসাফপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা। কোরআনে সূরা নেসার ৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর কাফেররা লড়াই করে তাগুত তথা খোদাদ্রোহী শক্তির পথে।'

'হে মানুষ, তোমাদের প্রতিপালকের দাসত্ব করো– যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন'

সূরা বাকারার এই ২৯ নং আয়াতে ইসলামের বিপ্লবী আহ্বান ফুটে উঠেছে। এখানে ইসলাম শ্রমিক, কৃষক, জমিদার কিংবা কারখানার মালিক অথবা এ ধরনের কোনো বিশেষ শ্রেণীকে আহ্বান জানায়নি, বরং সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে। ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসাবেই আহ্বান জানায়। এর নির্দেশ শুধু এতোটুকু যে, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্যে লিপ্ত থেকে থাকো, তবে তা পরিত্যাগ করো। তোমাদের নিজেদের মধ্যে প্রভুত্ব লাভের মোহ থেকে থাকলে তাও দূর করো। কারণ আইন কানুন রচনার অধিকার দাবী করে অন্য লোককে নিজের দাস বানানোর কিংবা কাউকে নিজের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করার কোনো অধিকারই তোমাদের কারো নেই। তোমাদের সকলকে একই আল্লাহর দাসত্ব কবুল করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে তোমাদের সকলকে একই স্তর ও শ্রেণীভুক্ত হতে হবে, কোনো রকম দম্ভ বা বড়াই করা চলবে না। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে,

'এসো, তোমরা ও আমরা এমন একটা কথায় একমত হই, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমভাবে গ্রহণযোগ্য। সেটা এই যে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবো না। প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে কাউকে আল্লাহর অংশীদার মনে করবো না, এবং আমরা নিজেদের মধ্যে কেউ কাউকে আল্লাহর পরিবর্তে আদেশ নিষেধ দানের অধিকারী প্রভু হিসাবেও মানবো না।' (আলে ইমরান, আয়াত ৬৪)

স্পষ্টতই এটা সর্বাত্মক ও বিশ্বব্যাপী এক মহা বিপ্লবের আহ্বান। ইসলাম আরো ঘোষণা করেছে,

'হুকুম দেয়া বা প্রভুত্ব করার অধিকার আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো থাকতে পারে না।'

বস্তুত কোনো মানুষ নিজেই অন্য মানুষের শাসক ও নিয়ামক হতে পারে না, নিজের ইচ্ছামতো কোনো কাজের নির্দেশ দেয়া বা কোনো কাজ থেকে নিষেধ করার কোনো অধিকার কারো নেই। কারণ কোনো মানুষকে সার্বভৌম প্রভু ও স্বাধীনভাবে আদেশ নিষেধ জারী করার অধিকারী মনে করাই হচ্ছে সকল বিপর্যয়েরমূল উৎস।

'ইসলামের তাওহীদ ও এক আল্লাহর এবাদাতের আহ্বান অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসের ন্যায় নিছক ধর্মীয় আমন্ত্রণই নয়। বরং এটা একটা সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের ডাক। সমাজে যারা ধর্মের ক্ষেত্রে পুরোহিত, রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজা বাদশাহ, শাসক, নেতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহাজন, জমিদার ও ইজারাদার সেজে জনগণকে নিজেদের গোলামে পরিণত করেছে, তাদের প্রত্যেকের ওপরই ইসলামের এই বিপ্লবী দাওয়াতের প্রত্যক্ষ ও প্রচন্ড আঘাত পড়ে। কারণ তারা কোথাও প্রকাশ্যভাবে খোদা হয়ে বসেছে, আর কোথাও নিজেদের জন্মগত কিংবা শ্রেণীগত অধিকারের ভিত্তিতে জনগণের আনুগত্য লাভের দাবী করছে। তারা স্পষ্ট ভাষায় বলে থাকে, 'আমি ছাড়া তোমাদের কোনো প্রভু নেই।' 'আমি তোমাদের সর্বোচ্চ রব।' 'জীবন মৃত্যুর আমিই হর্তাকর্তা।

'আমার চেয়ে বেশী শক্তিশালী আর কে আছে! আবার কোথাও এরা জনগণের অজ্ঞতা ও মূর্খতা আপন স্বার্থে ব্যবহার করার জন্যে কৃত্রিম খোদার মূর্তি বানিয়ে নিয়েছে। এই সবের আড়ালে তারা জনগণের ওপর নিজেদের খোদায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। অতএব কুফর, শিরক ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ইসলামের দাওয়াত এবং এক আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতির জন্যে ইসলামের প্রচারমূলক কার্যক্রম সরাসরিভাবেই সমসাময়িক সরকার, সরকার সমর্থক কিংবা সরকার আশ্রিত শ্রেণীসমূহের স্বার্থের সাথে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। এই কারণে যখনই কোনো নবী 'হে আমার জাতি, একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব স্বীকার কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো প্রভু ও মাবুদ নেই' বলে আহ্বান জানিয়েছেন। সমসাময়িক সরকার তখন প্রবল শক্তি সহকারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। সকল প্রকার দুর্নীতিপরায়ণ ও শোষক শ্রেণী তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কারণ এ দাওয়াত নিছক কোনো অতি প্রাকৃতিক ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাপারের বিশ্লেষণ ছিলো না, বরং তা ছিলো এক সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের উদাত্ত আহ্বান। এ আহ্বান কর্ণগোচর হওয়ার সাথে সাথে প্রবল রাজনৈতিক আলোড়নের আভাস পাওয়া যেতো।'

'ইসলাম নিছক একটা ধর্ম বিশ্বাস এবং কতকগুলো এবাদাত অনুষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র নয়। মূলত ইসলাম এক পরিপূর্ণ ও ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা। বিশ্ববাসীর জীবনক্ষেত্র থেকে সকল প্রকার অত্যাচার-শোষণ ও অন্যায় নিয়ম নীতির মূলোৎপাটন করে। তদস্থলে এক পূর্ণাংগ সংস্কারমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। কারণ মানবতার কল্যাণ ও মংগল বিধানের জন্যে তার দৃষ্টিতে এটাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা।'

'এই ভাংগাগড়া ও বিপ্লব সংশোধনের জন্যে ইসলাম বিশেষ কোনো জাতিকে আহ্বান জানায় না। তার আহ্বান সমগ্র মানবতার প্রতি, গোটা মানব জাতি এমনকি স্বয়ং যালেম, শোষক ও দুর্নীতিপরায়ণ জাতি ও শ্রেণীসমূহের প্রতি এবং রাজা বাদশাহ, সমাজপতি ও নেতৃবৃন্দের প্রতি। সবাইকে ইসলাম তার এই বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানায়। সবার প্রতিই তার বক্তব্য এই যে, সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত সীমার মধ্যেই জীবন যাপন ও যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করো। তোমরা সত্য ও সুবিচারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই তোমাদের জীবনে সর্বাংগীন শান্তি ও নিরাপত্তা সূচিত হবে। এই ক্ষেত্রে কোনো মানুষের সাথে ইসলামের শত্রুতা নেই। ইসলামের শত্রুতা শুধু যুলুমের সাথে, বিপর্যয় ও বিশৃংখলার সাথে এবং অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতার সাথে আর আল্লাহর নির্ধারিত স্বাভাবিক ব্যবস্থা অনুযায়ী যা একজনের প্রাপ্য নয়, তা লাভ করার জন্যে কেউ চেষ্টা করলে তার সাথেও ইসলামের শত্রুতা রয়েছে।'

'এই আহ্বান যারাই গ্রহণ করবে তারা যে কোনো জাতির, বংশের, শ্রেণীর বা দেশেরই লোক হোক না কেন, তারা সকলেই সমান অধিকার ও সমান মর্যাদার ভিত্তিতে ইসলামী দল ও সমাজের সদস্য রূপে গণ্য হবে এবং এভাবে এরাই সেই আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দলে রূপান্তরিত হবে, যাকে কোরআন 'আল্লাহর দল' নামে আখ্যায়িত করেছে এবং যার অন্য নাম হচ্ছে ইসলামী দল বা মুসলিম উম্মাহ।'

'এ দলটি গঠিত হয়েই স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে জেহাদ শুরু করে দেয়। এ দলের বর্তমান থাকাটাই অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চূর্ণ করা এবং তার পরিবর্তে এক সুবিচারপূর্ণ ও ভারসাম্যযুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যাকে কোরআন 'আল্লাহর কলেমা' বলেছে, প্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করা অপরিহার্য সাব্যস্ত করে। এই দল যদি রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিববর্তন সাধন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে চেষ্টা না করে, তবে তার অস্তিত্ব লাভের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ এর অন্য কোনো উদ্দেশ্য তো আদৌ ছিলো না। আর এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে জেহাদ ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। কোরআনের ভাষায় এই দলের অস্তিত্ব লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো,

'তোমরা সেই সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ ও ন্যায় কাজের জন্যেই লোকদেরকে নির্দেশ দাও। আর নিষিদ্ধ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখো এবং আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল থাকো।' (আল ইমরান, আয়াত ১১০)

এটাকে কোনো ধর্ম প্রচারক ও অরাজনৈতিক মিশনারী দল মনে করা কারো উচিত নয়। মূলত এটা আল্লাহর সেনাবাহিনী। পৃথিবী থেকে যুলুম, শোষণ, অশান্তি, চরিত্রহীনতা, দুর্নীতি ও সকল প্রকার খোদাদ্রোহিতাকে বলপূর্বক নির্মূল করা সত্য ও ইনসাফের পতাকা সমুন্নত করা, মানব জাতির ওপর সাক্ষী হওয়া, সকল অহংকারী ও খোদাদ্রোহীর মূলোৎপাটন এবং ধনী গরীব, আপন পর সবার কল্যাণ বিধানের যোগ্য একটা ন্যায়পরায়ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই তার কাজ। এই বিষয়ের দিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত কটিতে,

'তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও যতোদিন না অশান্তি ও বিপর্যয় চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করার সুযোগ পায়।' (আনফাল- ৩৮)

'তোমরা যদি এ দায়িত্ব পালন না করো, তবে সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, ধ্বংস ও ভাংগন ব্যাপক আকার ধারণ করবে।' (আনফাল- ৭৩)

'আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে জীবন যাপনের নির্ভুল পন্থা এবং সত্য অনুসরণের সঠিক ব্যবস্থাসহ প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি প্রচলিত সকল প্রকার আনুগত্য অনুসরণ চূর্ণ করে দিয়ে সত্য অনুসরণের এই ব্যবস্থাকে অন্য সব কিছুর ওপর জয়ী করে দেন, যদিও মোশরেকরা তা পছন্দ করে না।' (তাওবা- ৩৩)

অতএব রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করা ছাড়া এই দলের জন্যে অন্য কোনো উপায় থাকতে পারে না। কারণ বিপর্যয়মূলক সমাজ ব্যবস্থা আসলে একটা ভারসাম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমর্থন ও সহযোগিতার ফলেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে কোনো সুস্থ, নির্ভুল ও কল্যাণময় সমাজ ব্যবস্থাই কায়েম হতে পারে না, যতোক্ষণ না রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী নৈরাজ্যবাদী ও অসৎ লোকদের হাত থেকে সৎ ও সংস্কারবাদীদের হাতে ন্যস্ত হবে।'

ইসলামের কাংখিত বিশ্ব সংস্কারের কথা বাদ দিলেও, রাষ্ট্রব্যবস্থাপনা যখন বিপরীত আদর্শবাদীদের কুক্ষিগত থাকে, তখন এই আল্লাহর দলের সদস্যদের পক্ষে নিজের সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করাও আদৌ সম্ভব নয়। একটা দল যেখানে বিশেষ কোনো জীবন ব্যবস্থাকে সত্য ও কল্যাণকর বলে মনে করে, সেখানে কোনো বিপরীত ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কিছুতেই জীবন যাপন করা যেতে পারে না। ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকায় বাস করে কোনো কমিউনিস্টের পক্ষে কমিউনিজমের পূর্ণ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্রশক্তির প্রবল চাপে সেখানকার পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা আপনা থেকেই তার ওপর কার্যকরী হবে। অনুরূপভাবে একজন মুসলমানও অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চাইলে কিছুতেই সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। কারণ যে সব আইন বিধানকে সে বাতিল মনে করে, যে সব কর খাযনাকে সে অন্যায়, অসংগত ও অত্যাচারমূলক মনে করে, যে ধরনের আচার আচরণ ও বিধি ব্যবস্থাকে সে খারাপ ও ধ্বংসাত্মক বিবেচনা করে এবং যে ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি তার দৃষ্টিতে মারাত্মক, তার প্রত্যেকটি তার নিজের ঘর বাড়ী ও সন্তান সন্ততির ওপর প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে। তার আক্রমণ থেকে সে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। কাজেই বিশেষ কোনো আদর্শ ও আকীদায় বিশ্বাসী লোকেরা স্বভাবত বিরোধী আদর্শের শাসন নির্মূল করে তাদের নিজেদের আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হতে বাধ্য। তা না করলে তারা নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করার কোনো সুযোগ পাবে না। কেউ এই চেষ্টা না করলে কিংবা এর প্রতি

অবজ্ঞা দেখালে নিশ্চয়ই মনে করতে হবে যে, মূলত কোনো আদর্শের প্রতিই তার বিশ্বাস নেই। সে বিশ্বাসের দাবী করলেও তার সে দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। এ প্রসংগেই আল্লাহ সূরা তওবার ৪৩, ৪৪ ও ৪৫ নং আয়াতে বলেন,

'হে নবী, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, তুমি লোকদের জেহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দিলে কেন! ওটা সমীচীন হয়নি। (জেহাদই এমন একটা মাপকাঠি,) যা দ্বারা তোমাদের খাঁটি ঈমানদার ও মিথ্যা ঈমানদারদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রমাণিত হতে পারে। যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তারা জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে তোমার নিকট কখনো আবেদন করবে না। অবশ্য যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না, একমাত্র তারাই এই জেহাদের কর্তব্য থেকে বিরত থাকার অনুমতি চাইতে পারে, অন্য কেউ নয়।'

পবিত্র কোরআনের চেয়ে সত্য ও অকাট্য সাক্ষ্য আর কে দিতে পারে? সূরা তাওবার এ আয়াত কয়টিতে কোরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে যে, মুসলমান হয়েও যে ব্যক্তি জেহাদের আহ্বানে সাড়া দেয় না, আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্যে জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করে না, নিজের গৃহীত বিধান ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে না, সে আল্লাহ ও আখেরাতে অবিশ্বাসী ও সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' .....

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আশা করি এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামী জেহাদের মূল উদ্দেশ্য। বিশেষ কোনো দেশ কিংবা কয়েকটি মাত্র দেশেই নয়, বরং সমগ্র দুনিয়ায় ইসলাম এই সর্বাত্মক বিপ্লব সৃষ্টি করতে চায়। এই মুসলিম দলটি নির্দিষ্ট কোনো ভূখন্ড আকড়ে বসে থাকবেনা পৃথিবীর যে ভূখন্ডে সম্ভব হবে হিজরতের মাধ্যমে সেখানে গিয়ে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে মনে রাখতে হবে বিশ্ব বিপ্লব (World Revolution) সৃষ্টি করাই তাদের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ লক্ষ্য। বস্তুত যে বিপ্লবী দল জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে গোটা মানবতার কল্যাণের জন্যে চেষ্টা করবে, তার মূল লক্ষ্য ও কার্যক্রম বিশেষ কোনো জাতি কিংবা ভূখন্ড ভিত্তিক হতে পারেনা। পবিত্র কোরআনের কোনো আইন দেশের চতুসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বরং বিপ্লবের স্বাভাবিক প্রবণতায়ই তা এক বিশ্ব বিপ্লবের রূপ ধারণ করে। সত্য কখনো ভৌগোলিক সীমারেখা স্বীকার করে না। কোনো নদী কিংবা পর্বতের এক দিকে যা সত্য, অপরদিকেও তা সত্য রূপে স্বীকৃতি পাবে। এটাই সত্যের চিরন্তন দাবী। মানব জাতির কোনো একটি অংশকেও এই সত্য থেকে বঞ্চিত করা যায় না। মানুষ যেখানেই যুলুম নিপীড়নের শিকার, সেখানেই তাদের মুক্তি নিশ্চিত করার জন্যে উপনীত হওয়া সত্যের কর্তব্য। পবিত্র কোরআনে সূরা নেসার ৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ এ কথাই বলেছেন,

'তোমাদের কী হয়েছে যে, সেই সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের সাহায্যার্থে তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো না, যারা দুর্বল বলে নির্যাতিত হচ্ছে এবং যারা এই বলে প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ! এই যালেম অধ্যুষিত জনপদ থেকে আমাদের মুক্তি দাও।'

এতদ্ব্যতীত জাতীয় ও আঞ্চলিক বিভাগ সত্তেও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এতো ব্যাপক যে, এর ফলে কোনো একটি রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ কোনো আদর্শ অনুযায়ী পূর্ণরূপে চলা সম্ভব হয় না, যতোক্ষণ না প্রতিবেশী দেশসমূহেও অনুরূপ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব মানব জাতির পূর্ণাংগ সংস্কার সাধন এবং আদর্শভিত্তিক আত্মরক্ষার জন্যে একটি মাত্র দেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে ক্ষান্ত না হওয়া, বরং শক্তি ও সামর্থ অনুসারে উক্ত রাষ্ট্রকে আরো সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করাই একটি ইসলামী দলের প্রধানতম কর্তব্য। তারা একদিকে ইসলামের বিপ্লবী চিন্তাধারা

ও মতবাদ প্রচার করবে এবং সকল দেশের অধিবাসীকে তা গ্রহণ করার আহ্বান জানাবে। কেননা এতেই তাদের প্রকৃত ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অপরদিকে তাদের শক্তি-সামর্থ থাকলে অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে তার মূলোচ্ছেদ করবে এবং তার পরিবর্তে ইসলামের সর্বাত্মক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে, যা ন্যায় বিচার ও ইনসাফ নিশ্চিত করে এবং যার ভিত্তি শাশ্বত ও চিরস্থায়ী।'

হযরত নবী করীম (স.) এবং তাঁর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন এই পন্থায়ই কাজ করেছেন। তাঁরা আরব দেশ থেকেই এই বিপ্লব শুরু করেন। অতপর ইসলামের সূর্য সেখান থেকে সারা বিশ্বে আলোক ছড়ায়। রসূল (স.) পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের রাষ্ট্রনায়ক ও জনগণকে ইসলামের বিপ্লবী আদর্শ ও নীতি গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। ঐসব দেশের শাসকগোষ্ঠী ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের এই আহ্বানে সম্মত হলে তারা মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর এতে অসম্মত হলে রসূল (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদীন তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি রোম ও ইরান এই দুই দুর্ধর্ষ দাম্ভিক অনৈসলামী সাম্রাজ্যের ওপর একই সাথে আক্রমণ শুরু করেন এবং হযরত ওমরের সময় তা সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। তাঁর আমলে ওই সকল সাম্রাজ্য ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।'(১)

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রকৃতি ও তাৎপর্য, ইসলামে জেহাদের প্রকৃতি ও মান, ইসলামের বিধান ও জেহাদের ক্ষেত্রে তার পরিকল্পনা ও তার স্তরভেদ সংক্রান্ত উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আমরা বদর যুদ্ধের মূল্যায়নে অগ্রসর হতে পারি, যাকে আল্লাহ 'ইয়াওমুল ফোরকান' অর্থাৎ হক ও বাতিলের মাঝে প্রভেদ সৃষ্টিকারী দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ বর্ণনার ভিত্তিতে আমরা সূরা আনফালেরও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লাভ করতে পারি। কেননা এ সূরা এই যুদ্ধ প্রসংগেই নাযিল হয়েছে।

আগেই বলেছি যে, বদর যুদ্ধ ইসলামী জেহাদের প্রথম ঘটনা ছিলো না। এর আগে কয়েকটা ছোটখাটো সমরাভিযান পরিচালিত হয়েছে, যার একটিতেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের নেতৃত্বে পরিচালিত এই সমরাভিযানটি হিজরতের সপ্তদশ মাসের মাথায় রজব মাসে সংঘটিত হয়। ইসলামী জেহাদের যে মূলনীতি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তদনুসারেই এই সব ক'টি সমরাভিযান পরিচালিত হয়। এর সব কটি যদিও কোরায়শদের লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়েছিলো, যারা রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছিলো এবং জাহেলী যুগে ও ইসলামী যুগে আল্লাহর ঘরের মর্যাদাও যথাযথভাবে রক্ষা করছিলো না, কিন্তু শুধু কোরায়শদের প্রতিশোধ গ্রহণই এসব অভিযানের আসল লক্ষ্য ছিলো না। আসল লক্ষ্য ছিলো ইসলামের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দান যে, সে পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো গোলাম হয়ে থাকতে দেবে না, বরং সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহর দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে ছাড়বে, পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করবে এবং যে সব তাগুতী শক্তি মানুষকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিলো, তাদের আধিপত্য খতম করে ছাড়বে। কোরায়শরা ছিলো সে সময়কার তাগুতী শক্তি, যারা আরব উপদ্বীপের মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে সক্রিয়ভাবে বাধা দিয়ে আসছিলো। কাজেই এই তাগুতকে পরাভূত না করে ইসলামের গত্যন্তর ছিলো না। এ তাগূতকে পরাভূত করাই ছিলো তার পরিকল্পনা এবং ওই এলাকার মানুষকে যুলুম নিপীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্ত করার একমাত্র উপায়। তা ছাড়া মদীনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে আগ্রাসনের ঝুঁকিমুক্ত করাও ছিলো এর অন্যতম লক্ষ্য। তবে এই স্থানীয় কারণগুলো বর্ণনা করার সময় আমাদেরকে

(১) এখানে এসে সাইয়েদ কুতুব ওস্তাদ মওদূদীর দীর্ঘ উদ্বৃতি শেষ করেছেন—সম্পাদক

সর্বদাই ইসলামের এই মূল প্রকৃতি ও পরিকল্পনার কথা মনে রাখতে হবে যে, সে পৃথিবীতে এমন কোনো খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তির অস্তিত্ব কোনো অবস্থাতেই সহ্য করে না, যা আল্লাহর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বকে কুক্ষিগত করে এবং তার প্রভুত্ব ও আইনের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে।

সূরা আল আনফালের আলোচনাটি উপস্থাপন করার পূর্বে আমি (বৃহত্তম যুদ্ধ) বদরের ঘটনাবলী আপনাদের সামনে পেশ করবো। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই এই সূরাটি নাযিল হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেন এই সূরার নুযুলের পটভূমি ও পরিবেশ সম্পর্কে অবগত হতে পারি এবং তার সাথে এই সূরার বিভিন্ন বক্তব্যের লক্ষ্য, বিভিন্ন ঘটনাবলীর আলোকে তার বাস্তবতা এবং সাথে সাথে ওই ঘটনাবলীর আলোকে সঠিক দিক নির্দেশনা হৃদয়ংগম ও উপলব্ধি যেন করতে পারি তাও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কারণ শুধু শাব্দিক অর্থ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আল কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের সঠিক অর্থ পুরোপুরি হৃদয়ংগম করা সম্ভব নয়, বরং তাকে হৃদয়ংগম ও উপলব্ধি করার একমাত্র পন্থা হচ্ছে ঐতিহাসিক গতিশীল পটভূমি জানা, তার ইতিবাচক বাস্তবতা এবং জীবন্ত ঘটনার সাথে বিচরণ করা। যদিও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর চেয়ে তার পরিধি ও প্রভাব অধিকতর স্থায়ী। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোকেই আল কোরআন এই বিরাট দিগন্তটি উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবেই আল কোরআনের স্থায়ী প্রভাব এবং চলমান কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী হবে। যারা একমাত্র দ্বীন 'আল ইসলামের' অনুসরণ করে এবং এই সূরার আয়াতসমূহ যাদের ব্যাপারে প্রথমবারের মত নাযিল হয়েছে, যারা তাদের নিজেদের মতো করেই এই দ্বীনের অনুশীলন করে এবং তারা যে সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলো তারাও একই ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। আর যারা যুদ্ধের মাঠে না গিয়ে ঘরের নিভৃত কোণে বসে বসে দিনগুজরান করছে এবং যারা শুধু শাব্দিক অর্থ এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আল কোরআনকে হৃদয়ংগম করতে চায়, তাদের সামনে ওই কোরআনের রহস্য কোনোদিনও উন্মোচিত হবে না। তাদের পেছনে বসে থাকা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না।

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূল (স.)-এর কাছে মদীনায় এ সংবাদ এসে পৌঁছলো যে, আবু সুফিয়ান বিন হারব একটি বৃহৎ বাণিজ্য কাফেলাসহ বাণিজ্যিক পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কোরায়শই অংশীদার। ইবনে- আকাবার বর্ণনা অনুযায়ী মক্কায় এমন কোনো কোরায়শ নারী বা পুরুষ ছিলো না যার অংশ এ কাফেলায় ছিলো না, অর্থাৎ এটা ছিলো কোরায়শদের একটি সম্মিলিত ব্যবসা। এই কাফেলায় কোরায়শ গোত্রের ত্রিশ বা চল্লিশ জন ঘোড়সওয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

ইবনে ইসহাক মোহাম্মদ বিন মুসলিম আল যুহরী, আসিম বিন ওমর বিন কাতাদাহ, আবদুল্লাহ বিন আবী বকর এবং ইয়াযিদ বিন রুমানের সূত্রে উরওয়া বিন যোবাইর ও অপরাপর বর্ণনাকারী- তাঁরা আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। ইবনে ইসহাক বলেন, উপরোক্ত সকলেই বদর যুদ্ধের কিছু কিছু অংশ আমাকে বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। তাদের সম্মিলিত বর্ণনা ছিল নিম্নরূপ-

যখন রসূল (স.)-এর কাছে মদীনায় এ সংবাদ এসে পৌঁছলো যে, আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্য কাফেলাসহ পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে এ বলে একত্র করতে লাগলেন যে, দেখো, এ হচ্ছে কোরায়শের বাণিজ্যিক কাফেলা। এতে তাদের বাণিজ্যিক পণ্য সামগ্রী মজুদ রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করো। আশা করা যায় আল্লাহ পাক এ বাণিজ্য কাফেলা থেকে তোমাদের জন্যে কিছু গনীমতের মালের ব্যবস্থা করে দেবেন। অতপর তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ডাকে সাড়া দিলো। কিছু সংখ্যক লোক অস্ত্রশস্ত্রসহ আর কিছু সংখ্যক লোক অস্ত্র ছাড়াই রওয়ানা দিলো। কারণ তারা

ধারণা করেনি যে, রসূলুল্লাহ (স.) কোনো যুদ্ধের মুখোমুখি হবেন। ইবনুল কায়্যেমের 'যাদুল মায়া'দ' এবং মাকরেযীর 'আমতা উল আসমা' গ্রন্থে এসেছে যে, স্বয়ং হুযুর (স.)ও সবার ওপর এ জেহাদে অংশ গ্রহণ করাকে অপরিহার্য বা বাধ্যতামূলক সাব্যস্ত করেননি বরং তিনি হুকুম করলেন, যাদের কাছে সওয়ারীর ব্যবস্থা আছে, তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করে। তাতে অনেকেই যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু রসূল (স.) এতে পীড়াপীড়ি করলেন না। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম বলেন, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা তিনশ তের কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশী ছিলো। তন্মধ্যে মোহাজেরদের সংখ্যা ছিলো ছিয়াশি জন। আওস গোত্রের একষট্টি জন। আর খাযরাজ গোত্রের ছিলো একশত সত্তর জন। খাযরাজ গোত্রের তুলনায় আওস গোত্রের উপস্থিতি ছিলো নগণ্য। যদিও আওস গোত্রের লোকেরা তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, শৌর্য বীর্যের অধিকারী এবং যুদ্ধের মাঠে অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিতে সক্ষম। কারণ তাদের বাড়ীঘর ছিলো মদীনার উঁচু ভূমিতে।

রসূলে কারীম (স.) -এর নির্দেশ হঠাৎ এসেছিলো। তাতে হুকুম ছিলো যে, যাদের কাছে সওয়ারীর ব্যবস্থা আছে, তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করে। তাতে অনেকেই যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকে। আর যারা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলো, কিন্তু তাদের সওয়ারী সাথে ছিলো না-ছিলো গ্রাম এলাকায়, তাঁরা গ্রাম থেকে সওয়ারী এনে পরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি চাইলো। কিন্তু এতোটা অপেক্ষা করার মতো সময় তখন ছিলো না। তাই নির্দেশ হলো যাঁদের কাছে এ মুহূর্তে সওয়ারী মওজুদ রয়েছে এবং জেহাদে যেতে চায়, তারাই শুধু এখন যাবে। বাইরে থেকে সওয়ারী এনে নেবার মতো এখন সময় নেই। কাজেই হুযুর (স.)-এর সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই তৈরী হতে পারলো। বস্তুত কিছু লোক এই জেহাদে অংশ গ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি, তার কারণ মহানবী (স.) এতে অংশগ্রহণ করা সবার জন্যে ওয়াজেব বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিলো যে, এটা তো একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র। কোনো যুদ্ধের বাহিনী নয় যে, এর মোকাবেলা করার জন্যে রসূলে কারীম (স.) এবং তাঁর সঙ্গীদের খুব বেশী পরিমাণ সৈন্য কিংবা মোজাহেদের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি।

যেহেতু পণ্য সামগ্রী ছিলো বেশী এবং রক্ষীর সংখ্যা ছিলো কম, আর পূর্বের শত্রুতার কারণে মুসলমানদের কোনো শক্তিশালী দলের তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার আশংকা ছিলো প্রবল, তাই কাফেলার সরদার আবু সুফিয়ান হেজাযের কাছে পৌঁছেই বিভিন্ন পথিকের কাছে রাস্তার খোঁজখবর নিতে লাগলো। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি তাকে সংবাদ দিলো যে, মোহাম্মদ (স.) তাঁর লোকজন নিয়ে তাদের এ কাফেলার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবু সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলো। যখন কাফেলাটি হেজাযের সীমানায় পৌঁছলো, তখন সে এক বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম ব্যক্তি দমদম্ ইবনে আমরকে কুড়ি মেসকাল সোনা দিয়ে এ ব্যাপারে রাযী করালো যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাশীঘ্র মক্কা মোকাররমায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌঁছে দেবে যে, তাদের কাফেলা মোহাম্মদ ও তাঁর সাথীদের আক্রমণের আশংকার সম্মুখীন হয়েছে।

আল্লামা মাকরেযী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইমতাউল আসমা'-তে লিখেন, দমদম ইবনে আমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী বিপদের ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোশাকের সামনের এবং পেছনের অংশ ছিঁড়ে ফেললো এবং হাওদাটিকে উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিলো এবং এ বলে চিৎকার করতে লাগলো, 'হে কোরায়শ সম্প্রদায়, হে লুই ইবনে গালিবের বংশধর! তোমরা তোমাদের বাণিজ্য কাফেলার (যাতে খুশবু ও

আতর সুগন্ধি জাতীয় দ্রব্য ও বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ মওজুদ রয়েছে। যাতে আরো রয়েছে খাবার জাতীয় জিনিসপত্র) **খবর শোনো! আবু সুফিয়ানের সাথে তোমাদের যে সম্পদ আছে, মোহাম্মদ তাঁর সংগী সাথীদের নিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করেছে। তোমাদের তা পাবার আশা নেই। সাহায্যের জন্যে চলো, দৌড়াও, সাহায্যের জন্যে দৌড়াও, চলো।'**

এ ঘোষণা ছিলো সেকালের একটি ঘোর বিপদের ঘোষণা। যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকলো, তখন গোটা মক্কা নগরীতে হৈচৈ পড়ে গেলো। সাজ সাজ রব উঠলো। সমস্ত কোরায়শ লোকেরা প্রতিরোধের জন্যে তৈরী হয়ে গেলো। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারলো তারা নিজেরা এতে অংশগ্রহণ করলো, আর যারা কোনো কারণে অপারগ ছিলো, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করতে থাকলো। এভাবে মাত্র দুই অথবা তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কোরায়শ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, তারা দুর্বলদেরকে সাহায্য করলো। তাদের মধ্য হতে সোইয়ল বিন 'আমর, যুমআ' বিন আল আসওয়াদ, তুয়াইমা বিন আ'দী, হানযালা বিন আবী সুফিয়ান এবং আমর বিন আবী সুফিয়ান মানুষদেরকে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্যে উৎসাহিত করতে থাকলো। সোহায়ল দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, হে গালিব সন্তানরা, তোমরা মোহাম্মদ এবং ইয়াছরবের অধিবাসী বাপ দাদার ধর্মচ্যুত মুসলমানদেরকে এমনিতেই ছেড়ে দেবে যে, তারা তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলার পণ্য সাগ্রমী লুট পাট করে নিয়ে যাবে? তারপর সে বললো, তোমাদের মধ্য থেকে যে সম্পদের প্রত্যাশী সম্পদ তার জন্যে প্রস্তুত। আর যে শক্তির প্রত্যাশী শক্তিও তার জন্যে অপেক্ষা করছে। অতপর উমাইয়া বিন আবিস সালত কবিতার কয়েকটি চরণের মাধ্যমে গালিব গোত্রের প্রশংসা করলো। নওফল বিন মোয়াবিয়া আদদাইলী কোরায়শ গোত্রের শক্তিধর ব্যক্তিদের কাছে গেলো এবং তাদেরকে ওই সমস্ত ব্যক্তিকে সওয়ারী এবং রাহ-খরচ দেয়ার জন্যে বললো, যারা যুদ্ধের জন্যে বের হবে। অতপর আবদুল্লাহ বিন আবী রবীয়া' দাঁড়িয়ে বললো, এই নাও পাঁচশত দীনার– যাকে খুশী তাকে দিতে পারো। নওফল বিন মোয়াবিয়া হুওয়াইতিব বিন আবদুল ওযযা থেকে দুই বা তিনশত দীনার (স্বর্ণমূদ্রা) গ্রহণ করলো। যার দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র এবং সওয়ারী খরিদ করলো। তুয়াইমা বিন আ'দী বিশটি উষ্ট্রী বোঝাই করে রসদ দিলো। আর উষ্ট্রীর আরোহীদের পরিবার পরিজনদের খরচ বাবত আর্থিক এবং বৈষয়িক সাহায্য করলো। এমনিভাবে কোরায়শ বংশের মধ্য থেকে যারা যুদ্ধে যেতে অপারগতা প্রকাশ করলো, তারা তাদের পরিবর্তে অন্যদেরকে পাঠালো। অতপর তারা দলবল নিয়ে আবু লাহাবের কাছে গেলো। কিন্তু আবু লাহাব নিজে বের হতে অথবা তার পরিবর্তে কাউকে পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালো। কথিত আছে যে, আবু লাহাব তার পরিবর্তে আল আস বিন হিশাম বিন আলমুগীরাকে পাঠিয়েছিলো। যার কাছে তার কিছু পাওনা ছিলো, যুদ্ধে বের হওয়ার জন্যে সে তার পাওনা ক্ষমা করে দিয়েছিলো। অপরদিকে আদ্দাস নামক জনৈক ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না বের হওয়ার জন্যে রবীয়া'র পুত্রদ্বয় শায়বা এবং ওতবা এবং আস বিন মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজকে তিরস্কার করলো। উল্লেখ্য, আদ্দাস হচ্ছে সেই খৃষ্টান বালক, যাকে উতবা এবং রবীআ' এক ছড়া আংগুর দিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলো– যখন তিনি তায়েফ এসেছিলেন। কিন্তু তায়েফবাসী তখন তাঁর সাথে খুবই খারাপ আচরণ করেছিলো। এমনকি তারা রসূলের পেছনে নির্বোধ এবং শিশুদেরকে লেলিয়ে দিয়েছিলো, যারা রসূলের ওপর পাথর মারতে মারতে তাঁর দু'পা মুবারক রক্তাক্ত করে ফেলেছিলো, অবশেষে তিনি ওতবা এবং শায়বার বাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রসূলের। এ অবস্থা দেখে আদ্দাসের মনে দাগ কাটলো। এমনকি সে তাঁর দু'হাত এবং দু'পা মোবারকে চুমু খেতে লাগলো।

উমাইয়া বিন খালফ যুদ্ধে বের হতে অস্বীকৃতি জানালে উকবা বিন আবী মুয়ীত এবং আবু জাহল বের না হওয়ার কারণে তাকে তিরস্কার করলো। তখন সে তাদেরকে সম্বোধন করে বললো, তোমরা আমার জন্যে এ উপত্যকার বড় উটটি খরিদ করো। তাই তারা তিনশত দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়ে বনী কুশাইর গোত্রের একটি উত্তম উট ক্রয় করলো এবং সে তার নিজের পরিবর্তে উটটি পাঠালো। যুদ্ধের পর মুসলমানরা গনীমতের মাল হিসাবে এটাও পেয়েছিলো। অন্যদিকে যুদ্ধের মাঠে বের হওয়ার ক্ষেত্রে হারিছ বিন 'আমিরের চেয়ে অধিক অপছন্দকারী আর কেউ ছিলো না, দম্‌দম্‌ বিন আমর একবার স্বপ্নে দেখলো যে, মক্কা উপত্যকার ওপরে নীচে সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এদিকে আতিকা বিনত আবদুল মোত্তালেবও অনুরূপ স্বপ্ন দেখলো। যাতে কোরায়শ গোত্রের প্রত্যেক ঘরে হত্যা ও রক্তের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো। ফলে যুক্তিবাদী কিছু লোক যুদ্ধের মাঠে যেতে অপছন্দ করলো। আর কিছু সংখ্যক লোক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো। তাদের মধ্য থেকে সর্বাধিক দেরীতে যারা যুদ্ধের মাঠে গিয়েছিলো, তারা হচ্ছে, হারিছ বিন আমের, উমাইয়া বিন খালফ, ওতবা বিন রবীয়া, শায়বা বিন রবীয়া, হাকীম বিন হিযাম, আবুল বুখতরী বিন হিশাম, আলী বিন উমাইয়া বিন খালফ এবং আল আস বিন মুনাব্বেহ। এই দেরীর জন্য আবু জাহল তাদেরকে ভর্ৎসনা করেছিলো। আর এ কাজে তাকে সহযোগিতা করেছিলো ওকবা বিন আবী মুয়ীত এবং নযর বিন হারেছ বিন কালদা। অতপর সকলেই যাত্রার সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করলো। কোরায়শরা নর্তকী ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বের হলো। তারা প্রত্যেক পানির ঘাটে এবং অবস্থানে গানের আসর বসাতো এবং উট যবেহ করতো। এ যুদ্ধে কোরায়শ বাহিনীর যোদ্ধা ছিলো ৯৫০ জন। তন্মধ্যে একশত ছিলো বর্মধারী ঘোড়সওয়ার। এছাড়া পদাতিক বাহিনীর অনেকের কাছেই বর্ম ছিলো। তাদের উটের সংখ্যা ছিলো সাত শত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহর এরশাদ হচ্ছে নিম্নরূপ,

'আর তোমরা এমন লোকদের মতো আচরণ করো না, যারা অহংকার করতে করতে ও লোকদেরকে নিজেদের মাহাত্ম্য দেখাতে দেখাতে ঘর থেকে বের হয়েছে এবং যারা আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে, তারা যা কিছু করছে তা আল্লাহর নাগালের বাইরে নয়।'

কোরায়শরা রণ সাজে সজ্জিত হয়ে পূর্ণ আড়ম্বর ও জাঁক জমকের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা হলো। নিজেদের কাফেলাকে শুধু নিরাপদে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসাই তাদের কাজ ছিলো না, বরং এই সংগে তারা নিত্য দিনের এ আশংকা ও আতংকবোধকে চিরতরে খতম করে দিতে চাচ্ছিলো। তারা চাচ্ছিলো মোহাম্মদ ও তাঁর দলবলকে খতম করে দিতে– যারা বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ করতে এসেছিলো। মদীনায় এ বিরোধী শক্তির নতুন সংযোজনকে তারা গুঁড়িয়ে দিতে এবং আশপাশের গোত্রগুলোকে এতোদূর সন্ত্রস্ত করে তুলতে চাচ্ছিলো যাতে করে ভবিষ্যতে এ বাণিজ্য পথটি তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়। কারণ মোহাম্মদ বাহিনী ইতিপূর্বে আমর বিন আলহাদরামী এবং তার সাথের কাফেলার ওপর আক্রমণ করেছিলো, আর ওটা ছিলো 'সারিয়্যাতু আবদিল্লাহ বিন জাহশ'।

আবু সুফিয়ান তার বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। তার সাথে ছিলো সত্তরজন দেহরক্ষী। ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুসারে প্রহরীর সংখ্যা ছিলো ত্রিশজন। তন্মধ্যে মাখরামা বিন নওফল এবং আমর বিন আল-আ'স অন্যতম। তাদের বাণিজ্য কাফেলায় উট ছিলো এক হাজার, যেগুলো পণ্য সামগ্রী বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলো। কোরায়শ বাহিনীর আগমনে বিলম্ব দেখে মদীনার কাছে পৌঁছে যখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো, আবু সুফিয়ান তার কাফেলা নিয়ে বদর ময়দানে পৌঁছে মহানবী ও সাহাবায়ে কেরামের পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে ভীত

সন্ত্রস্ত হয়ে কাফেলার মদীনার পথ পরিত্যাগ করে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করতে লাগলো। বদরকে তাদের বামে রেখে তারা দ্রুতগতিতে সামনের দিকে চললো। অপরদিকে কোরায়শ বাহিনী জাঁক জমকের সাথে মক্কা থেকে মদীনার পানে আসতে লাগলো। পথিমধ্যে প্রত্যেক মনযিলে তারা অবতরণ করলো এবং ধুমধাম সহকারে উট যবাই করে নিজেরা খেলো এবং স্থানীয় লোকদেরকে খাওয়ালো। এমতাবস্থায় কায়স বিন ইমরুল কায়স নামক জনৈক ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের পক্ষ হতে কোরায়শ বাহিনীর কাছে এসে বললো, যেহেতু বাণিজ্য কাফেলা মুসলমানদের আক্রমণ হতে বেঁচে গেছে সুতরাং মদীনাবাসীদের সাথে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়াই ভালো। ইতিমধ্যে তারা জুহফা নামক স্থানে এসে পৌঁছলো। তারা সেখান থেকে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালো। প্রতি উত্তরে আবু জাহল বললো, খোদার শপথ, বদরের ময়দানে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়ে আমরা কখনো ফিরে যাবো না। আমরা তিন ভাগে বিভক্ত হবো। একদল উট যবাই করবে, দ্বিতীয় দল খাওয়াবে। আর তৃতীয় দল শরাব পান করাবে। অন্যদিকে নর্তকী ও গায়িকারা নেচে গেয়ে আমাদেরকে আনন্দ দেবে। এ ঘটনার পর আরববাসী চিরদিন আমাদেরকে ভয় পাবে এবং স্মরণ রাখবে। সংবাদ বাহক কায়স আবু সুফিয়ানের কাছে এসে সকল ঘটনার বিবরণ শুনালো। তখন আবু সুফিয়ান আক্ষেপ করে বললো, এটা 'আমর বিন হিশাম তথা আবু জাহলের কাজ। যেহেতু আবু জাহল নেতা সেজে এসেছে, সেহেতু সে যুদ্ধ ছাড়া ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ করছে। এটা তার সীমালংঘন ছাড়া আর কিছুই নয়। সব ক্ষেত্রেই সীমালংঘন ক্রটি ও অশুভ লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত। আবু সুফিয়ান বললো, যদি মোহাম্মদ বাহিনী কোরায়শ বাহিনীর মুখোমুখি হয়, তবে আমরা নিশ্চিত পর্যুদস্ত হবো।'

ইবনে ইসহাক বলেন, আল আখনাস বিন শুরাইক বিন আমর বিন ওহাব আছ ছাকাফী- যে বনী যুহরার মিত্র ছিলো- বনী যুহরা সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললো, হে বনী যুহরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ধন সম্পদ ও পণ্য সামগ্রী হেফাযত করেছেন এবং তোমাদের নেতা মাখরামা বিন নওফলকে মুক্ত করেছেন। তোমরা তো তোমাদের নেতা ও পণ্য সামগ্রীকে বাঁচাবার জন্যেই এসেছিলে! সুতরাং তোমরা বাড়ি ফিরে যাও, অনর্থক যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা আবু জাহলের মতো বলো না যে, বনী যুহরা ও কোরায়শ গোত্রের কেউ জীবিত থাকতে আমরা যুদ্ধ না করে ঘরে ফিরবো না। এ যুদ্ধে বনী আদী গোত্রের কেউ অংশগ্রহণ করেনি। 'ইমতাউল আসমা' গ্রন্থে এসেছে যে, তু'মা বিন আ'দী বিশ উট বোঝাই রসদ দিয়ে কোরায়শ বাহিনীকে সাহায্য করেছিলো। শুধু তাই নয়, সে কোরায়শ বাহিনীর পরিবার পরিজনকেও সাহায্য করেছিলো। তালেব বিন আবী তালেব এবং কোরায়শ গোত্রের কিছু লোকের মাঝে পূর্ব থেকেই যোগ সাজশ ছিলো। কোরায়শ বাহিনীর লোকজন বললো, হে বনী হাশেম, আমরা ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারি যে, যদি তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধের জন্যে বেরও হও, তথাপি তোমাদের মন থাকবে মোহাম্মদের সাথে। অতএব, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে মক্কায় ফিরে চলে এসেছিলো তন্মধ্যে তালেবও ছিলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, রমযান মাসের প্রথমদিকে রসূল (স.) সাহাবীদের নিয়ে বের হলেন। তখন রসূলের সাথীদের উটের সংখ্যা ছিলো ৭০। তারা পালাক্রমে এ উটগুলোতে আরোহণ করতো। রসূল (স.), আলী বিন আবি তালিব ও মারছাদ বিন আবী মারছাদ আল গুনাবী একটি উটের ওপর পালাক্রমে চড়তো। হামযা বিন আবদুল মোত্তালিব, যায়দ বিন হারিছা, আবু কাব্শা এবং রসূলের বাদিনী আনেসা একটি উটের ওপর পালাক্রমে আরোহণ করতো। আবু বকর, ওমর এবং আবদুর রহমান বিন আওফ অপর আরেকটি উটে আরোহণ করতো।

আল্লামা মাকরেযী 'ইমতাউল আসমা' নামক গ্রন্থে বলেন, রসূলে মাকবুল (স.) যাত্রা করে যখন বদর নামক স্থানে পৌছলেন, তখন তাঁর কাছে কোরায়শদের গতিপথ এবং বাণিজ্যিক কাফেলার রাস্তা পরিবর্তনের সংবাদ আসলো। এ সংবাদ গোটা অবস্থার মোড় পাল্টে দিলো। তখন রসূলে কারীম (স.) সঙ্গী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কিনা। হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবেলা করার মতো শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা তো এমন কোনো উদ্দেশ্য নিয়েও আসিনি। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং রসূলের নির্দেশ পালনের জন্যে নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর হযরত ফারুকে আযম (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জেহাদের জন্য প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। তিনি তার বক্তৃতায় বললেন, আল্লাহর শপথ, এটা কোরায়শ গোত্রের মান সম্মানের প্রশ্ন। খোদার কসম, তারা সম্মানের ভূষণে ভূষিত হওয়ার পর কখনো অপমানিত হয়নি। তারা কুফরী অবলম্বন করার পর পুনরায় ঈমান আনেনি। তারা মৃত্যুপণ তোমাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কখনও তাদের ইযযত সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত হতে দেবে না। সুতরাং হে আল্লাহর রসূল, যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আমরা আপনার সাথে আছি। অতপর মেকদাদ বিন আমর (রা.) উঠে নিবেদন করলেন,

'ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহর কসম, আমরা আপনাকে এমন উত্তর দিবো না, যা বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ.) কে দিয়েছিলো। তারা বলেছিলো, যান, আপনি ও আপনার রব গিয়ে লড়াই করুন, আমরা এখানেই বসে থাকলাম। সে সত্ত্বার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার 'বার্কুল গিমাদ' নামক স্থানে নিয়ে যান, তবু আমরা জেহাদ করার জন্যে আপনার সাথে যাবো।' মহানবী (স.) হযরত মেকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দোয়া করেন। কিন্তু তখনো আনসারদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছিলো না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিলো যে, হুযুরে আকরাম (স.)-এর সাথে আনসারদের যে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিলো যেহেতু তা ছিলো মদীনার অভ্যন্তরের জন্যে, তারা মদীনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না, সুতরাং মহানবী (স.) সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধুরা! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমরা এই জেহাদে মদীনার বাইরে এগিয়ে যাবো কিনা? এই সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসাররা। হযরত সা'দ ইবনে মো'য়ায আনসারী (রা) হুযুর (স.)-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি কি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তখন সা'দ ইবনে মো'য়ায (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, সম্ভবত আপনি এক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে আল্লাহর পক্ষ হতে তার বিপরীত নির্দেশ এসেছে। আপনি বাণিজ্যিক কাফেলার আক্রমণের জন্যে বের হয়েছিলেন, কিন্তু নির্দেশ এসেছে কোরায়শ বাহিনীর মুখোমুখি হতে। তারপর তিনি বললেন,

'ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যে কোনো অবস্থায় আপনার আনুগত্য করবো। অতএব, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সেই সত্ত্বার কসম, যিনি আপনাকে দ্বীনে হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের মধ্য হতে কোনো একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদেরকে শত্রুর সম্মুখীন

করে দেন, তবু আমাদের মনে এতোটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর নামে আমাদেরকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান।'

অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে যে, সা'দ বিন মো'য়ায বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা আমাদের পশ্চাতে এমন এক সম্প্রদায় রেখে এসেছি, যারা আমাদের চেয়ে বেশী আপনাকে ভালোবাসে এবং আপনার অনুগত। কিন্তু তারা মনে করে আপনি বাণিজ্যিক কাফেলার জন্যে বের হয়েছেন। আমরা আপনার জন্যে একটি আসন তৈরী করবো, যাতে আপনি থাকবেন এবং তার পার্শ্বেই আপনার সওয়ারীসমূহ বেঁধে প্রস্তুত রাখবো। তারপর আমরা শত্রুর মুখোমুখি হবো। যদি আল্লাহ তায়ালা শত্রুর ওপর বিজয়দানে আমাদেরকে সম্মান ও ইযযত দান করেন আর এটাই আমাদের কামনা বাসনা। অন্যথায় সওয়ারীর ওপর আরোহণ করে আপনি আমাদের সাথে মিলিত হবেন। নবী কারীম (স.) তাঁকে বললেন, তুমি উত্তম কথা বলছো! তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ কায়ালা কি এর চেয়েও মংগলজনক কিছু করতে পারেন না? উল্লেখিত বক্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ (স.) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং কাফেলাকে হুকুম করলেন আল্লাহর নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দাও যে, আমাদের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দুটি দলের মধ্যে একটির ওপর আমাদের বিজয় হবে। দু'টি বলতে একটি হল আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা, আর অপরটি হলো মক্কা থেকে আগত সৈন্য বাহিনী। অতপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি যেন মোশরেকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি!

এ আলোচনা ও বক্তৃতার পর সাহাবায়ে কেরামের কাছে এ বিষয়টি দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, তারা বাণিজ্য কাফেলার পরিবর্তে এখন কোরায়শ সেনাদলের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। আর বাণিজ্য কাফেলা ইতিমধ্যে তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। সুতরাং তারা রসূলের ওয়াদা মোতাবেক আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের জন্যে আশাবাদী হয়ে উঠলো। রসূল (স.) তখন তিনটি পতাকা তিন ব্যক্তির হাতে দিলেন। একটি বহন করবে মোসায়ব বিন 'ওমাইর। অপর দু'টির মাঝে একটি আলীর হাতে। আর তৃতীয়টি সা'দ বিন মোয়াযের হাতে। তিনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন অস্ত্র উঁচ করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। উল্লেখ্য, রসূল মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় পতাকা উত্তোলন করা ছাড়াই বের হয়েছিলেন।

রমযান মাসের সতের তারিখ জুময়া'র রাত্রিতে এশার নামাযের সময় হুযুর (স.) বদরের কাছে পৌঁছলেন। অতপর তিনি হযরত আলী, যোবাইর, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস এবং বুস্‌বুস্‌ বিন আমরকে পানির সন্ধানে পাঠালেন এবং যুরাইব (যরব শব্দের তাসগীর (ক্ষুদ্রতাবোধক শব্দ) যুরাইব পাথরে পরিপূর্ণ প্রশস্ত ছোট পাহাড়ের নাম)-এর দিকে ইংগিত করে বললেন যে, তার কাছে কুলাইবের কাছে পানির সন্ধান পাবে। সত্যিই তারা সেখানে পানি বহনকারী অসংখ্য উট ও পানি বিতরণকারী কোরায়শ বংশের অনেক লোককে দেখতে পেলো। সাধারণ লোকেরা যুদ্ধের আশঙ্কায় আগে থেকেই সেখান থেকে পালিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে উজাইরত ছিলো, সে কোরায়শদের কাছে এসে বললো, হে গালিব সন্তান, তোমাদের সামনে আবু কাবশার সন্তান (অর্থাৎ মোহাম্মদ (স.) এবং তাঁর সাথীরা, যারা তোমাদের সাকী তথা তোমাদের পানি পান করানোর লোকদেরকে ধরে নিয়ে গেছে। এ সংবাদ শুনে কোরায়শ সেনাবাহিনীতে উত্তেজনা সৃষ্টি হলো এবং তারা এ কাজকে অপছন্দ করলো। সে রাতে বৃষ্টি হলো। আবু ইয়াসার নামক একজন সাহাবা ওবায়দা বিন সাঈদ বিন আসকে সেই রাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো। অপরদিকে মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাযের ক্রীতদাস এবং উমাইয়া বিন খালফের ক্রীতদাস আবু রাফে' ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। আবু ইয়াসার সকলকে নিয়ে রসূল (স.)-এর দরবারে উপস্থিত হলো। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন।

তারা এসে বললো, আমরা কোরায়শদের সাকী। তারা আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে তাদেরকে পানি পান করাবার জন্যে। সাহাবায়ে কেরাম তাদের এ জবাবকে অপছন্দ করে তাদেরকে মারধর করলো। তখন তারা বললো, আমরা আবু সুফিয়ানের লোক। আমরা তার বাণিজ্য কাফেলার সাথে এসেছি। এ জবাব শুনে সাহাবারা তাদেরকে প্রহার করা থেকে বিরত রইলো। ইতিমধ্যে রসূল (স.) নামায শেষ করে সালাম ফিরিয়ে সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, যখন তারা সত্য বললো, তখন তোমরা তাদেরকে প্রহার করেছো। আর যখন মিথ্যা বললো, তখন তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দিলে? অতপর রসূল (স.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বললো, টিলার পেছনে কোরায়শ বাহিনী অবস্থান করছে। তারা প্রত্যহ নয়টি বা দশটি উট যবেহ করে। তারা রসূল (স.)-কে আরো অবহিত করলো, কারা কারা মক্কা থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এসেছে; তাদের কথা শুনে রসূল (স.) বললেন, কোরায়শ বাহিনীর সংখ্যা নয় শত থেকে এক হাজার। তিনি সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, মক্কা তার কলিজার টুকরোগুলোকে তোমাদের সামনে নিক্ষেপ করেছে।

রসূলুল্লাহ (স.) অবতরণের স্থান সম্পর্কে সাহাবাদের পরামর্শ চাইলেন। তখন হাব্বাব বিন মুনযের আল জামুহ বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি আমাদেরকে কূপের নিম্নদেশের সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে চলুন। কারণ আমি সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি, কূপ ও সম্প্রদায় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি। সেখানে একটি অতি পুরাতন কূপ রয়েছে, যার পানি অধিক মিষ্টি। তাতে পর্যাপ্ত পানি বিদ্যমান। তার পার্শ্বে গর্ত খনন করে ডোবা তৈরী করবো। যার থেকে বাটি দিয়ে সহজেই পানি উঠিয়ে পান করবো এবং কোরায়শ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়বো। আর এ কূপ ছাড়া বাকী সমস্ত কূপ বন্ধ করে দেবো। একথা শুনে রসূল (স.) বললেন, হে হাব্বাব, তুমি সঠিক পরামর্শ দিলে! ইবনে ইসহাক সূত্রে ইবনে হিশামের বর্ণনায় এসেছে, হাব্বাব বিন আল মুনযির বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, এটা কি আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত স্থান? যার সামনে বা পেছনে যাওয়ার কোনো অধিকার আমাদের নেই! না, এটা আপনার বুদ্ধি-প্রসূত চিন্তার ফসল? আর যুদ্ধ তো প্রতারণা হতে পারে না। জবাবে রসূল (স.) বললেন, এটা আমার স্বীয় চিন্তার ফসল আর যুদ্ধ প্রতারণা বৈ আর কিছুই নয়। তখন হাব্বাব বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এটা আমাদের অবতরণের সঠিক স্থান নয়। তারপর তিনি তার দৃষ্টিতে সঠিক পরামর্শ দিলেন। এ কথা শুনে রসূল (স.) বসা থেকে দাঁড়ালেন এবং কুলাইবে বদর (বদর প্রান্তরের কূপ)-এর কাছে গিয়ে অবতরণ করলেন। সেখানে তিনি রাত্রি যাপন করলেন এবং খেজুর গাছের শিকড়মুখী হয়ে নামায পড়লেন। ওইটা ছিলো জুময়ার রাত্রি এবং রমযান মাসের সতের তারিখ। তিনি হাব্বাবের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ওই রাতে আল্লাহর নির্দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো। এতে মুসলমানরা পরিতৃপ্ত হলো। যেহেতু তাদের শিবিরের মাটি বেলে মাটি ছিলো, সুতরাং বৃষ্টির পর চলাফেরা করতে কোনো প্রকার অসুবিধা হলো না। পক্ষান্তরে এ বৃষ্টির দরুন কোরায়শ বাহিনী মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হলো। তাদের শিবিরের মাটি ছিলো আঁটাল। তাদের জন্যে চলাফেরা করা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি তারা তাদের শিবিরকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করতে পারছিলো না। কারণ তাদের মাঝখানে ছিল বালুর পাহাড় সদৃশ এক স্তূপ। এ বৃষ্টি মুসলমানদের জন্যে নেয়ামত ও শক্তির উৎস ছিলো। পক্ষান্তরে মোশরেকদের জন্যে এটা কঠিন পরীক্ষা ও শাস্তির কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলো। এই বৃষ্টির দরুন ওই রাতে ক্লান্ত শ্রান্ত মুসলমানদের প্রচন্ড তন্দ্রা এসেছিলো, যার ফলশ্রুতিতে তারা আরামের নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়েছিলো। তারা গভীর ঘুমে এমন অচেতন হয়ে পড়েছিলো যে, তাদের কেউ তার পার্শ্বে কি হচ্ছে তা অনুভব করতে পারছিলো না। ওই রাত্রে 'রেফায়া বিন রাফে' বিন মালেকের স্বপ্নদোষ হয়েছিলো। তিনি শেষ রাত্রিতে ফরয গোসল করেছিলেন। ওই রাতে

রসূলে কারীম (স.) মোশরেকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করার জন্যে আম্মার বিন ইয়াসের এবং আবদুল্লাহ বিন মাসউদকে পাঠিয়েছিলেন। তারা ঘুরে এসে রসূলকে অবহিত করলেন যে, তারা ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছে, কারণ আকাশ তাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করেছে।

রসূল (স.) যে কূপের পার্শ্বে অবতরণ করেছিলেন সেখানে খেজুরের ডালা দিয়ে তাঁর জন্যে একটি আসন তৈরী করা হলো। সা'দ বিন মো'য়ায সে আসনের ফটকে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে প্রহরী হিসাবে দাঁড়ালেন। রসূল (স.) যুদ্ধের স্থানে গেলেন এবং তাঁর সাথীদের সামনে তিনি কোরায়শ গোত্রের কাফের ও মোশরেকদের এক এক করে অসংখ্য মস্তক বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা শুনালেন এবং নাম ধরে বলতে লাগলেন এটা অমুকের মস্তক বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্থান আর ওটা অমুকের মৃত্যুর স্থান। রসূল (স.) যার মৃত্যুর স্থান যেখানে নির্ধারণ করেছিলেন, তাদের মধ্য হতে কেউ নির্ধারিত স্থান অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। তারপর রসূল (স.) মুসলমানদের সারি পূণর্বিন্যাস করে তিনি ও আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাদের আসনে প্রবেশ করলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, রাতের প্রচুর বৃষ্টিতে কোরায়শরা প্রস্থানে বাধ্য হয়েছিল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে তারা পুনরায় ফিরে আসলো। অতপর যখন রসূল (স.) এদেরকে বালির স্তূপ হতে উপত্যকার দিকে লক্ষ্যবস্তু স্থির করতে দেখলেন, তখন তিনি আল্লাহর সামনে দোয়া করার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন। অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে ও কান্না বিজড়িত স্বরে তিনি দোয়া করতে থাকলেন, 'হে আল্লাহ! এই যে কোরায়শরা এসেছে, তাদের সকল ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা নিয়ে তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে। হে আল্লাহ! এখন তোমার সেই সাহায্য এসে যাওয়া দরকার, যার ওয়াদা তুমি আমার সাথে করেছিলে। হে আল্লাহ! যদি আজ এ মুষ্টিমেয় দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এ পৃথিবীতে আর কোথাও তোমার এবাদাত করার মতো কেউ থাকবে না। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ধ্বংস করো।' রসূল (স.) এ দোয়া' করছেন এমন সময় তিনি ওতবা বিন রবীয়াকে একদল লোকবেষ্টিত লাল উটের ওপর আরোহিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যদি ওই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভালো লোক থেকে থাকে। তবে সে হচ্ছে লাল উটের অধিকারী। যদি তারা তার অনুসরণ করে, তবে তারা সৎপথ পাবে।

খুফাফ বিন আয়মা বিন রাহদা আল গিফারী বা তার পিতা আয়না বিন রাহদা আল গিফারী কোরায়শদের কাছে (যখন তারা তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো) হাদিয়া স্বরূপ কিছু যবেহ করা জানোয়ার দিয়ে তার পুত্রকে পাঠালো এবং তাকে একথা বলে পাঠালো যে, যদি তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ও জনবলের সাহায্য চাও, তবে আমরা তার জন্যে প্রস্তুত। খুফাফ বললো, কোরায়শরা এই বলে তার ছেলেকে তার কাছে ফেরত পাঠালো যে, তোমার এ সুন্দর প্রস্তাব আমাদের কাছে সাদরে গৃহীত হয়েছে। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। জীবনের শপথ, যদি এমন হয় যে, আমরা মানুষের সাথে লড়াই করতে যাচ্ছি, তাহলে এক্ষেত্রে কোনো দুর্বলতার সুযোগ নেই। আর মোহাম্মদের ধারণানুসারে যদি আল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসে থাকি, তাহলে এটা স্বতসিদ্ধ কথা যে, তাঁর সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

যখন উভয় পক্ষ যুদ্ধের মাঠে অবতরণ করলো, তখন কোরায়শদের কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ (স.)-এর ডোবায় অবতরণ করে পানি পান করতে লাগলো। তাদের মধ্যে হাকীম বিন হেযামও ছিলো। সাহাবারা এতে আপত্তি করতে চাইলে রসূল (স.) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও। যারা এ ডোবা থেকে পানি পান করবে, তারাই যুদ্ধের মাঠে মৃত্যু বরণ করবে। কিন্তু হাকীম বিন হেযাম তার ব্যতিক্রম। তাকে হত্যা করা হবে না। তিনি পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হয়েছিলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, আমার পিতা ইসহাক বিন ইয়াসার এবং অপরাপর কয়েকজন পন্ডিত ব্যক্তি আনসারের কতক মাশায়েখ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন। তারা বলেন, পরিবেশ শান্ত হওয়ার পর কোরায়শ বাহিনী ওমায়র বিন ওয়াহাব আল জুমাহীকে মোহাম্মদের সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা নিরূপণের জন্যে পাঠালো। সে ঘোড়ায় চড়ে মুসলিম শিবিরের চতুর্পার্শ্বে ঘুরে গিয়ে রিপোর্ট পেশ করলো যে, মুসলমানদের সংখ্যা তিনশতের কিছু কম বা বেশী। অতপর সে বললো যে, আমাকে একটু সুযোগ দাও, আমি ভালো করে দেখে আসি যে, তাদের কিছু জনবল এবং রসদ লুক্কায়িত আছে কিনা। এরপর সে সেই উপত্যকায় দূর দূরান্ত ঘুরে এসে পুনরায় রিপোর্ট পেশ করলো যে, আমি কিছুই পাইনি, হে কোরায়শ সম্প্রদায়! আমি দেখছি যে, বিপদ মৃত্যুকে বয়ে নিয়ে আসছে। মদীনার মাটি ভয়ংকর মৃত্যুর সংবাদ দিচ্ছে। মুসলমানরা এমন সম্প্রদায়, যাদের কাছে তরবারি ছাড়া আত্মরক্ষামূলক কিছু নেই এবং যাদের কোনো আশ্রয়স্থলও নেই। এক্ষেত্রে আমার অভিমত হচ্ছে যদি তোমরা তাদের একজনকে হত্যা করো। তবে তারাও তোমাদের একজনকে হত্যা করবে। আর যদি তারা তোমাদের সমান সংখ্যক লোক হত্যা করে, তাহলে তোমাদের বেঁচে থাকার কী অর্থ হতে পারে? সুতরাং তোমরা এখনো বিষয়টি ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে দেখো।

হাকীম ইবনে হেযাম এ কথা শুনে কোরায়শ বাহিনীর নেতাদের কাছে গেলো। প্রথমে সে ওতবা ইবনে রবীয়াকে গিয়ে বললো, 'হে ওয়ালীদের পিতা! আপনি কোরায়শ গোত্রের একজন মান্যবর প্রবীণ নেতা। আপনাকে সবাই মানে। আপনি কি এমন একটা কাজ করতে রাযী হবেন, যা করলে আপনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন? সে বললো, হাকীম, তুমি কী বলতে চাচ্ছো? হাকীম বললো, আপনি কোরায়শ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং আপনার মিত্র আমর ইবনে হাযরামীর হত্যাকান্ডের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার দায়িত্ব নিন। 'ওতবা বললো, হাঁ আমি তা করতে রাযী। এ ব্যাপারে আমি তোমার অনুরোধ রাখতে প্রস্তুত। হাযরামী আমার মিত্র এবং রক্তের মূল্য আদায় করার এবং তার সম্পদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার দায়িত্ব আমার। তুমি বরং আবু জাহলের কাছে যাও। আমি মনে করি, কোরায়শের বিনা যুদ্ধে ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্নে সে ছাড়া আর কেউই বিরোধিতা করবে না। এরপর 'ওতবা দাঁড়িয়ে কোরায়শ বাহিনীর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ভাষণ দিলো,

আল্লাহর কসম! হে কোরায়শ দল! মোহাম্মদ ও তাঁর সংগী-সাথীদের সাথে লড়াই করে তোমাদের কোনো লাভ হবে না। আজ যদি তোমরা তাকে হত্যা করতেও সক্ষম হও, তারপরও তোমাদের ভেতরে কোনো সদ্ভাব বজায় থাকবে না। একজন আর একজনের মুখ দেখাকে পছন্দ করবে না। কেননা, সে তার চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই কিংবা অন্য কোনো না কোনো আত্মীয়ের হত্যাকারী বলে চিহ্নিত হবে। সুতরাং চলো আমরা ফিরে যাই এবং মোহাম্মদ এবং তাঁর সহচরদের পথ থেকে সরে দাঁড়াই। তাদের ব্যাপারটা তোমরা আরব জনগণের ওপর ছেড়ে দাও, যদি তারা তাঁকে হত্যা করে, তাহলে তো তোমাদের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে। আর তা না হলে মোহাম্মদের কাছে আমরা অন্তত নির্দোষ থাকবো।'

হাকীম বলেন, তারপর আমি আবু জাহলের কাছে গেলাম এবং দেখলাম যে, সে তার বর্ম সিন্দুক থেকে বের করে পরিষ্কার করছে। সে তাকে বললো, 'হে আবুল হাকাম! (এটা আবু জাহলের একটি উপনাম) 'ওতবা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। এরপর আমি ওতবা আমাকে যা বলেছিলো, তা তাকে জানালাম। আবু জাহল বললো, আল্লাহর শপথ! ওতবার জাদুবিদ্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং ভয়ে তার ফুসফুস ফুলে উঠেছে। অর্থাৎ তার মাথা তখন থেকে খারাপ হয়ে গেছে, যখন সে মোহাম্মদ এবং তার সংগীদের দেখেছে। আল্লাহর কসম! এটা কখনো হতে পারে না। যতোক্ষণ আল্লাহ তায়ালা আমাদের ও মোহাম্মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত

ফয়সালা না করে দেন, ততোক্ষণ আমরা ফিরে যাবো না। ওতবা যা বলেছে, ওটা তার মনের কথা নয়। যেহেতু মোহাম্মদ ও তাঁর অনুচররা সংখ্যায় খুব নগণ্য এবং তাদের ভেতরে তার ছেলেও রয়েছে। যুদ্ধ হলে তার ছেলের জীবন বিপন্ন হবে ভেবে সে এ ধরনের কথা বলেছে। এরপর আবু জাহল নিহত আমর ইবনে হাযরামীর ভাই আমের ইবনে হাযরামীর কাছে খবর পাঠালো যে, তোমার মিত্র ওতবা কোরায়শ বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তোমার ভাইয়ের হত্যার বদলার ব্যাপারটা তোমার নাগালের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং তুমি উঠো এবং ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিশ্রুতির কথা কোরায়শ বাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দাও।'

'আমের ইবনে হাযরামী উঠে দাঁড়ালো এবং তার ভাইয়ের হত্যার ঘটনা বর্ণনা করার পর সে হায় আমর, হায় আমর বলে চীৎকার করতে লাগলো। সংগে সংগে যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি হলো এবং সন্ধির সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলো। তারা যে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে মক্কা থেকে বের হয়েছিলো, তার জন্যে তারা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেলো। ফলে, ওতবা যে শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলো, সে তা নস্যাৎ করে দিলো।

ওতবা যখন আবু জাহলের এ উক্তি শুনলো যে, 'ওতবার মাথা খাবাপ হয়ে গেছে', তখন সে বললো, অচিরেই সে ভীরু জানতে পারবে, আমার মাথা খারাপ হয়েছে, না তার মাথা খারাপ হয়েছে। এরপর উতবা তার মাথায় পরিধানের জন্যে লৌহ শিরস্ত্রাণ খোঁজ করলো। কিন্তু তার মাথা বড় ছিলো, গোটা সেনাদলের মধ্যে খোঁজ করেও তার মাথায় পরিধানের মতো কোনো লৌহ শিরস্ত্রাণ পাওয়া গেলো না। ফলে, সে তার মাথায় চাদর বেঁধে নিলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, আস্ওয়াদ ইবনে আবদুল আসাদ আল-মাখযুমী ছিলো কোরায়শ বংশের একজন দুশ্চিরত্র ও গুন্ডা স্বভাবের লোক। সে বের হয়ে বললো, আল্লাহর কসম। আমি অবশ্যই মুসলমানদের ডোবা থেকে পানি পান করবো, কিংবা তা ভেংগে ফেলবো। আর প্রয়োজন হলে এর জন্যে মরেও যাবো। এই বলে সে ময়দানে নামলে হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব (রা.) তার দিকে অগ্রসর হলেন। যখন তারা মুখোমুখি হলেন, তখন হামযা (রা.) আসওয়াদের পায়ে তরবারির আঘাত হানলেন। এতে তাঁর পা কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এ সময় সে হাউযের কাছেই ছিলো। সে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো এবং তার পা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। যা সবেগে তার সাথীদের গায়ে গিয়ে পড়তে লাগলো। এরপর সে হামাগুড়ি দিয়ে হাউযের দিকে এগুলো এবং নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্যে হাউযের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। হামযা (রা.) তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং হাউযের মধ্যেই তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করলেন।

এরপর ময়দানে অবতীর্ণ হলো ওতবা ইবনে রবীয়া, তার ভাই শায়বা ও ছেলে ওলীদ তার সংগে এলো। কোরায়শ বাহিনীর ব্যূহ ছেড়ে সামনে গিয়ে সে হুংকার ছেড়ে খন্ড যুদ্ধের আহবান জানালে আনসারদের মধ্য হতে তিনজন যুবক আওফ, মুয়াওয়েয ইবনে হারেছ এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তাদের মোকাবেলায় এগিয়ে গেলেন। কোরায়শ যোদ্ধারা জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কারা? জবাবে তাঁরা বললেন, আমরা আনসার। তারা বললো, তোমাদের দিয়ে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। (ইবনে ইসহাক বলেন, ওতবা আনসার যুবকদের সম্বোধন করে বললো, সম্মানিত প্রতিপক্ষ কোথায়। আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের চাই। অর্থাৎ আমরা মোহাজেরদের চাই।) তারপর তাদের একজন চিৎকার করে বললো, হে মোহাম্মদ, আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা আমাদের সমকক্ষ, তাদেরকে পাঠাও। তখন রসূল (স.) ওবায়দা ইবনে হারেছ, হামযা ও আলী (রা.)-কে তাদের মোকাবেলায় যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারা গিয়ে নিজ নিজ পরিচয় দিলে প্রতিপক্ষ খুশী হয়ে বললো, ঠিক আছে। এবার মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিপক্ষ মিলে গেছে। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে সবচাইতে বয়স্ক মোজাহেদ ওবায়দা থাকলেন ওতবা ইবনে রবীয়ার বিরুদ্ধে, হামযা

শায়বার বিরুদ্ধে এবং আলী ওয়ালীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। হামযা শায়বাকে এবং আলী ওয়ালীদকে পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ দিলেন না। প্রথম আঘাতেই তাদের হত্যা করলেন। আর 'ওবায়দা ও ওতবা উভয়ে একটি করে আঘাত বিনিময় করে, একে অপরকে আহত করলেন। কিন্তু একে অপরকে পুরোপুরি কাবু করতে সক্ষম হলেন না। পক্ষান্তরে হামযা ও আলী তাদের প্রতিপক্ষকে কাবু করার পর 'উবায়দার সাহায্যে দ্রুত ছুটে গিয়ে, নিজ নিজ তরবারির আঘাতে ওতবাকে হত্যা করলেন। এরপর ওবায়দাকে আহতাবস্থায় তারা কাঁধে তুলে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে পৌঁছে দিলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, এরপর উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হলো এবং একদল অপর দলের মুখোমুখি হলো। ইতিপূর্বে রসূলুল্লাহ (স.) সাহাবাদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত তারা যেন আক্রমণ না করে। তিনি এও বলেন, কোরায়শ পক্ষ তোমাদের ঘিরে ফেললে তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হটিয়ে দিও। রসূলুল্লাহ (স.) এ সময় মুসলিম বাহিনীকে সারিবদ্ধ করে আবু বকর সিদ্দীকসহ তাঁর আসনে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি আল্লাহর ওয়াদা করা সাহায্য নাযিলের জন্যে কায়মনোবাক্যে দো'য়া করতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা পরওয়ারদেগার! তুমি যদি আজ এ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে ফেলো, তবে এ যমীনে তোমার এবাদাত করার মত কেউ থাকবে না, রসূলের এ কান্না বিজড়িত কণ্ঠ ও ফরিয়াদ শুনে হযরত সিদ্দীকে আকবর আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার দোয়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেছে। আল্লাহ পাক নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।

আল্লামা মাকরেযীর 'ইমতাউল আসমা' নামক গ্রন্থে এসেছে যে, একদা আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রসূলুল্লাহ (স.)-এর দরবারে এ বলে নিবেদন করলেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ আমি আপনাকে এ মর্মে পরামর্শ দিচ্ছি (অথচ রসূল (স.) অধিকতর মহৎ ও জ্ঞানী, যার পরামর্শের কোনো প্রয়োজন নেই) যে, আল্লাহকে তাঁর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি মহাজ্ঞানী এবং অদৃশ্য সম্পর্কেও পুরোপুরি অবহিত আছেন। তিনি মহীয়ান ও গরীয়ান। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে সম্বোধন করে বললেন, হে ইবনে রাওয়াহা! আমি কি আল্লাহকে তাঁর ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দেবো না? নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

ইবনে ইসহাক বলেন, আসনে বসা অবস্থায় রসূলুল্লাহ (স.) তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এরপর তিনি জাগ্রত হয়ে বলেন, হে আবু বকর, সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। এই তো জিবরীল, তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন। আর তাঁর ঘোড়ার সামনের দাঁতগুলো ধূলাময়লাযুক্ত।

এ সময় কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি তীর এসে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর আযাদ করা গোলামের শরীরে বিদ্ধ হয়। ফলে তিনি শহীদ হন। ইনি হলেন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে প্রথম শহীদ। এরপর আদী ইবনে নাজ্জার গোত্রের হারেছা ইবনে সুরাকা নামক সাহাবীর প্রতি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। এ সময় তিনি হাউযের পানি পান করছিলেন। নিক্ষিপ্ত তীর তার গলায় বিদ্ধ হলে তিনিও শাহাদত বরণ করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (স.) মোজাহেদ বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাদের যুদ্ধের জন্যে অনুপ্রাণিত করে বললেন, 'ওই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মোহাম্মদের জীবন। আজ যে ব্যক্তি কাফেরদের বিরুদ্ধে সবরের সংগে, সাওয়াবের প্রত্যাশায় যুদ্ধ করবে এবং সামনে অগ্রসর হবে, কোনো অবস্থায় পিছু হটবে না, এমতাবস্থায় যদি সে শহীদ হয়, তবে আল্লাহ

তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' এ সময় বনু সালামা গোত্রের ওমায়র ইবনুল হুমাম (রা.) হাতে কয়েকটি খোরমা নিয়ে খাচ্ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা শুনেই বললেন, বাহ্! বাহ্! কি চমৎকার! আমি দেখছি যে, আমার এবং জান্নাতের মাঝে এতোটুকু ব্যবধান রয়েছে যে, আমি কাফেরদের হাতে শহীদ হয়ে যাই। রাবী বলেন, এই বলেই তিনি তার হাত থেকে খেজুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন এবং শহীদ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, 'আসেম বিন ওমর বিন কাতাদা আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আওফ ইবনুল হারেছ-যার মায়ের নাম আফরা- যুদ্ধের ময়দানে এক পর্যায়ে রসূলে কারীম (স.)-এর খেদমতে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দার ওপর কোন কাজে বেশী খুশী হন? তিনি বললেন, যখন সে বর্মহীন হয়ে তার দুশমনদের ওপর সর্বাত্মকভাবে আক্রমণ করে। একথা শুনে তিনি তার শরীর থেকে বর্ম খুলে ফেলে দিলেন। এরপর তার তরবারী নিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

ইবনে ইসহাক বলেন, মোহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব আয্-যুহরী বনী যুহরার মিত্র আবদুল্লাহ ইবনে ছা'লাবা ইবনে সাঈর আল-উযরী থেকে আমাকে বর্ণনা করে শুনান যে, তিনি একদা মোহাম্মদ বিন মুসলিমকে এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করে শুনান যে, যখন মুসলিম ও কোরায়শ বাহিনী একে অপরের মুখোমুখি হয়ে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হলো, তখন আবু জাহল ইবনে হিশাম নিম্নরূপ দোয়া করলো, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে এবং আমাদের কাছে এক অজানা ধর্ম এবং নতুন জীবন বিধান (দ্বীন) নিয়ে এসেছে, তাকে তুমি আজ সকালে ধ্বংস করে দাও। এর দ্বারা আবু জাহল বিজয় কামনা করেছিলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স.) এক মুষ্টি বালুকা কণা ও কাঁকর নিয়ে কোরায়শদের প্রতি মুখ করে বললেন, 'শাহাতিল উজুহু' (ওদের মুখ বিকৃত হয়ে যাক/ওদের চেহারা কুৎসিত হোক) এই দো'য়া পড়ে বালিতে দম দিয়ে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং সাহাবীদের প্রতি নির্দেশ দিলেন, জোর হামলা চালাও। অল্পক্ষণের মধ্যেই কোরায়শ বাহিনীর চরম পরাজয় ঘটলো। আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের হাতে বড় বড় কোরায়শ নেতাদের হত্যা করালেন এবং তাদের অনেক নেতাকে বন্দী করালেন। যখন মুসলিম মোজাহেদরা কাফেরদের বন্দী করছিলেন, তখন রসূল (স.) আসনে অবস্থান করছিলেন। এ সময় সা'দ ইবনে মো'আয (রা.) একদল আনসার সাহাবী নিয়ে উন্মুক্ত তরবারি হাতে আসনের সামনে পাহারা দিচ্ছিলেন, যাতে শত্রুরা তাঁর ওপর হামলা না করতে পারে। মুসলিম মোজাহেদদের কাফেরদের বন্দী করতে দেখে সা'দ ইবনে মো'য়ায (রা.)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টি ফুটে উঠলো। রসূলাল্লাহ (স.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হে সা'দ, আল্লাহর কসম! আমার মনে হচ্ছে, মুসলিম মোজাহেদদের এ কাজে তুমি খুশী নও। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা ইসলাম ও কুফরের মাঝে প্রথম যুদ্ধ, যাতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। আজ মোশরেকদের খতম করার প্রথম সুযোগ আল্লাহ্ তায়ালা দিয়েছিলেন। আজ ওদের বন্দী করার চেয়ে বেশী হত্যা করাই ছিলো আমার কাছে পছন্দনীয় কাজ?

ইবনে ইসহাক বলেন, আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে মা'বাদ তাঁর কিছু পরিবার পরিজন থেকে- তারা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করে আমাকে শুনান যে, নবী করীম (স.) তাঁর সাথীদের সম্বোধন করে সেদিন বললেন, আমি জানতে পেরেছি যে, বনী হাশেমসহ অন্যান্য গোত্রের কিছু সংখ্যক লোককে কোরায়শ নেতারা জোর যবরদস্তি করে যুদ্ধে নিয়ে এসেছে।

আমাদের সাথে যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা তাদের ছিলো না। কাজেই বনু হাশেমের কেউ তোমাদের সামনে পড়লে তাকে হত্যা করো না। আবুল বুহতরী ইবনে হেশাম ইবনে হারেছ ইবনে আসাদকে কেউ পেলে হত্যা করো না। কেননা, তাকে যবরদস্তি করে যুদ্ধে আনা হয়েছে। আর আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব কারো সামনে পড়লে তাকেও হত্যা করো না। কেননা, তাকেও জোর করে যুদ্ধে আনা হয়েছে। এ কথা শুনে মুসলিম বাহিনীর আবু হোযায়ফা (রা.) বললেন, আমরা আমাদের বাপ-ভাই, পুত্র ও আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করবো, আর আব্বাসকে কেন ছেড়ে দেবো? আল্লাহর কসম! আমার সামনে পড়লে আমি তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করবোই। এ সংবাদ রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবকে সম্বোধন করে বললেন, ওহে আবু হাফস। আল্লাহর রসূলের চাচার ওপর কি তরবারি চালানো যায়? 'ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তরবারি দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দেই। আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চিত যে, আবু হোযায়ফা মোনাফেক হয়ে গেছে। এ ঘটনার জন্যে পরবর্তীকালে আবু হোযায়ফা প্রায়ই আফসোস করে বলতেন, বদর যুদ্ধের দিন আমার ওই কথাটা বলার জন্যে কি শাস্তি হয়, তাই ভেবে আমি সদা ভীত সন্ত্রস্ত ও শংকিত থাকতাম এবং মনে করতাম একমাত্র শাহাদতের পেয়ালা পান করাই আমার উক্তির কাফফারা হতে পারে। পরবর্তীকালে মুরতাদদের বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) আবুল বোখতরীকে হত্যা করতে নিষেধ করছিলেন। তার কারণ এই যে, সে রসূলুল্লাহ (স.)-এর মক্কায় থাকাকালে তাঁর বিরোধিতায় অন্যদের তুলনায় অধিক সংযত ছিলো। সে রসূল (স.)-কে কষ্ট দিতো না। আর তার থেকে এমন কোনো কাজ প্রকাশ পায়নি, যা রসূলুল্লাহ অপছন্দ করতেন। আর বনু হাশেম ও বনু মোত্তালেবকে আবু তালেবের গিরি সংকটে অন্তরীণ রেখে যে নির্দেশনামা কোরায়শ নেতারা জারী করেছিলো, সে নির্দেশনামা ছিন্নকারী নেতাদের মধ্যে আবুল বোখতরী ছিলো অন্যতম। অবশ্য বন্দী হতে অস্বীকৃতি জানাবার দরুন পরবর্তীতে তাকে হত্যা করা হয়।

ইবনে ইসহাক বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয যোবায়র তার পিতা আব্বাদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'উমাইয়া ইবনে খালফ মক্কায় আমার বন্ধু ছিলো। আমি মুসলমান হওয়ার পর যখন আমার আগের নাম 'আবদ আমর বদলে আবদুর রহমান রাখলাম, তখন উমাইয়া আমাকে বললো, তুমি তোমার বাপ মার রাখা নামটা বাদ দিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বললো, আমি 'রহমান' কে জানিনা। কাজেই তুমি তোমার এমন একটা নাম রাখো, যে নামে আমি তোমাকে ডাকতে পারি। তোমার অবস্থা এই যে, আমি যদি তোমাকে তোমার আগের নামে ডাকি, তবে সে ডাকে তুমি সাড়া দেও না। আর আমার অবস্থা এই যে, তোমাকে আমি এমন নামে ডাকতে প্রস্তুত নই, যে নামের সাথে আমার পরিচয় নেই। আবদুর রহমান (রা.) বলেন, বস্তুত সে যখন আমাকে আব্দ আমর বলে ডাকতো, তখন সে ডাকে আমি সাড়া দিতাম না। এরপর আমি তাকে বললাম, হে আবু আলী। তোমার পছন্দ মতো একটা নাম নির্ধারণ করে নাও। তখন সে বললো, তা হলে তোমার নাম হলো 'আবদ ইলাহ। তখন আমি বললাম, ঠিক আছে। এরপর যখনই তাঁর পাশ দিয়ে যেতাম, তখন সে বলতো, হে 'আব্দ ইলাহ। আমি তার এ ডাকে সাড়া দিতাম এবং তার সাথে কথা বলতাম। বদরের যুদ্ধের দিন আমি যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন সে তার ছেলে আলী ইবনে উমাইয়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো। এ সময় আমার সাথে কয়েকটি লৌহবর্ম ছিলো। যা আমি নিহত শত্রু থেকে পেয়েছিলাম। এগুলো নিয়ে যাওয়ার

সময় সে আমাকে দেখে আব্দ আমর বলে ডাক দিলে আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। তখন সে আমাকে বললো, তুমি আমার ব্যাপারে কী চিন্তা করছো? তোমার সংগে যে বর্মগুলো আছে তার চাইতে আমি তোমার জন্যে উত্তম নই? আমি বললাম, হাঁ, আল্লাহর কসম। এতো খুশীর কথা। তখন বর্ম ফেলে দিয়ে উমাইয়া এবং তার ছেলের হাত ধরলাম। তখন সে বললো, আজকের দিনের মতো আর কোনো দিন আমি দেখিনি। তোমাদের কি দুগ্ধবতী উটনীর প্রয়োজন নেই? আবদুর রহমান (রা.) বলেন, এরপর আমি এদের দু'জনকে নিয়ে চললাম। এসময় উমাইয়া ইবনে খালফ আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ওই ব্যক্তি কে, যে তার বুকে উট পাখির পালক লাগিয়ে রেখেছে? আমি বললাম, তিনি হলেন, হামযা ইবন আবদুল মোত্তালেব (রা.)। তখন সে বললো, এতো সেই ব্যক্তি, যে আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। আবদুর রহমান বলেন, আল্লাহর কসম। এরপর আমি তাদের উভয়কে যখন টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ বেলাল (রা.) তাকে আমার সংগে দেখলেন। আর এ ছিলো সে ব্যক্তি, যে বেলালকে ইসলাম পরিত্যাগ করার জন্যে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতো। তাকে মরুভূমিতে নিয়ে যেতো এবং তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে বুকের ওপর পাথর-চাপা দিয়ে রেখে বলতো, তুমি এ অবস্থায় থাকবে, নয় মোহাম্মদের দ্বীন পরিত্যাগ করবে। এ সময় বেলাল 'আহাদ' 'আহাদ' বলতেন। অর্থাৎ তিনি 'আল্লাহ এক' বলে চিৎকার করতেন। যখন বেলাল (রা.) তাকে দেখলেন, তখন তিনি বলে উঠলেন, এই তো কুফরীর মূল হোতা উমাইয়া ইবনে খালফ। সে বেঁচে গেলে আমার বাঁচা অর্থহীন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন, আমি বললাম, হে বেলাল! তুমি আমার বন্দীদ্বয় সম্পর্কে এরূপ বলছো? তখন বেলাল (রা.) বললেন, 'সে বেঁচে গেলে আমার বাঁচার কোনো অর্থ হয় না।'

এরপর বেলাল (রা.) উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে বললেন, হে আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারীরা। এই তো কুফরীর মূল নায়ক উমাইয়া ইবনে খালফ। সে বেঁচে গেলে আমার বাঁচা অর্থহীন। আবদুর রহমান (রা.) বলেন, এরপর লোকেরা আমাদের ঘিরে ফেললো। আর আমি উমাইয়াকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম। ইতিমধ্যে একজন মোজাহেদ তার তরবারি বের করে উমাইয়ার ছেলের পায়ে আঘাত করলে সে পড়ে গেলো। তা দেখে উমাইয়া এমন জোরে চিৎকার করলো যে, আমি অমন চিৎকার আর কখনো শুনিনি। আমি বললাম, উমাইয়া তুমি নিজের চিন্তা করো। তোমার নিস্তার নেই। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আর রক্ষা করতে পারবো না। অবশেষে লোকেরা তাদের উভয়কে তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। পরে আবদুর রহমান (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বেল্লালের ওপর রহম করুন। আমি বর্ম ফেলে দিয়ে যাকে গ্রেফতার করলাম, তাকে সে হত্যা করলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) যখন দুশমনদের মোকাবেলা থেকে মুক্ত হলেন, তখন তিনি নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আবু জাহল ইবনে হেশামকে অনুসন্ধান করতে বললেন। যুদ্ধের ময়দানে যে মুসলিম সৈনিকের সাথে সর্বপ্রথম আবু জাহলের সাক্ষাত হয়, তিনি হলেন বনু সালামার মোয়ায ইবনে আমর ইবনে জামুহ। তিনি বলেন, আবু জাহলের যখন খোঁজাখুঁজি হচ্ছিলো, তখন আমি শুনলাম, সে একটি ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে আছে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই হোক তাকে খুঁজে বের করবোই। আমি যখন তার কাছে পৌঁছলাম, তখন তার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তার পা কেটে ফেললাম। তখন তার ছেলে ইকরামা আমাকে আঘাত করে আমার হাত কেটে ফেললো। হাতখানা কেবল চামড়ার সাথে ঝুলছিলো। এতে আমার যুদ্ধ করতে অসুবিধা হচ্ছিলো। অগত্যা ঝুলন্ত হাতখানা পা দিয়ে চেপে ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম। ইবনে ইসহাক বলেন, এই বীর মোজাহেদ হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

মো'য়ায বলেন, এরপর মোয়াওয়ায ইবন আরেক এসে আর এক আঘাত করে আবু জাহলকে ধরাশায়ী করলো। মোয়াওয়ায় (রা.) পরে লড়াই করে বদরেই শহীদ হন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি যখন আবু জাহলকে ময়দানে শায়িত দেখলাম, তখনো সে বেঁচে ছিলো। সে আমাকে মক্কায় অপদস্থ করেছিলো। আমি তার ঘাড়ে পা দিয়ে চেপে ধরলাম এবং বললাম, 'হে আল্লাহর দুশমন। আল্লাহ তায়ালা তোকে অপদস্থ করেছেন তো? সে বললো, যাকে তোমরা প্রায় হত্যা করেছো, তার আর অপদস্থ হবার প্রশ্ন আসে কি? আমাকে বলো, আজ কাদের জয় হচ্ছে? আমি বললাম, 'জয় হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের।' ইবনে ইসহাক বলেন, ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আবু জাহল মৃত্যুর পূর্বে আমাকে বলেছিলো, হে মেষের রাখাল! তুই অনেক দুর্লভ মর্যাদা লাভ করেছিস। তিনি বলেন, তারপর আমি তার মাথা কেটে রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (স.)! এই যে আল্লাহর দুশমন আবু জাহলের মাথা! রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, সত্যি? আমি বললাম, আল্লাহর কসম! সত্যি। এরপর তার মাথাটা রসূলাল্লাহ (স.)-এর সামনে রেখে দিলাম। তিনি তা দেখে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করলেন।

ইবনে হিশাম বলেন, 'ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) একবার সাঈদ ইবনে আস (রা.)-কে বললেন– যখন তিনি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন– মনে হয়, তোমার মনে এরূপ ধারণা বিদ্যমান যে, আমি তোমার পিতা আসকে হত্যা করেছি। যদি তা করে থাকতাম, তবে সে জন্যে তোমার কাছে কোনোরূপ ওযর পেশ করতাম না। আসলে আমি আমার মামা 'আস ইবনে মুগীরাকে হত্যা করেছিলাম। তোমার আব্বাও আমার সামনে পড়েছিলো। তবে সে ক্ষিপ্ত ষাঁড়ের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসায় আমি দ্রুত সেখান থেকে সরে পড়ি। এরপর তাকে তার চাচাতো ভাই আলী (রা.) হত্যা করেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, ইয়াযীদ ইবনে রুমান ওরওয়া ইবনে যোবায়র সূত্রে আয়েশা (রা.) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এরপর রসূল (স.)-এর নির্দেশ মতো নিহত মোশরেকদের বদর কূপে নিক্ষেপ করা হলো। তবে উমাইয়া ইবনে খালফের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা হলো না। কেননা, তার লাশ তার বর্মের মধ্যে ফুলে-ফেঁপে আটকে গিয়েছিলো। সাহাবীরা তার লাশ সরাবার জন্যে চেষ্টা করলে তার গোশত ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো। এ অবস্থা দেখে তাঁরা তাকে যেমন ছিলো তেমনভাবে রেখে মাটি ও পাথর চাপা দিলেন। কূপের মধ্যে লাশগুলো নিক্ষেপ করার পর রসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে বললেন, হে কূপের অধিবাসীরা! তোমাদের রব তোমাদের জন্যে যা ওয়াদা করেছিলেন, তা কি তোমরা সত্য পেয়েছো? আমার সংগে আমার রব যা ওয়াদা করেছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সাহাবীরা বলেন, ইয়া রসূল (স.)! আপনি কি মৃতদের সাথে কথা বলছেন? তখন তিনি তাদের বললেন, তারা এতক্ষণে ভালোভাবে জেনেছে যে, তাদের রব তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সত্য।

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূল (স.) যখন মোশরেকদের লাশ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন, তখন উতবা ইবনে রবী'য়ার লাশ টেনে কূপের কাছে আনা হলো। এ সময় রসূল (স.) তার ছেলে আবু হোযায়ফার (যিনি ইতিপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন) মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, সে মর্মাহত এবং তার চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। তখন নবী (স.) বললেন, সম্ভবত তোমার পিতার অবস্থা দেখে তোমার অন্তরে কিছু ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আমার পিতার কুফরী ও হত্যার ব্যাপারে কখনো দুঃখিত হয়নি। তবে আমি আমার পিতাকে যথেষ্ট

জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সহিষ্ণু এবং উন্নত গুণের অধিকারী বলে জানতাম। সে জন্যে আশা করেছিলাম যে, এসব গুণ বৈশিষ্ট্য আমার পিতাকে একদিন ইসলামের পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমি যখন দেখলাম যে, এসব গুণ বৈশিষ্ট্য আমার পিতাকে ইসলামের পথে আনলো না। শেষ পর্যন্ত যখন কুফরী নিয়েই তার মৃত্যু হলো, তখন আমার মনের আশা পূর্ণ না হওয়ায় আমি মর্মাহত হলাম। একথায় রসূল (স.) হোযায়ফার কল্যাণের জন্যে দো'য়া করলেন এবং তার প্রশংসা করলেন।

এরপর রসূল (স.) সৈন্যদের মধ্যে যে গনীমতের মাল ছিলো তা একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন। তখন তা একত্রিত করা হলো। গনীমতের মালের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। যারা ওই সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন, তারা বললেন, এ সম্পদ আমাদের প্রাপ্য। যারা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁরা বললেন, এগুলো আমাদের পাওনা। আল্লাহর কসম! আমরা যদি যুদ্ধ না করতাম, তাহলে তোমরা এগুলো সংগ্রহ করার সুযোগই পেতে না। কোরায়শ বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় আমরা তোমাদের সাথে গনীমত কুড়ানোর কাজে যোগ দিতে পারিনি। আর তোমরা এগুলো সংগ্রহ করতে পেরেছো। শত্রুরা ভিন্ন পথ দিয়ে এসে রসূল (স.)-এর ওপর হামলা করতে পারে, এই আশংকায় যারা তাঁর পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন, তারা বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের চেয়ে এর বেশী হকদার নও। শত্রুকে আমরা বাগে পেয়েছিলাম এবং আমরা তাদের হত্যা করতে পারতাম। আল্লাহর কসম! আমরা বিনা বাধায় গনীমতের মাল লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু শত্রুরা নতুন করে রসূলুল্লাহ (স.)-এর ওপর আক্রমণ চালাতে পারে, এই আশংকায় আমরা তাঁর পাহারায় নিয়োজিত ছিলাম। সুতরাং এই সম্পদে তোমাদের অধিকার আমাদের চেয়ে বেশী নয়।'

ইবনে ইসহাক বলেন, গনীমত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন, আমরা যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, তাদের মধ্যে মালে গনীমত নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। আমাদের মতবিরোধ কিছুটা খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো। তখন আল্লাহ তায়ালা তা আমাদের হাত থেকে নিয়ে তাঁর রসূলের হাতে সমর্পণ করেন। আর রসূল (স.) তা সমস্ত মুসলমানের সমভাবে বন্টন করে দেন। এ সম্পর্কে সূরা আনফালের প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়।

ইবনে ইসহাক বলেন, মদীনায় পৌঁছে রসূল (স.) যুদ্ধবন্দীদের সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং বলেন, তোমরা কয়েদীদের সাথে ভালো ব্যবহারের কথা স্মরণ রাখবে। রাবী বলেন, সাহাবী মোসায়ব ইবনে ওমায়র (রা.)-এর সহোদর ভাই আবু আযীয ইবনে ওমায়র ইবনে হাশেম বন্দীদের মধ্যে ছিলো। আবু আযীয বলেন, এসময় আমার ভাই মোসায়ব আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন একজন আনসার সাহাবী আমাকে বন্দী করে রেখেছিলো। আমার ভাই আনসারকে বলেন, একে শক্ত করে বেঁধে রাখো, এর মা বিত্তশালী। সে ফিদয়া দিয়ে একে ছাড়িয়ে নেবে। আবু আযীয আরো বলেন, বদর প্রান্তর থেকে বন্দী হয়ে আসার সময় আমি আনসারদের সংগে ছিলাম। তারা রসূল (স.)-এর নির্দেশ মতো খাবার সময় আমাকে রুটি খেতে দিতো এবং নিজেরা খেজুর খেতো। তিনি আরো বলেন, আমি লজ্জার খাতিরে রুটি তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতাম, কিন্তু তারা তা স্পর্শ না করে তা আমার কাছে ফেরত পাঠাতেন।

ইবনে হিশাম বলেন, আবু আযীয ছিলো নযর ইবনে হারেছের পরেই কোরায়শ বাহিনীর পতাকাবাহী সেনাধ্যক্ষ। মোসায়ব (রা.) যখন তার ভাই আবু আযীযকে বন্দী করে আনয়নকারী আনসার সাহাবী আবু ইয়াসার (রা.)-কে শক্ত করে তার হাত বাঁধার জন্যে বলেন, তখন সে মোসায়ব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে, হে আমার ভাই, আমার ব্যাপারে এরূপ করার কি নির্দেশ পেয়েছেন? তখন মোসায়ব (রা.) বলেন, তুমি আমার ভাই নও, সে আমার ভাই।

এরপর আবু আযীযের মা মুসলমানদের কাছে জানতে চায় যে, কতো অধিক ফিদ্য়ার বিনিময়ে কোরায়শ বন্দীকে ছাড়া হচ্ছে? তখন তাকে বলা হলো, চার হাজার দিরহাম, সে অনুযায়ী তার মা চার হাজার দিরহাম ফিদয়া স্বরূপ পাঠিয়ে তাকে মুক্ত করে নেয়।

উল্লেখিত বদর যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সূরা আনফাল অবতীর্ণ হয়েছে, যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যথাসাধ্য আমি পূর্বে করেছি। সূরা আনফাল নাযেল হয়েছে নিম্নের কারণগুলোকে সামনে রেখে,

১. বদর যুদ্ধের বাহ্যিক ঘটনাবলী বর্ণনা করা।

২. বাহ্যিক ঘটনাবলীর পশ্চাতে আল্লাহর সুনিপুণ কুদরতের কথা বলা।

৩. উক্ত ঘটনাবলী ও তার পরবর্তী ঘটনাসমূহের আলোকে গোটা মানব ইতিহাসের ধারায় আল্লাহর কুদরত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনাকে উন্মোচন করা।

আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধের ঘটনাবলী কোরআনে হাকীমে সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যুদ্ধের বিভিন্ন দিকের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা এই সূরার বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় পাবো। এখানে আমি এই সূরার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

বদর যুদ্ধের মাঝে একটি বিশেষ ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে। যা যুদ্ধের গতিপথ সম্পর্কে আলোকপাত করে। ওই বিশেষ ঘটনাটি ইবনে ইসহাক ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, তাদের মধ্যে মালে গনীমত নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। আমাদের মতবিরোধ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো। তখন আল্লাহ তা আমাদের হাত থেকে নিয়ে তাঁর রসূলের হাতে সমর্পণ করেন, আর রসূল (স.) তা সমস্ত মুসলমানের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেন। এ সম্পর্কে সূরা আনফালের প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়।

এই ঘটনাটি সূরার সূচনা এবং তার গতিপথের প্রতি আলোকপাত করে।

বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত সামান্য মালে গনীমত নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ তায়ালা তার বন্টনের দায়িত্ব রসূলে করীম (স.)-এর হাতে ন্যস্ত করেন। কেয়ামত পর্যন্ত মানব ইতিহাসে এ জাতীয় যতো ঘটনা ঘটবে, সকল ঘটনার জন্যে এটাকে একটি অনুকরণীয় আদর্শ হিসাবে পেশ করেছেন। যার থেকে যুগে যুগে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করবে। আল্লাহ তায়ালা এ ঘটনার মাধ্যমে শুধু সাহাবায়ে কেরাম নয়, বরং পরবর্তীতে এ ধরাতে আগমনকারী গোটা মানবতাকে এক বিরাট বিষয় শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। আর তা হচ্ছে বদর যুদ্ধের ঘটনাটি শুধু গনীমতের মাল-সামগ্রী প্রাপ্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা তার চেয়ে অনেক বড় ও ব্যাপক। আল্লাহ পাক বদর যুদ্ধের দিনের নামকরণ করেছেন 'ফয়সালা ও মীমাংসার দিন' করে। কারণ, এ দিনে মুসলমান এবং কোরায়শ বাহিনী একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলো। এদিনে হক ও বাতেল, সত্য ও অসত্য, ন্যায় ও অন্যায় এবং ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা এ যুদ্ধের মাধ্যমে মোমেনদেরকে আরো শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, এ যুদ্ধের প্রত্যেকটি ছোটো বড়ো পদক্ষেপ তাঁরই পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণে সম্পাদিত হয়েছে। আর তার পেছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত ছিলো, যা একমাত্র তিনিই ভালো করে জানেন। সুতরাং এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, বদর যুদ্ধে বিজয় এবং তার পরবর্তী বৃহৎ ঘটনাবলীতে মোমেনদের ভূমিকাই মুখ্য এবং তারাই কৃতিত্বের একমাত্র দাবীদার। কারণ আল্লাহর সাহায্য যদি তাদের সহায়ক না হতো, তবে এ বিজয় তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। আল্লাহ তায়ালা বদরের ঘটনার মাধ্যমে মোমেনদেরকে চমৎকার পরীক্ষা করেছিলেন।

বদর যুদ্ধে যে সকল মোমেন মোজাহেদ রসূলের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের ইচ্ছা ছিলো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমণ করে বিজয়ী হওয়া। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো তারা কোরায়শ বাহিনীর মুখোমুখি হোক। এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের ইচ্ছা এবং তাঁর ইচ্ছার মধ্যকার ব্যবধানের পরিধি নিরূপণ করেছেন।

সূরা আনফালের সূচনা হয়েছে মালে গনীমত সম্পর্কে মোমেনদের প্রশ্নের মাধ্যমে, এতে আল্লাহর হুকুম বর্ণনা করা, ফয়সালার জন্যে মালে গনীমতকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (স.)-এর হাতে হাতে সমর্পণ করা, 'ওবাদা ইবন সামেত (রা.)-এর বর্ণনানুসারে মালে গনীমত সম্পর্কে মোমেনদের মতবিরোধ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছার পর তাদেরকে খোদাভীতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নেয়ার আহ্বান করার মাধ্যমে। অনুরূপভাবে এই সূরার শুরু হয়েছে মোমেনদেরকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করা, তাদের ঈমানের দাবী স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাদের সামনে এমন একটি চিত্র অংকন করা, যার মাধ্যমে তাদের অন্তর ও হৃদয় কেঁপে ওঠে। (আয়াত ১-৪)

অতপর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নিজেদের ব্যাপারে তাদের এবং তাঁর সিদ্ধান্ত। এ দুই সিদ্ধান্তের মাঝে পার্থক্য এবং তাদের জন্যে তাঁর সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছার পেছনের কী হেকমত লুকিয়ে আছে সে সম্পর্কে তাদেরকে সম্যক ধারণা দেয়া। (আয়াত ৫-৮)

নিম্নের আয়াতসমূহে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আরো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর পক্ষ থেকে যুদ্ধের মাঠে ফেরেশতা নাযিলের মাধ্যমে তাদের সাহায্য দান, পরবর্তীতে মোশরেক বাহিনীর ওপর তাদের বিজয় দান এবং পরকালে তাঁর কাছে তাদের প্রতিদানপ্রাপ্তি সম্পর্কে। (আয়াত ৯-১৪)

সামনের আয়াতগুলোতে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেন যে, পুরো যুদ্ধটি তাঁর পরিচালনা, নেতৃত্ব, নির্দেশনা, সাহায্য, নিরূপণ ও নির্ধারণেই সম্পাদিত হয়েছে। এ যুদ্ধটি তাঁর জন্যে এবং তাঁরই পথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারপর তিনি মুসলিম মোজাহেদদেরকে আনফাল তথা গনীমতের মাল সামান বন্টনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখলেন এবং এ দায়িত্ব তাঁর এবং তাঁর প্রিয় হাবীব মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহের হাতে দান করলেন। যেহেতু তাঁর পক্ষে সরাসরি বন্টন সম্ভব নয়, সেহেতু সে দায়িত্বটি রসূলের ওপরই পুরোপুরি বর্তালো। তারপর তিনি ঘোষণা করলেন যে, যেহেতু মালে গনীমত বন্টনের মূল দায়িত্ব একমাত্র তাঁর হাতেই অর্পিত, সেহেতু তিনি যদি তার থেকে মুসলিম মোজাহেদদের মাঝে বন্টন করে দেন, তবে তা তাঁর পক্ষ হতে তাদের জন্যে করুণা এবং এহসান হিসাবেই গণ্য হবে। অনুরূপভাবে তিনি তাদেরকে যাবতীয় মালে গনীমত ও তার লোভ লালসা থেকে মুক্ত করেন, যাতে তাদের জেহাদ আল্লাহর পথে এবং একমাত্র তাঁরই জন্যে নিবেদিত হয়। উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন নিম্নের আয়াতগুলোতে পাওয়া যাবে। (আয়াত ১৭, ১৮, ২৬ এবং ৪০-৪৪)

আর যেহেতু মোমেনদের প্রত্যেকটি যুদ্ধই আল্লাহ পাকের পরিচালনা, নেতৃত্ব, নির্দেশনা, সাহায্য, নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণেই সম্পাদিত হয় এবং এ যুদ্ধ তাঁরই জন্যে ও তাঁরই পথে অনুষ্ঠিত হয়, সেহেতু এই সূরার মধ্যে যুদ্ধের মাঠে স্থির থাকা, ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, এর জন্যে প্রস্তুতি নেয়া এবং এতে আল্লাহ পাককে অভিভাবক মেনে আশ্বস্ত হওয়ার মোমেনদের প্রতি আহবান এসেছে অনুরূপভাবে নির্দেশ এসেছে যুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সন্তান সন্ততি এবং ধন-সম্পদ থেকে সতর্ক থাকার জন্যে। যুদ্ধের নিয়ম শৃংখলা মেনে চলা এবং দম্ভভরে এবং লৌকিকতার প্রদর্শনের জন্যে যুদ্ধের মাঠে না আসা সম্পর্কে সতর্কতা। সাথে সাথে মোমেনদেরকে জেহাদের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং উৎসাহিত করার জন্যে রসূলুল্লাহ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উল্লেখিত বক্তব্যের সপক্ষে কিছু আয়াত নিম্নে প্রদত্ত হলো। (আয়াত ১৫, ১৬, ২৪, ২৭, ২৮, ৪৫-৪৭, ৬০, ৬৫)

যুদ্ধের মাঠে ধীর স্থির ও অটুট থাকার একাধিক নির্দেশ বর্ণনার সাথে কোরআনে কারীম আকীদার বিভিন্ন খুঁটিনাটি দিক এবং তার সাথে প্রত্যেক বিষয়, প্রত্যেক নির্দেশ এবং প্রত্যেক নির্দেশনাকে সেই আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি প্রত্যাবর্তন করানোর বিষয়টিও স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছে। সুতরাং আল্লাহ পাকের নির্দেশসমূহ শূন্যের মাঝে ঝুলন্ত থাকবে না। বরং তা সুস্পষ্ট অটুট গভীর মূলের ওপরে গেঁথে দেয়া হবে। এর কয়েকটি দিক নিম্নে বর্ণিত হলো,

ক. মালে গনীমত সম্পর্কিত বিষয়ে মোমেনদেরকে তাকওয়া অবলম্বন, আল্লাহর স্মরণে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠা এবং ঈমানকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন। (আয়াত ১-৪)।

খ. যুদ্ধের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মোমেন মোজাহেদদেরকে আল্লাহর নিরূপণ, নির্ধারণ, পরিচালনা এবং যুদ্ধের সকল স্তরে আল্লাহর তাকদীর ও তদবীরের প্রতি প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

'স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমরা উপত্যকার এ প্রান্তে ছিলে আর তারা ছিলো সে প্রান্তে। অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নীচে নেমে গিয়েছিলো, যদি আগে ভাগেই তোমাদের ও তাদের মধ্যে মোকাবেলার চুক্তি হয়ে থাকতো, তাহলে তোমরা অবশ্য এ সময় পাশ কাটিয়ে যেতে। কিন্তু যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা এ জন্যে ঘটেছিলো যে, আল্লাহ যে বিষয়ের ফয়সালা করে ফেলেছিলেন, তা তিনি কার্যকর করবেনই।'

গ. যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও ফলাফলের ক্ষেত্রে মুসলিম মোজাহেদদেরকে আল্লাহর নেতৃত্ব, আদেশ, সাহায্য, সহযোগিতা ও একমাত্র তাঁর রসদের প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (আয়াত ১৭)

ঘ. যুদ্ধের মাঠে ধীর স্থির ও অটুট থাকার ক্ষেত্রে তাদেরকে আস্থাবান হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের জন্যে আল্লাহর পছন্দসই জীবন, তাদের এবং অন্তরের মধ্যকার প্রতিবন্ধকতার ওপর তাঁর ক্ষমতা এবং যারা তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থাবান তাদের সাহায্যের তাঁর যিম্মাদারী ও প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করানো হয়েছে। (আয়াত ২৪, ৪৫)

ঙ. যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছে,

'হে ঈমানদাররা! এ কাফেরদের সাথে এমনভাবে যুদ্ধ করো যেন গোমরাহী ও বিশৃংখলা নির্মূল হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।' 'সারা দেশে শত্রুদেরকে ভালভাবে পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত কোনো নবীর পক্ষে নিজের কাছে বন্দীদের রাখা শোভনীয় নয়।' (আয়াত ৭-৮)

চ. মুসলিম সমাজ এবং এ সমাজ ও অন্যান্য সমাজের মাঝে সম্পর্ক কায়েম এবং সুবিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে আকীদা বিশ্বাসকে মূল মাপকাঠি ও বিচার্য বিষয় হিসাবে ধরা হয়। আর এই মানদন্ডের ভিত্তিতেই সম্পর্কের প্রাধান্য দেয়া হয় এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। (আয়াত ৭২-৭৫)

এ সূরার আলোচনায় আকীদা বিশ্বাসের বিষয়টির পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহর পথে জেহাদ, তার ঈমানী ও আন্দোলনগত মূল্য বর্ণনা, অনুরূপভাবে এ জেহাদকে ব্যক্তিগত যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত করা এবং একে এর বিষয়কেন্দ্রিক সুউচ্চ যুক্তিসমূহ প্রদান করা, যার আলোকে আল্লাহর পথে মোজাহেদরা পূর্ণ আস্থা, প্রশান্তি ও

উচ্চতা সহকারে চিরকাল জেহাদ করে যাবে। এটাই এই সূরার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। নীচে আমি জেহাদ সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত পেশ করছি। পরবর্তীতে প্রত্যেকটি আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পেশ করবো, ইনশাআল্লাহ। (আয়াত ১৫-১৬, ৫৫-৫৭, ৬০, ৬৫, ৬৭, ৭৪)

সবশেষে এ কথা বলতে হচ্ছে যে, এই সূরা মুসলিম দল, জনগোষ্ঠী ও সমাজের সম্পর্ককে আকীদা বিশ্বাসের এক দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। আগে আমি তা বর্ণনা করেছি। সাথে সাথে এ সূরা এর নাযিলের সময় পর্যন্ত যুদ্ধে এবং শান্তিতে অমুসলিমদের সাথে আচরণ, লেন দেন এবং সম্পর্কের বিধি বিধানও বর্ণনা করেছে। উপরন্তু এ সূরা মালে গনীমতের হুকুম আহকাম এবং চুক্তির রীতি নীতি বর্ণনা করেছে। এ সূরা তার বিভিন্ন আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মুসলমান ও অমুসলমানের সম্পর্ক সুবিন্যস্ত করার মূলধারা এবং সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানের প্রতি আলোকপাত করেছে। যার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হলো।

'হে নবী, লোকেরা তোমার কাছে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে? বলে দাও, এ গনীমতের মাল তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের।'

(আয়াত নং-১৫-১৬,২১,২৪,২৭,৩৮-৩৯)

'আর তোমরা জেনো রাখো, তোমরা যা কিছু গনীমতের মাল লাভ করেছো, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ, তাঁর রসূল, আত্মীয়স্বজন, এতীম, মেসকীন ও মোসাফেরদের জন্যে নির্ধারিত।' ৪৫-৪৭,৫৫-৬২,৬৪-৬৬,৬৭-৭১,৭২-৭৫)

ওপরে যা কিছু আমি বর্ণনা করলাম তো সূরা আনফালের মূল বিষয়াদির সার সংক্ষেপ। যদিও সুরাটি বদর যুদ্ধ এবং এর পর্যালোচনাকে উপলক্ষ করেই নাযিল হয়েছে, তথাপি আমরা মুসলিম সমাজের প্রশিক্ষণ এবং তাকে বিশ্ব মানবতার নেতৃত্বের জন্যে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কোরআনী বিধানের একটি দিক এর মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারি। পাশাপাশি আমরা এ পৃথিবীতে এবং মানব জীবনে যা অহরহ ঘটছে, তার মমার্থ ও মাহাত্মের প্রতি দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিভংগির কিছু বিষয় ও উপলব্ধি করতে পারি, যার মাধ্যমে এসব বিষয়ে একটা বিশুদ্ধ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হবে।

বদর যুদ্ধ হচ্ছে ইসলামের প্রথম বৃহৎ যুদ্ধ। যাতে মুসলমানরা তাদের চিরশত্রু মোশরেকদের মুখোমুখি হয়েছিলো এবং তাদেরকে অপমানজনকভাবে পরাস্ত করেছিলো। মুসলমানরা প্রকৃতপক্ষে এ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে মদীনা থেকে বের হয়নি। সত্যিকার অর্থে তারা বের হয়েছিলো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ করার জন্যে। যারা মুসলিম মোহাজেরদেরকে তাদের ঘর বাড়ী ও সহায় সম্পদ থেকে বিতাড়িত করেছিলো। মুসলমানরা কোরায়শের বাণিজ্য কাফেলা থেকে যে মালে গনীমত প্রাপ্তির আশা করেছিলো আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে তা চাননি। বরং তিনি চেয়েছিলেন কাফেরদের বাণিজ্য কাফেলা মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে যাক। আর মুসলমানরা কোরায়শ বাহিনীর– যাতে তাদের নেতৃবৃন্দও ছিলো– মুখোমুখি হোক, যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর অনুসারীদের ওপর নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছিলো। যারা মক্কাতে রসূলের দাওয়াতী মিশনকে স্তব্ধ ও স্থবির করে দিয়েছিলো এবং বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহকে এ দুনিয়া থেকে চির বিদায় করে দেয়ার জন্যে ষড়যন্ত্রও করেছিলো।

রব্বুল 'আলামীন চেয়েছিলেন যে, বদরের যুদ্ধটি হক ও বাতিলের মাঝে পাথর্ক্যকারী, ইসলামী ইতিহাসের ফয়সালা প্রদানকারী এবং সর্বোপরি মানব ইতিহাসের এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় একটি মীমাংসাকারী ঘটনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হোক। আল্লাহ তায়ালা এটাও চেয়েছিলেন যে, মানুষের নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যাতে তারা নিজেদের কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনে

করে, তার মাঝে এবং তাদের জন্যে গৃহীত মালিকের সিদ্ধান্তের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হোক। যদিও মানুষ তথা মোমেন মোজাহেদরা প্রথমে সেই সিদ্ধান্তকে অপছন্দ করেছিলো। অনুরূপভাবে আল্লাহর এটাও ইচ্ছা ছিলো যে, মুসলিম মোজাহেদরা জয় পরাজয়ের কারণসমূহ জানুক এবং তাকে চিহ্নিত করুক এবং যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান কালীন সময়ে এ জয় পরাজয়ের কারণ ও উপায় উপকরণগুলো তারা তাদের মালিকের কাছ থেকে সরাসরি গ্রহণ করুক।

আলোচ্য সূরা এ বিশাল বাস্তবতা, সমৃদ্ধ তথ্য ও মর্মার্থের পাশাপাশি যেমন আল্লাহ প্রদত্ত দিক নির্দেশনা সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে, তেমনি যুদ্ধ-শান্তি, মালে গনীমত, বন্দী, অংগীকার ও চুক্তির বিভিন্ন বিধান ও নিয়মাবলী এবং জয় পরাজয়ের কারণ, উপায় উপকরণ ও উপাদানসমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আর এসব কিছু এ সূরায় আল্লাহ পাকের বিশেষ বর্ণনাভঙ্গিতে সাজানো হয়েছে। যা আকীদাগত চিন্তা চেতনাকে উৎপন্ন, সৃষ্টি ও জাগ্রত করে এবং তাকে মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড ও কার্যকলাপে প্রধান ও সর্ববৃহৎ চালিকাশক্তি হিসাবে নির্ধারণ করে দেয়। আর এটাই হচ্ছে বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপন এবং দিক-নির্দেশনার ক্ষেত্রে কোরআনী বিধানের বৈশিষ্ট্য।

সাথে সাথে এ সূরা যুদ্ধের বিভিন্ন দৃশ্য যুদ্ধপূর্ব, যুদ্ধ চলাকালীন এবং যুদ্ধ পরবর্তী মানব অন্তরের রকমারি গতি, আবেগ ও উচ্ছাসের দৃশ্যকে অন্তর্গত করে। এসব জীবন্ত দৃশ্য মানব আবেগ অনুভূতিতে যুদ্ধ সম্পর্কিত অবস্থা, তার প্রভাব, কার্যকারিতা, আকার আকৃতি, চিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে এমনভাবে উপস্থিত করে এবং তাকে জাগিয়ে তোলে, যেন কোরআনুল হাকীমের পাঠকরা আজও সে দৃশ্যসমূহ সরাসরি দেখছে এবং তার ডাকে তারা গভীরভাবে সাড়া দিচ্ছে।

এ সূরা প্রাসঙ্গিকভাবে রসূলের জীবন এবং সাহাবায়ে কেরামের মক্কী জীবনের বিভিন্ন চিত্র উপস্থাপন করেছে। যখন তাদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য এবং তারা ছিলো অসহায় ও দুর্বল এবং তারা সদা সর্বদা আশংকা করতো তাদেরকে খতম করে দেয়া হবে। এই প্রাসংগিক অবতারণা এ জন্যে করা হয়েছে যাতে তারা বিজয়ের মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা করুণা ও কৃপাকে স্মরণ করতে পারে। সাথে সাথে তারা এটাও ভালো করে জানতে পারে যে, নিশ্চয়ই তাদেরকে আল্লাহ পাকের খাস সাহায্য করা হবে। আর এটা হচ্ছে সে দ্বীনের জন্যেই, যাকে তারা স্বীয় মাল সম্পদ এবং জীবনের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছিলো। পাশাপাশি এ সূরা রসূলের হিজরতের পূর্বের এবং পরের মোশরেকদের জীবনের কিছু দৃশ্য ও চিত্র প্রাসংগিক বর্ণনা করেছে। এই সূরায় তাদের পূর্ববর্তী কাফের নেতা ফেরআউন এবং তাদের পূর্বের অন্যান্য লোকদের পরিণামের কিছু নমুনা ও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর চিরন্তন বিধানকে তাঁর যমীনে প্রতিষ্ঠিত করা। তা হচ্ছে তাঁর বন্ধুদেরকে এ যমীনে বিজয় দান করা এবং তাঁর শত্রুদেরকে এখানেই ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। এ বিধানের ব্যতিক্রম কখনো ঘটে না।

ওপরে আমি যা বর্ণনা করলাম, তা হচ্ছে এ সূরার আলোচ্য বিষয় ও এর বৈশিষ্ট্য, যা একটার সাথে আরেকটা অংগাংগিভাবে সম্পৃক্ত। আলোচনা প্রসংগে আমি এ খন্ডে কিছু বর্ণনা করেছি, এর অবশিষ্টাংশ দশম খন্ডে বর্ণনায় আসবে। এ হচ্ছে সূরার আলোচ্য বিষয়ের সার সংক্ষেপ প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যার সময় তার বিস্তারিত ও বিশদ বর্ণনা উপস্থাপন করা হবে।

সূরা আল আনফাল

আয়াত ৭৫ রুকু ১০

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ص وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ①
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ② الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ③ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ
دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ④ كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ
بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ص وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ⑤ يُجَادِلُوْنَكَ

রুকু ১

১. (হে মোহাম্মদ,) লোকেরা তোমার কাছে (যুদ্ধলব্ধ ও যুদ্ধে পরিত্যক্ত) অতিরিক্ত (মাল-সামান) সম্পর্কে (আল্লাহ তায়ালার হুকুম) জানতে চাচ্ছে; তুমি (তাদের) বলো, (এ) অতিরিক্ত সম্পদ হচ্ছে (মূলত) আল্লাহ তায়ালার জন্যে এবং (তাঁর) রসূলের জন্যে, অতএব (এ ব্যাপারে) তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং (এ নির্দেশের আলোকে) নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নাও, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা সত্যিকার (অর্থে) মোমেন হয়ে থাকো। ২. মোমেন তো হচ্ছে সেসব লোক, (যাদের) আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করানো হলে তাদের হৃদয় কম্পিত হয়ে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা (সব সময়) তাদের মালিকের ওপর নির্ভর করে। ৩. যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদের যা কিছু (অর্থ-সম্পদ) দান করেছি তা থেকে তারা (আমারই পথে) খরচ করে। ৪. (মূলত) এ (গুণসম্পন্ন) লোকগুলোই হচ্ছে সত্যিকার মোমেন, তাদের মালিকের কাছে তাদের জন্যে (বিপুল) মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা (-র ব্যবস্থা) রয়েছে। ৫. (সেভাবেই তোমাদের বের হওয়া উচিত ছিলো) যেভাবে তোমার মালিক তোমাকে তোমার বাড়ী থেকে বের করে এনেছেন, অথচ (তখনও) মোমেনদের একদল লোক (ছিলো এ কাজের দারুন অপছন্দকারী। ৬. সত্য (তোমার

فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٦
وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ
الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ
الْكٰفِرِيْنَ ۝٧ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٨ اِذْ
تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ
مُرْدِفِيْنَ ۝٩ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ
اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝١٠ اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً
مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ
الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝١١

কাছে) প্রকাশিত হওয়ার পরও এরা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে, (মনে হচ্ছিলো) তারা যেন দেখতে পাচ্ছিলো, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকেই তাদের ঠেলে দেয়া হচ্ছে। ৭. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন– দুটি দলের মধ্যে একটি দল তোমাদের (করায়ত্ত) হবে, (অবশ্য) তোমরা (তখন) চাচ্ছিলে (দুর্বল ও) নিরস্ত্র দলটিই তোমাদের (করায়ত্ত) হোক, অথচ আল্লাহ তায়ালা তাঁর 'কথা' দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন এবং (এর মাঝ দিয়ে তিনি) কাফেরদের শেকড় কেটে (তাদের নির্মূল করে) দিতে চেয়েছিলেন, ৮. (এর উদ্দেশ্য ছিলো) সত্যকে যেন (তার) সত্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং বাতিলকে যাতে করে (বাতিলের মতোই) নির্মূল করা যায়, যদিও পাপিষ্ঠরা (একে) পছন্দ করেনি। ৯. (আরো স্মরণ করো,) যখন তোমরা তোমাদের মালিকের কাছে (কাতর কণ্ঠে) ফরিয়াদ পেশ করছিলে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, হাঁ, আমি তোমাদের (এ যুদ্ধের ময়দানে) পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করবো। ১০. আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শুভ সংবাদ দেয়া ও তা দিয়ে তোমাদের মনকে প্রশান্ত করার উদ্দেশেই এটা বলেছিলেন, (নতুবা আসল) সাহায্য তো আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকেই আসে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান।

রুকু ২

১১. (আরো স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের নিরাপত্তা ও স্বস্তির জন্যে তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টির পানি নাযিল করেছেন, উদ্দেশ্য ছিলো এ (পানি) দ্বারা তিনি তোমাদের ধুয়ে পাক-সাফ করবেন, তোমাদের মন থেকে শয়তানের অপবিত্রতা দূর করবেন, তোমাদের মনে সাহস বৃদ্ধি করবেন, (সর্বোপরি যুদ্ধের ময়দানে) তিনি এর মাধ্যমে তোমাদের কদম মযবুত করবেন।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي
فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا
مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَٰفِرِينَ
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا
تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ
مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

১২. (তাও স্মরণ করো,) যখন তোমার মালিক ফেরেশতাদের কাছে ওহী পাঠিয়ে বললেন, আমি তোমাদের সাথেই আছি, অতএব তোমরা মোমেনদের সাহস দাও (তাদের কদম অবিচল রাখো); অচিরেই আমি কাফেরদের মনে দারুণ এক ভীতির সঞ্চার করে দেবো, অতএব তোমরা (তাদের) ঘাড়ের ওপর আঘাত হানো এবং তাদের (হাড়ের) প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করো। ১৩. এ (কাজ)-টা এ কারণে যে, এরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে মোকাবেলায় নেমেছে, আর যারাই এভাবে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে (তাদের জানা উচিত), আল্লাহ তায়ালা আযাব দানে অত্যন্ত কঠোর। ১৪. (হে কাফেররা,) এ হচ্ছে তোমাদের (যথার্থ পাওনা), অতপর (ভালো করে) তোমরা এর স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো, কাফেরদের জন্যে দোযখের (ভয়াবহ) আযাব তো রয়েছেই। ১৫. হে মোমেন বান্দারা, তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের মুখোমুখি মোকাবেলা করবে, তখন কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। ১৬. (জেনে রেখো,) এ (যুদ্ধের) দিন যে ব্যক্তি তার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, সে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার গজব অর্জন করবে, তবে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে কিংবা (নিজ) বাহিনীর সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্য ছাড়া (যদি কেউ এমনটি করে তাহলে), তার জন্যে জাহান্নামই হবে একমাত্র আশ্রয়স্থল; আর জাহান্নাম সত্যিই নিকৃষ্ট জায়গা। ১৭. (যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে) তাদের তোমরা কেউই হত্যা করোনি, বরং আল্লাহ তায়ালাই তাদের হত্যা করেছেন, আর তুমি যখন (তাদের প্রতি) তীর নিক্ষেপ করছিলে, (মূলত) তুমি নিক্ষেপ করোনি (করেছেন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং), তিনি নিজের থেকে মোমেনদের উত্তম পুরস্কার দান করে (তাদের বিজয়) দিতে চেয়েছেন, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন এবং (সব কিছু) জানেন।

ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ
الْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ
عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَا
تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ
اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا
لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

১৮. এটা হচ্ছে তোমাদের (ব্যাপারে তাঁর নীতি), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন। ১৯. (হে কাফেররা,) তোমরা একটা সিদ্ধান্ত চেয়েছিলে, হাঁ, (আজ) সে সিদ্ধান্ত (-কর মুহূর্তটি) তোমাদের সামনে এসে গেছে, যদি এখনও তোমরা (যুদ্ধ থেকে) বিরত হতে চাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে, তোমরা যদি (আবার যুদ্ধের জন্যে) ফিরে আসো, তাহলে আমরাও (ময়দানে) ফিরে আসবো, আর তোমাদের বাহিনী সংখ্যায় যতোই বেশী হোক না কেন তা তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না, (কারণ) আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের সাথেই রয়েছেন। ২০. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, কখনো তাঁর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, (বিশেষ করে) যখন তোমরা (সব কিছু) শুনতেই পাচ্ছো।

রুকু ৩

২১. তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা (মুখে) বলে, হাঁ, আমরা (নবীর কথা) শোনলাম, কিন্তু তারা আসলে কিছুই শোনে না। ২২. আল্লাহ তায়ালার কাছে (তাঁর সৃষ্টির) নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই বধির ও মূক (মানুষগুলো), যারা (সত্য দ্বীন সম্পর্কে) কিছু বুঝে না। ২৩. আল্লাহ তায়ালা যদি জানতেন, এদের ভেতর (সামান্য) কোনো ভালো (গুণও) অবশিষ্ট আছে, তাহলে তিনি তাদের অবশ্যই (হেদায়াতের কথা) শোনাতেন; (অবশ্য) তিনি তাদের শোনালেও তারা তাকে উপেক্ষাই করতো এবং অন্যদিকে ফিরে যেতো। ২৪. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদের সত্যিকার অর্থে জীবন দান করবে, (এ কথাটা) জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন; (আবার) তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছেই জড়ো করা হবে।

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ
تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن
تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

২৫. তোমরা (আল্লাহদ্রোহিতার) সেই ফেতনা থেকে বেঁচে থাকো, যার ভয়াবহ শাস্তি- যারা তোমাদের মধ্যে যালেম শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আরো জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। ২৬. স্মরণ করো, যখন তোমরা (সংখ্যায়) ছিলে (নিতান্ত) কম, (এই) যমীনে তোমাদের মনে করা হতো তোমরা অত্যন্ত দুর্বল, তোমরা সর্বদাই এ ভয়ে (আতংকিত) থাকতে যে, কখন (অন্য) মানুষরা তোমাদের ওপর চড়াও হবে, অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (একটি ভূখন্ডে এনে) আশ্রয় দিলেন, তাঁর (একান্ত) সাহায্য দিয়ে তিনি তোমাদের শক্তিশালী করলেন এবং তিনি এ আশায় তোমাদের (বহুবিধ) উত্তম জিনিস দান করলেন যে, তোমরা (আল্লাহর এসব নেয়ামতের) শোকর আদায় করবে। ২৭. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের সাথে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং জেনে-শুনে নিজেদের আমানতেরও খেয়ানত করো না। ২৮. জেনে রেখো, তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) পরীক্ষামাত্র, (যে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে) তার জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা প্রতিদান রয়েছে।

রুকু ৪

২৯. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে তিনি তোমাদের জন্যে (অন্যদের সাথে) পার্থক্য নির্ণয়কারী (কিছু স্বতন্ত্র মর্যাদা) দান করবেন, তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেবেন, তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালার দান (আসলেই) অনেক বড়ো।

তাফসীর

আয়াত ১-২৯

'ওরা জিজ্ঞাসা করছে, আনফাল (মালে গনীমত) সম্পর্কে .... আর কাফেরদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নামের আযাব।'

এ সূরার মধ্যে প্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (যুদ্ধে শত্রুরা যে সম্পদ ফেলে যায়)-এর বিলি বন্টন বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার হুকুম জানানো। একে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় মালে গনীমত, যা মুসলমানেরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গিয়ে জেহাদের ময়দান থেকে লাভ করে। মুসলমানগণ সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর এ মালে গনীমত হাসিল করেন। কিন্তু কোন নীতিমালা অনুসারে এসব সম্পদ বিলি-বন্টন হবে, তা না জানা থাকার কারণে সবাই বেশ সংকট অনুভব করছিলেন এবং এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে কিছু বাক বিতন্ডার সূত্রপাত হয়। এজন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এ বিষয়ে তাঁর ফয়সালার দিকে নযর দিতে আহ্বান জানাচ্ছেন। সাথে সাথে তাদেরকে আমন্ত্রণ করছেন যেন তারা আল্লাহকে ভয় করে চলে, সকল ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে এবং তাদের অন্তরের মধ্যে ঈমান ও আল্লাহভীতিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্মরণ করাচ্ছেন কেমন করে তারা উট ও গনীমতের মাল লাভ করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলো। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে চান তাঁর সাহায্য ও আরো বহু বহু গুণে বেশী মূল্যবান বস্তু তথা মান-সম্মান চান। তিনি তাদেরকে আরো স্মরণ করাচ্ছেন, কি ভাবে যুদ্ধ সংঘটিত হলো। তখন তারা সংখ্যায় এতই কম ছিলো যে, শত্রুদের তুলনায় তাদের জনসংখ্যা কোনো ধরার মধ্যেই ছিলো না। আর না ছিলো তাদের কাছে যুদ্ধের তেমন কোনো সাজ সরঞ্জাম। দুশমনরা যেমন ছিলো সংখ্যায় তিন গুণেরও বেশী, তেমনি ছিলো সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে তারা সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত। এই কঠিন ও অসম যুদ্ধে চিন্তার বিষয় হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কেমন করে ফেরেশতাদের দ্বারা তাদের কদমকে জমিয়ে রাখলেন, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন, যার থেকে পরম পরিতৃপ্তির সাথে তারা পান করলো এবং প্রয়োজনীয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজও সম্পন্ন করলো এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের পায়ের নীচের ভূমিকে এমনভাবে জমিয়ে দিলেন যেন বালুর ওপর তাদের পা সহজে পিছলে না যায়। তারপর তাদেরকে এমন দারুন তন্দ্রা দান করলেন যা তাদের অন্তরে নিশ্চিন্ততা ও পরম প্রশান্তির হাওয়া বইয়ে দিলো। অন্যদিকে আরো চিন্তা করা দরকার কেমন করে আল্লাহ তায়ালা তাদের দুশমনদের অন্তরে ভীষণ ভীতির সঞ্চার করলেন এবং অবশেষে তাদেরকে কী কঠিন পরিণতি দান করলেন!

এই কারণে মোমেনদেরকে প্রত্যেক যুদ্ধেই দৃঢ়তা অবলম্বন করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিচ্ছেন। প্রথম দিকে দুশমনদের শক্তি তাদের কাছে যতো বেশীই মনে হোক না কেন, তার কোনো পরওয়া করার প্রয়োজন নেই। কারণ শত্রুনিধন তো আল্লাহ তায়ালাই করেন, তিনিই তীর নিক্ষেপ করেন, তিনিই যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরী করেন। তারা তো শুধু আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত ইচ্ছাকে পূরণ করার মাধ্যম মাত্র। তাদের মধ্য দিয়ে তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।

এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন মোশরেকদের ইতিপূর্বেকার বিজয় লাভ করার সকল ধারণাকে বানচাল করে দিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছেন এবং বিদ্রূপ করে বলছেন, ওরা তো এই চেয়েছিলো এবং আল্লাহর কাছে এই বলেই প্রার্থনা করেছিলো যে, হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ, এই দু' দলের মধ্যে যে দলটি বেশী বিপথগামী, তাকে ধ্বংস করে দিন এবং যেন তাদের ওপর চূড়ান্ত বিপর্যয় নেমে আসে, তাদের জন্যে যেন ভীষণ ধ্বংসলীলা নেমে আসে, যারা সম্পর্ক নষ্ট করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। এই জন্যে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে,

'তোমরা বিজয় চেয়েছিলে না? সে বিজয় তো তোমাদের কাছে এসেই গেছে।'

এ প্রসংগে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, মোশরেক কোরায়শদের মধ্যেও সর্বশক্তিমান আল্লাহ সম্পর্কে সব সময়েই কিছু চেতনা বর্তমান ছিলো, যদিও তারা দেব দেবীকে মাধ্যম মনে করতো। কিন্তু চরম বিপদের সময় সবকিছু বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর কাছেই তারা

প্রার্থনা করতো। আশেপাশের ইহুদীদের ভুল তথ্য দেয়ায় তারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কথা সহজে মেনে নিতে পারছিলো না। যালেম ইহুদীরা হিংসার বশবর্তী হয়ে নিজেরাও ইচ্ছা করে ভুল পথে চলছিলো। অপরের মধ্যেও তারা নানা প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি করে রেখেছিলো। তাই, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কটাক্ষপাত করে বলছেন, তোমরা তো বিজয় চেয়েছিলে হকপন্থীদের জন্যে। তাই তোমাদের দোয়া কবুল করেই আল্লাহ তায়ালা সত্যিকারে যারা হকপন্থী তাদেরকে বিজয় দিয়েছেন।

অপরদিকে মোমেনদেরকে আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করতে গিয়ে বলছেন, তারা যেন ওই মোনাফেকদের মতো ব্যবহার না করে যারা শোনে বটে, কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে তারা শুনেও শোনে না। অর্থাৎ যা শোনে, তা যথার্থ বুঝা সত্ত্বেও সেই অনুসারে কাজ করে না।

এরপর এ দারসটি শেষ হচ্ছে বারংবার মোমেনদের ডাক দিয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সাথে, যাতে করে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সেই ডাকে সাড়া দিতে পারে, সতিকার অর্থে যা তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে, পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে, যদিও শত্রুপক্ষের সংখ্যা ও সরঞ্জামের শক্তি হিসাব করে তারা দেখতে পাচ্ছে যেন সাক্ষাত মৃত্যু এগিয়ে আসছে এবং অবিলম্বেই তারা সবাই নিহত হয়ে যাবে। এ প্রসংগে তাদেরকে আরো স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা একটু চিন্তা করে দেখুক, কাফেরদের তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিলো কতো নগণ্য, কতো দুর্বল তারা। প্রতিনিয়ত ভয় করতো যে, তাদেরকে মানুষ চিলের মতো ছোঁ মেরে উচকে নিয়ে যাবে। কিন্তু তারপর তিনি তাদেরকে আশ্রয় দান করলেন এবং তাদেরকে তাঁর নিজের সাহায্য দ্বারা মযবুত করে দিলেন। তিনি আরও চাচ্ছেন যে, তারা এমনভাবে প্রস্তুত হয়ে যাক যেন তাদের অন্তর ও ব্যবহারের মধ্যে গড়ে ওঠে স্পষ্টভাবে পার্থক্য নির্ণয়কারী এক শক্তিশালী মানদন্ড। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন তারা একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে চলবে। এই ভয় করে চলার উদ্দেশ্য হবে অন্যায় অবিচার যুলুম-নির্যাতনকে মুছে দেয়া এবং মানুষকে ক্ষমা করা। আর তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার সেই মেহেরবানী, যার অভাবে তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং সাফল্য ছাড়াও পার্থিব (বস্তুগত) স্বার্থের দিকে ঝুঁকে পড়ে দুর্বল হয়ে যাবে।

গনীমত সম্পর্কে মৌলিক নীতিমালা

এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে আনফাল সম্পর্কে। বলো, এর নিরংকুশ মালিক আল্লাহ ও তাঁর রসূল......................................তারাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে সঠিক মোমেন– তাদের জন্যে তাদের পরওয়ারদেগারের কাছে, বহু মর্যাদা রয়েছে, রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রেযেক। (১-৪ আয়াত)

এ সূরাটির শানে নুযুল বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীস শরীফে যে রেওয়ায়াতগুলো আমরা ইতিমধ্যে পেশ করেছি, বিশেষ করে উপরোক্ত এই আয়াতটি সম্পর্কে যে কথাগুলো হাদীসে এসেছে, তার সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনা আমরা এখানে দিতে চাই। আশা করা যায় এ প্রসংগে উল্লেখ্য হাদীসটি তখনকার পরিবেশটা বুঝতে আমাদেরকে অনেকাংশে সাহায্য করবে, যখন গোটা সূরাটা একই সময়ে নাযেল হয়েছিলো। বিশেষ করে এই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত আয়াতটিকে গনীমত-এর মাল এবং যুদ্ধে বিজয়ের অতিরিক্ত আরও কিছু ফায়দার ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে এবং মদীনাকেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে ওঠার পর এই বড় ঘটনার মধ্য দিয়ে মুসলিম জামায়াতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেহারা ফুটে উঠেছিলো।

ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে– আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে জারীর ও ইবনে মারদাবিয়াহ প্রমুখ বর্ণনাকারীদের বরাত দিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি হাদীস উদ্ধৃত

করেছেন (হাদীসের মূল ভাবকে ঠিক রেখে ইবনে কাসীর নিজের ভাষায় তার মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন)। বলা হয়েছে, যখন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো, তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'যে ব্যক্তি এইভাবে এইভাবে কাজ করবে, তার প্রতিদানে সে এই এই জিনিস পাবে।' এরপর মুসলিম দলের মধ্য থেকে যুবকরা শত্রুর মোকাবেলায় পাল্লা দিয়ে এগিয়ে গেলো এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করলো। এ সময় বৃদ্ধ সাহাবারা পতাকার নীচে অপেক্ষমাণ রয়ে গেলেন। তারপর গনীমতের মাল যখন এসে গেলো, তখন ওই যুবকবৃন্দ এসে সেই গনীমতের মাল দাবী করলো, যা তাদের শ্রমের বিনিময়ে এসেছে বলে তারা মনে করছিলো। এতে বৃদ্ধ মুরব্বীরা বললেন, দেখো, 'আমাদের ওপর তোমরা প্রাধান্য দেখিয়ো না, আমরা তো তোমাদের পেছনে সাহায্যকারী হিসাবে ছিলাম, তোমাদের (সংখ্যা-স্বল্পতা ও যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অপ্রতুলতার) কথা যদি শত্রুদের কাছে খুলে যেতো এবং তাদের আঘাতে জর্জরিত হয়ে যদি তোমরা সাহসহারা হয়ে যেতে, তাহলে তো তোমরা আমাদের কাছেই ফিরে আসতে। এইভাবে তাদের মধ্যে যখন বেশ কিছুক্ষণ ধরে বচসা চলতে থাকলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে ফয়সালা করতে গিয়ে নাযিল করলেন, 'ওরা তোমাকে মালে গনীমতের কথা জিজ্ঞাসা করছে। বলে দাও, এ মাল আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নয়, ... আয়াতের শেষ কথাগুলো হচ্ছে ..... ' (দ্বিধাহীন চিত্তে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে মোমেন হয়ে থাকো।'

সওরী ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, বদরের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (স.) বলেছিলেন, 'যে কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে শত্রুপক্ষের কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার জন্যে রয়েছে এই এই প্রতিদান, আর যে কোনো বন্দীকে গ্রেফতার করে আনবে, তার জন্যে রয়েছে এই এই প্রতিদান।' তারপর আবুল বাছীর দু'জন বন্দীকে ধরে নিয়ে এলেন এবং রসূলুল্লাহ (স.)-কে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের কাছে কিছু ওয়াদা করেছিলেন। এ সময়ে সা'দ ইবনে ওবাদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি যদি ওদেরকে এই বস্তুগুলো সব দিয়ে দেন, তাহলে আপনার অন্যান্য সাহাবার জন্যে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। প্রতিদান সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা অথবা শত্রুর ভয়ই যে আমাদেরকে বাস্তব যুদ্ধে নামতে বাধা দিয়েছে তা কিছুতেই নয়; আমরাও তোমাদের হেফাযতের জন্যেই পেছনে রয়ে গিয়েছিলাম, যাতে শত্রু পেছন থেকে হামলা করতে না পারে। এসব নিয়ে তাদের মধ্যে বেশ একটু বিতর্কের সৃষ্টি হলো এবং তখনই কোরআন নাযিল হলো,

'তোমরা জেনে নাও, তোমরা যা কিছু গনীমতের মাল হাসিল করেছো, তার মধ্যে আল্লাহর অংশ হচ্ছে এক-পঞ্চমাংশ .... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।'

ইমাম আহমদ রেওয়ায়াত করতে গিয়ে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বলেছেন, যখন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং আমার ভাই ওমায়র নিহত হলো, তখন আমি সাঈদ ইবনুল আসকে হত্যা করলাম এবং তার তরবারিটি আমি নিয়ে নিলাম। এই ব্যক্তিটাকে ভীষণ পরাক্রমশালী যোদ্ধা ও অজেয় বলে মনে করা হতো। আমি তার লাশটা রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে নিয়ে এলে তিনি বললেন, এটাকে নিয়ে যাও আর সংকীর্ণ কোনো এক গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দাও। সা'দ বলছেন, 'আমি তখন ফিরে গেলাম, আর তখন ভাইয়ের মৃত্যুর শোকে এবং গনীমতের মালের মধ্য থেকে আমার প্রাপ্য হিসসা অন্যরা নিয়ে নেয়ার কারণে আমার অন্তরের মধ্যে যে কি অবস্থা হয়ে যাচ্ছিলো তা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না।'

এরপর সা'দ বলছেন, 'আমি অল্প একটু অগ্রসর হতেই সূরায়ে আনফাল নাযিল হলো। তখন রসূলুল্লাহ (স.) আমাকে ডেকে বললেন, 'যাও, তোমার হারানো জিনিস নিয়ে নাও।'

ইমাম আহমদ আরো বলেছেন, সা'দ ইবনে মালেকের মাধ্যমে আর একটা হাদীস জানা গেছে। সা'দ বলছেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, অবশ্যই আজকে আল্লাহ তায়ালা আমাকে মোশরেকদের থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এখন মেহেরবানী করে আমাকে এই তরবারিখানা দান করুন। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'এ তরবারি তোমারও নয়, আমারও নয়, তুমি এটা রেখে দাও।' তখন আমি ওটা রেখে দিলাম ও ফিরে এলাম। তারপর আমি (মনে মনে) বললাম, 'হায়! যদি তরবারিটা এমন কাউকে দেয়া হয়, যে আমার মতো বিপদে পড়েনি এবং আমার মতো পরীক্ষার সম্মুখীনও হয়নি!' পরে তিনি বলেছেন, আমি দেখলাম,এক ব্যক্তি পেছন থেকে আমাকে ডাকছে, (তিনি বলছেন) আমি বললাম, 'কি, আল্লাহ তায়ালা আমার ব্যাপারে কিছু নাযিল করেছেন?' সে লোকটা বললো, তুমি এ তরবারিটা চেয়েছিলে না? এটা আমার নয়, আমাকে তিনি (নবী স.) দান করেছিলেন, এখন এটা তোমার।' রেওয়ায়াতকারী উক্ত সাহাবী বলছেন, তারপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতটা নাযিল করলেন,

'ওরা তোমাকে আনফাল– মালে গনীমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, বলে দাও, 'আনফাল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের।'

আবু দাউদ, তিরমিযী এবং নাসাঈ বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে আবু বকর ইবনে আয়্যাশ থেকে এ হাদীসটি পেয়েছেন। তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও বিশুদ্ধ।

উপরোক্ত হাদীসগুলোর আলোকে জানা যায় কোন পরিবেশে সূরা আনফালের এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিলো। মানুষ হতভম্ব হয়ে যেন বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবাদেরকে গনীমতের মাল সম্পর্কে বচসা করার ছবিটা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে। তারা কি দ্বীনের খাতিরে দেশ ত্যাগকারী সেই প্রথম স্তরের সাহাবা নন, যারা সব কিছু পেছনে ছেড়ে এসে তাদের আকীদাকে হেফাযতের জন্যে হিজরত করে চলে এসেছিলেন এবং এ দুনিয়ার লোভনীয় কোনো কিছুর দিকে ফিরেও তাকাননি। পাশাপাশি আনসারদের কথাও একবার চিন্তা করা যাক। তারা মোহাজেরদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাদের ঘর দুয়ার ও সম্পদের অংশীদার বানিয়ে নিয়েছেন। তারা দুনিয়ার কোনো স্বার্থ ত্যাগ করার ব্যাপারে কোনো প্রকার কার্পণ্য করেননি, অথবা আরো গভীরভাবে আশ্চর্য হতে হয় তখন, যখন তাদের সম্পর্কে তারীফ করে তাদের পরওয়ারদেগারের আয়াত নাযিল হতে দেখা যায়, 'তারা খুবই মহব্বত করে ওইসব ব্যক্তিকে, যারা তাদের কাছে চলে এসেছে হিজরত করে আত্মীয় পরিবার পরিজন, সম্পদ সম্পত্তি সব কিছু হারিয়ে যারা তাদের আশ্রয়ে এসেছে আর যে সব জিনিস তাদেরকে ওরা দিয়ে দিয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে তাদের মনের মধ্যে আর কোনো আকর্ষণ তারা রাখে না এবং এরপর তারা তাদের ওই ভাইদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয় তাদের নিজেদের ক্ষুধা রয়েছে তাদের নিজেদের খাদ্য খাবারের সংকট থাকা সত্তেও তারা মোহাজের ভাইদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়..... কিন্তু এসব রেওয়ায়াতকে সামনে রেখে যখন আমরা বাহ্যিক অবস্থা দৃষ্টে চিন্তা করি, তখন হয়রান হয়ে যাই ....অবশ্যই যুদ্ধ উপলক্ষে প্রাপ্ত মালের ব্যাপারে মোমেনরা সাময়িকভাবে এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু এই কঠিন পরীক্ষা উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশের জন্যে রসূলের সামনে এক মোক্ষম সুযোগ করে দিলেন। তখনকার দিনে আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে এবং খোদ আল্লাহর নিকট থেকেও 'গুড সার্টিফিকেট' পাওয়ার জন্যে মোমেনরা বড়ই লালায়িত ছিলেন। তাই দেখা যায়, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রথম সুযোগে তারা মোশরেকদের থেকে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দিলেন। আর এই সুযোগেই দেখা যায়, আল্লাহ তায়ালা পরওয়ারদেগার লোভরূপী মানুষের সহজাত প্রকৃতিকে দাবিয়ে দিয়েছেন এবং অন্য একটি প্রশ্ন তুলে তাদের লোভকে আল্লাহ তায়ালা নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন। যারা 'আনফাল' সম্পর্কে বাক বিতন্ডায় লিপ্ত

হয়ে পড়েছিলো মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর নিজের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর দিকেই তাদের মনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর মহব্বতের লেন দেনের ক্ষেত্রে জেগে উঠবে তাদের মধ্যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সহনশীলতা এবং তাদের সুস্থ বুদ্ধি, যার ফলে তাদের অন্তরের মধ্যে এক অভূতপূর্ব মানসিকতা এসে যাবে। তাই দেখা যায় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যখন আল্লাহর বাণী এসে গেলো, তখন তাদের অবস্থা অগ্নিকুন্ড থেকে গুলিস্তানে (ফুল বাগিচায়) পরিণত হয়ে গেলো। বিবদমান সাহাবারা আল্লাহর কথায় এই মাধুর্য অনুভব করলেন, যা উবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর কথায় ফুটে উঠেছে, 'আমাদের মধ্যে কয়েকজন বদরী সাহাবা অবস্থান করছিলেন এমন সময় মালে গনীমত (যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রাপ্ত শত্রু পরিত্যক্ত সম্পদ) বিলি বন্টনের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কিছু মতভেদের সৃষ্টি হলো। মতভেদটা একটু তিক্ততার দিকেই মোড় নিলো। তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতের মাধ্যমে নিজেই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলেন এবং বিষয়টাকে তাদের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাতে দিয়ে দিলেন।

অবশ্যই এইভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদেরকে বাস্তব ট্রেনিং দিলেন। এ পবিত্র ট্রেনিং ছিলো স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে। এমনকি অবশেষে আল্লাহ তায়ালা গনীমতের বিলি বন্টন সম্পর্কে তাঁর সাধারণ নির্দেশ নাযেল করলেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা বিষয়টাকে সরাসরি রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাতে ন্যস্ত করে কার হক কতোটুকু তা জানিয়ে দিলেন এবং রসূলুল্লাহ ও আল্লাহর ইচ্ছামতো বন্টন করে দেয়ায় সাহাবারা সবাই তা মেনে নিলেন এবং এইভাবে বেশ জটিল এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। প্রশিক্ষণমূলক এই আইনের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে এ দীর্ঘসূত্রী বিষয়টার সুষ্ঠু নিষ্পত্তি হয়ে গেলো যে আয়াত দ্বারা, তা হচ্ছে,

'ওরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করছে 'আনফাল' সম্পর্কে। বলো, 'আনফাল' আল্লাহ ও তাঁর রসূলের, অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের বিবাদপূর্ণ বিষয়াদি মীমাংসা করে ফেলো, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, যদি প্রকৃতপক্ষে তোমরা মোমেন হয়ে থাকো।'

যারা 'আনফাল'-এর বিলি বন্টন বিষয়ে চেঁচামেচি করছিলো, তারা আল্লাহভীতি থেকে মুক্ত হয়ে ঝগড়া করছিলো তা নয়, বরং আল্লাহর ভয় মনের মধ্যে রেখেই তারা ন্যায় অন্যায় বাছ বিচার করার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলো। অবশ্যই পাক পরওয়ারদেগার তাদের অন্তরের গোপন খবর রাখেন। তিনি দুনিয়ার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে তাদেরকে অলীক কোনো ফয়সালার দিকে ঠেলে দিতে চান না এবং এসব বিষয়ে সাধারণত যে সব মতভেদ সৃষ্টি হয় তাকেও তিনি উপেক্ষা করেন না। যদিও এসব বিবাদ মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে কিছু সুন্দর পরীক্ষারও সৃষ্টি করে। এ পরীক্ষায় মোমেনদের চেতনা, বুঝ শক্তি ও তীব্র অনুভূতি সবই একত্রিত হয়ে যায় এবং তারা আল্লাহর ভয়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এইভাবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণকামী হয়। আর যেসব অন্তরে নেই আল্লাহর কোনো ভয় ভীতি, যারা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় না, পরওয়া করে না যারা আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের এবং যারা পেতে চায় না আল্লাহর সন্তুষ্টি, তারা দুনিয়ার স্বার্থের আকর্ষণের চাপকে সহ্য করতে পারে না এবং তাদের বিবেক-বুদ্ধিকেও সঠিকভাবে তারা পরিচালনা করতে পারে না।

নিশ্চয়ই তাকওয়া পরহেযগারী বা আল্লাহর ভয়ের ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে গিয়েই ন্যায় অন্যায় বাছ বিচার করে চলার খেয়াল এমন এক লাগাম, যা যে কোনো অস্থির ঘোড়াকেও সুখে দুঃখে, সংকট সমস্যায় এবং লোভ লালসার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে। আর এই লাগাম দিয়েই আল কোরআন এসব অন্তরকে সংশোধনী গ্রহণ করতে রাযী করায়। তাই তাকওয়ার সেই চাবুককে শানিত করার জন্যে নির্দেশ দিতে গিয়ে তিনি বলছেন,

'অতএব, ভয় কর তোমরা আল্লাহকে ও তোমাদের মধ্যে গজিয়ে উঠা সর্বপ্রকার বিপদের মীমাংসা করে ফেলো।'

আর এই লাগাম দ্বারাই মোমেন দলকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর গোলামী ও রসূলের আনুগত্য করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন,

'আনুগত্য করো আল্লাহর এবং তাঁর রসূলের।'

এখানে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশে প্রথম যে জিনিসটা পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে, 'আনফাল' বিলি বন্টনে আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেয়া। অর্থাৎ প্রথম যুদ্ধের পর বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে যে সংকট দেখা দিলো, তারপরই এখানে আসা এ নির্দেশ থেকে জানা গেলো যে, মোমেনদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সবকিছুর ওপর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মালিকানা স্বীকার করা। অতপর এক পঞ্চমাংশ বের করে দিয়ে যা থাকবে, রসূলুল্লাহ (স.)-কেই তা মুসলমানদের মধ্যে বিলি বন্টন করার জন্যে দায়িত্ব দেয়া হলো। কোন নিয়মে তিনি বন্টন করবেন, কতোটুকু কাকে দেবেন, তা ফয়সালা করার পূর্ণ এখতেয়ার তাঁকে দেয়া হলো। যারা নিজেদেরকে মোমেন বলে ঘোষণা দিয়েছে, তাদের জন্যে আল্লাহর হুকুমেই রসূলের ফয়সালা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়ার জন্যে নির্দেশ দেয়া হলো। যেহেতু মানুষ রসূল তাঁর সংগীদের মধ্যেই বসবাস করেন এবং তাদের সকল ব্যথার ভাগী হয়ে ভালো করেই জানেন কাকে কতোটা দিতে হবে। তাঁর এই ফয়সালা মেনে নেয়ার ভিত্তিতেই তাদের অন্তরের পবিত্রতা প্রকাশ পাবে, তাদের পারস্পরিক বিষয়াদির মীমাংসা হবে এবং তারা একে অপরের অন্তরকে পরিষ্কার করতে পারবে। তাই বলা হয়েছে, (এ ফয়সালা তোমরা সহজেই মানতে পারবে)

'যদি প্রকৃতপক্ষে তোমরা মোমেন হয়ে থাকো।'

সুতরাং মোমেনদের জন্যে জরুরী হচ্ছে তাদেরকে কাজের মাধ্যমেই ঈমানের বাস্তব প্রমাণ দিতে হবে। এই ভাবেই তাদের ঈমানের উজ্জ্বলতা প্রকাশিত হবে, তাদের অন্তরের মধ্যে বিরাজমান ঈমানের কথা টের পাওয়া যাবে এবং এই অবিসংবাদিত আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের ঈমান বাস্তবে মূর্ত হয়ে উঠবে। যেমন রসূল (স.) বলেছেন, 'ঈমান কোন আকাংখা পোষণ করার নাম নয়, এটা দেখানোর বস্তুও নয়, বরং এটা হচ্ছে, অন্তর যা স্বীকার করে নিয়েছে, বাস্তব কাজ তার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে।'(১)

আল কোরআনের মধ্যে এই কথার সম অর্থবোধক আরও অনেক কথা পাওয়া যায়, যা রসূল (স.)-এর কথাকে সত্যায়িত করে এসেছে অনেক আয়াত ঈমানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এবং ঈমানকে শানিত করার উদ্দেশ্যে। আরও জানানো হয়েছে, যে ব্যক্তি ঈমানের কথা মুখে স্বীকার করবে এবং আকাংখা জানাবে; কিন্তু বাস্তব কাজের মাধ্যমে তার প্রমাণ দেবে না, তার ঈমান গ্রহণই করা হবে না।

মোমেনের মৌলিক গুণাবলী

এরপর জানানো হচ্ছে ঈমানের গুণাবলী সম্পর্কে। এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'হক' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে এবং এই 'হক' প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে এ 'দ্বীন'-এর মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এরশাদ হচ্ছে,

'অবশ্য অবশ্যই মোমেন তারা, যাদের সামনে আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর (তাঁর ভয়ে) কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং ....তাদের জন্যে রয়েছে বহু মর্যাদা তাদের প্রতিপালকের মাওলার কাছে। আরও আছে তাদের জন্যে ক্ষমা ও সম্মানজনক প্রতিদান।'

---

(১) দায়লামী মাসনাদুল ফিরদৌস কেতাবে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

অবশ্যই আল কোরআনের বর্ণনাভংগি এবং শব্দ বিন্যাসের পদ্ধতি বড়ই সূক্ষ্ম। এখানে বর্ণিত বিষয়গুলোর ব্যাপকতার কারণে বর্ণনাভংগির মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে গভীরতা। এখানে মূল আয়াতের মধ্যে দেখা যায় অত্যন্ত ছোট্ট একটি শব্দ 'ইন্নামা'। এখানে এ শব্দটি ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই। শব্দটির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম চিহ্ন আছে, যার দ্বারা মনে হয়, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিপূর্ণ ঈমান। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যদি শুধু এতোটুকুই বলতে চাইতেন, তাহলে এতটুকু বলেই থেমে যেতেন। কিন্তু এখানে তিনি থামেননি, যার কারণে বোঝা যাচ্ছে, অবশ্যই এটা এমন একটা মযবুত ব্যাখ্যা, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম অন্য কোনো বিষয়ের দিকে ইংগিত করে। অবশ্যই ওইসব ব্যক্তির গুণাবলী ও কার্যাবলী এবং আচার-আচরণ এমন সুন্দর বলেই তাদেরকে মোমেন বলে চেনা যায়। এসব গুণ যাদের মধ্যে নেই, তাদেরকে সাধারণভাবে মোমেন মনে করা যায় না। আর আরও দেখা যায় আলোচ্য আয়াতের শেষাংশের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ওরাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মোমেন'। একথা বলে এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে যারা মোমেন নয়– তারা আদৌ ঈমানদারই নয়। আর কোরআনে কারীমের আয়াত একটা অন্যটার ব্যাখ্যা দান করে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, সত্যকে পার্শ্বে রেখে বা সত্যকে বাদ দিয়ে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে থাকে পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহী। অর্থাৎ যা কিছু সত্য নয়, সেইটাইতো গোমরাহী। এর পরিবর্তে এ কথা বলা যায় না যে, সঠিক অর্থে যারা মোমেন নয়, তারা অবশ্যই অপূর্ণাংগ ঈমানদার। আর আল-কোরআনের স্বাধীন ব্যাখ্যা দান করা কারো জন্যে জায়েয নয়, যেমন করে কেউ কেউ খামখেয়ালীভাবে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে থাকে।

এ জন্যেই পূর্ববর্তীগণ এই আয়াতের অর্থ এভাবে বুঝতেন যে, যার নিজের শরীর ও কাজের মধ্যে এসব গুণাবলী থাকবে না, সে কখনো ঈমানের স্বাদ পাবে না এবং মূলত সে মোমেনই নয়......। ইবনে কাসীরের তাফসীরের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, আবু তালহা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে 'অবশ্য অবশ্যই তারা মোমেন, যাদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতগুলো তেলাওয়াত করা হয়, তখন আল্লাহর ভয়ে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।' এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে তিনি বলেন, এরা হচ্ছে মোনাফেক। এরা যখন বিভিন্ন ফরয এবাদাত আদায় করে, তখন তাদের অন্তরে আল্লাহর কোনো স্মরণ প্রবেশ করে না এবং তারা সত্যিকারে আল্লাহর আয়াতসমূহকে বিশ্বাসও করে না। আর তাঁর ওপর কোনো তাওয়াক্কুলও করে না। আর একবার যদি তারা মানুষের (দৃষ্টির) আড়ালে চলে যেতে পারে, তখন কিছুতেই আর ফিরে আসে না–তারা তাদের মালের যাকাতও আদায় করে না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে ঘোষণা দিলেন যে, তারা মোমেন নয়। তারপর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন,

'অবশ্য অবশ্যই মোমেন তারা, যাদের কাছে আল্লাহর স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।'

এরা যাবতীয় ফরয কাজ পালন করে ......

'আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতগুলো তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের পরওয়ারদেগারের ওপর ভরসা করতে থাকে।'

অর্থাৎ সত্যের প্রতি তাদের সাক্ষ্য দান করা বেড়ে যায় এবং তাদের রবের প্রতি তাদের তাওয়াক্কুল বেড়ে যায়। অর্থাৎ তারা অন্য কারো কাছে কিছুই আশা করে না।

আমরা এই গুণাবলীর মধ্যে খেয়াল করলে দেখতে পাবো এগুলো বাদে আসলে ঈমান থাকতেই পারে না। এখানে বিষয়টা পূর্ণাংগ বা আংশিক ঈমানের নয়, বরং মূল প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের ওই আচরণে আদৌ ঈমান থাকে কিনা। তাই বলা হচ্ছে,

'অবশ্য অবশ্যই মোমেন তারা, যাদের কাছে আল্লাহর স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।'

এ হচ্ছে অন্তরের এক বিশেষ আবেগের ব্যাপার, যার কারণে কোনো নির্দেশ পালন বা কোনো নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করার সময় আল্লাহর যে স্মরণ তার হৃদয়ে জাগে তাতে সে কেঁপে ওঠে। এ সময় আল্লাহর মহান মর্যাদাবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তার মধ্যে তাঁর ভয় বদ্ধমূল হয়ে যায়। আর আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁরই ভয় তার সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে। এ ভয় আসে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গোনাহের কথা স্মরণ হওয়ার কারণে, অতপর সে ভালো কাজের দিকে এগিয়ে যায় এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য করার দিকে ঝুঁকে পড়ে...... অথবা, যেমন হযরত দারদা (রা.)-এর মা বলেছিলেন, অন্তরের ভয় হচ্ছে কোনো আঘাতের যন্ত্রণার মতোই এক ভয়ানক যন্ত্রণা, যা তাকে ভীষণভাবে কি কাঁপিয়ে তুলবে না? জওয়াবে কোনো এক ব্যক্তি বলে উঠলো, অবশ্যই। তিনি তখন বললেন, 'এই ভয় ও তার ফলে প্রচন্ড এক কাঁপুনি যখন তুমি তোমার অন্তরের মধ্যে অনুভব করবে, তখনই তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে শুরু করে দিয়ো। এই দোয়াই তোমার কাঁপকাঁপানিকে দূর করে দেবে।'

এটা একটা বিশেষ অবস্থা, যা অন্তরকে দোয়া করতে উদ্বুদ্ধ করে। এতে সে শান্তি পায় এবং তার মধ্যে ধৈর্য স্থৈর্য আসে! এ হচ্ছে এমন একটা অবস্থা, যা যে কোনো মোমেন হৃদয়ই সঠিকভাবে অনুভব করে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন করে ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে। সে পরামর্শ করে অথবা আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আল্লাহর ভয়েই সে নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে বিরত হয়ে যায়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রব-এর ওপর ভরসা করতে থাকে।'

এই ভয় মোমেনের হৃদয়ের মধ্যে ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং পরিশেষে এনে দেয় পরম পরিতৃপ্তি। অবশ্যই এই কোরআন কোনো মাধ্যম ছাড়াই মানুষের হৃদয়ের সাথে যোগ দেয় এবং তখন তার ও তার রবের মধ্যে 'কুফরী' ছাড়া অন্য কোনো বাধা থাকে না। আর এই কুফরী মানব হৃদয়কে সত্য গ্রহণ করা থেকে বাধা দেয়। তারপর যখন ঈমান আনার কারণে মনের পর্দা উঠে যায়, তখন সে পবিত্র আত্মা কোরআনের স্বাদ লাভ করে এবং তখনই বারবার আসা আয়াতগুলো ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দেয়, যা পরিশেষে তাকে নিশ্চিন্ততার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। (২) এর দ্বারা বোঝা যায় বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে মোমেনদের ঈমান বাড়ে। সুতরাং এটা মানতেই হবে, একমাত্র মোমেন দিলই বুঝতে পারে কোন কোন ঘটনার কারণে ঈমান বৃদ্ধি পায়। এই জন্যেই আল কোরআনের বিভিন্ন প্রসংগে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন, 'অবশ্যই এর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে মোমেনদের জন্যে।' আরও বলা হয়েছে, ঈমান এনেছে যারা সেইসব জনপদের জন্যে ওইসব জিনিসের মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, কোরআন আসার পূর্বে ঈমানের কিছু কিছু অস্তিত্ব ছিলো।

আর এই ঈমানের কারণেই তারা মহা পবিত্র এই কোরআন থেকে বিশেষ স্বাদ লাভ করেন। এই ঈমানের বদৌলতেই সেই সকল পরিবেশ তাদেরকে সাহায্য করে যেখানেই তারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। তারা কাজে, কথায়, চিন্তায়, ব্যবহারে কোরআনকে ব্যবহার করে, জীবনের কোনো বিষয়েই তারা নিজেদের বুদ্ধি মতো চিন্তা ভাবনা করে না। এ আয়াতটা নাযিল হওয়া সম্পর্কে যে সব বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে সা'দ ইবনে মালেকের একটা কথা জানা যায়।

(২) 'ঈমান কিভাবে কমে এবং বাড়ে' এ প্রশ্নে জ্ঞান-গবেষণাকারীদের মধ্যে বেশ কিছু মতভেদ আছে। এসব বিতর্কিত বিষয় নিয়ে এখানে আমরা অযথা মাথা ঘামাতে চাই না!

গনীমতের মাল বিলি সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ (স.) যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্য থেকে একটা তরবারি বিতরণ করতে চাইলেন। কিন্তু বললেন, তরবারিটা তোমারও নয়, আমারও নয়– ওটা রেখে দাও। তারপর সা'দ তরবারিটা রেখে দিলেন এবং নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। এরপর যখন পেছন থেকে তাকে ডাকা হলো, তখন প্রতি মুহূর্তেই তিনি আশা করতে লাগলেন– এ বিষয়ে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কোনো আয়াত নাযিল করবেন। তিনি বলছেন, 'আমি বললাম, আমার ব্যাপারেই কি কিছু নাযেল হলো?' রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, তুমি আমার কাছে তরবারিটা চেয়েছিলে না, ওটাতো আমার ছিলো না (এ জন্যে তোমাকে আমি দিতে পারিনি), এখন তিনি (আল্লাহ) আমাকে এটা দিয়েছেন, অতএব, এটা এখন তোমার .... এইভাবে তারা তাদের রবের সাথেই বাস করে, বাস করে এই কোরআনের সাথে, যা তাদের ওপর নাযিল হয় এবং এ হচ্ছে মানবীয় বুদ্ধির অগম্য এক মহা মূল্যবান বস্তু। আল কোরআনের অবতরণকাল এবং তার সংস্পর্শে বাস করতে পারাটা মানব জীবনের জন্যে এক মহা সৌভাগ্য এবং মহা বিস্ময়কর এক সুযোগ। এই সময়েই সাহাবায়ে কেরাম এই অপূর্ব স্বাদ গ্রহণ করতে থেকেছেন, যেহেতু কোরআনের সরাসরি পরিচালনায় ও ব্যাখ্যার আলোকে জীবন যাপন করতে পারাটা ছিলো তাদের জন্যে বহুগুণে কোরআনের মজা পাওয়া এক বিরাট সুযোগ। আর প্রথম এই সুযোগটা মানব জীবনে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। দ্বিতীয় পর্যায়ের সুযোগ দুনিয়ায় তখনই আসবে, যখন একদল মোমেন একতাবদ্ধ হয়ে এই দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হয়ে আন্দোলন শুরু করবে এবং বাস্তব জীবনে মানুষের সুখ দুঃখের সাথে একাকার হয়ে যাবে ও তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যে অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করবে। আন্দোলনকারী এই সকল মোমেন যখন এ মহান দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যে আল কোরআনকে নিয়েই আন্দোলন চালিয়ে যাবে, তখনই তারা এ মহাগ্রন্থের স্বাদ পাবে, আর যতোবারই এ পাক কালাম তেলাওয়াত করবে এ পাক কালাম থেকে নতুন নতুন স্বাদ পেতে থাকবে। কারণ, মোমেন হওয়ার শুরুতেই যে দ্বীনকে তারা গ্রহণ করেছিলো, তার উদ্দেশ্য তারা দেখতে পেয়েছে! মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বকে খতম করে এবং জাহেলী যুগের অহংকারী মানুষের দর্প চূর্ণ করে কোরআনের আইন চালু করার মাধ্যমে আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহরই প্রভুত্ব কায়েমের আন্দোলন। সারা দুনিয়ায় যখন জাহেলিয়াত তার দিগন্তপ্রসারী জাল বিস্তার করে রেখেছিলো, তখন ঈমান শুধুমাত্র কোনো আকাংখার বস্তুই ছিলো না, বরং এ ছিলো অন্তর প্রাণ দিয়ে এ আদর্শকে গ্রহণ এবং বাস্তব কাজের মাধ্যমে এ গ্রহণের বাস্তব প্রমাণ দান করার নাম।

প্রতিকূল ওই সময়ের সকল অবস্থার মোকাবেলা তারা করেছে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর তারা তাদের রবের ওপর ভরসা করে।'

হ্যাঁ, একমাত্র তাঁরই ওপর তারা ভরসা করে, আর কারও ওপর নয়- এ কথাটাই উপরের বাক্যাংশে বলা হয়েছে। তারা শরীক করে না তাঁর সাথে অন্য কাউকে। একমাত্র তাঁরই কাছে ওরা সাহায্য চায় এবং তাঁর ওপরই ভরসা করে। অথবা ইবনে কাসীরের ভাষায় বলতে গেলে, যা তিনি তাঁর তাফসীরে ব্যক্ত করেছেন, অর্থাৎ, তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে তারা কিছু আশা করে না এবং তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছুই চায় না, তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে তারা আশ্রয়ও চায় না। তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কারো কাছে কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্যে আবেদনও করে না। তাঁর দিকে ছাড়া অন্য কারও দিকে ঝুঁকেও পড়ে না। আর তারা বিশ্বাস করে, তিনি যা করেন তাই হয়, আর তিনি না চাইলে কিছুই হয় না। তাঁর রাজ্যে ক্ষমতা ব্যবহারের এখতিয়ার শুধু তাঁরই রয়েছে, এ ব্যাপারে অন্য কারো কোনোই অংশ নেই, আর তাঁর হুকুমের

ব্যাপারে কৈফিয়ত চাওয়ার মতো কেউ নেই এবং তারা বিশ্বাস করে যে, অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তিনি হিসাব গ্রহণকারী। আর এই কারণেই সাঈদ ইবনে জোবায়র বলেছেন, 'আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলই ঈমানকে সুসংহত করার উপায়।'

এটা হচ্ছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ওপর গভীর বিশ্বাসের পরিচায়ক এবং চূড়ান্ত ও একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী একমাত্র তিনি, আর কেউ নয়। একই অন্তরের মধ্যে দ্বিধাহীন চিত্তে ও নিরংকুশভাবে আনুগত্যবোধ একজন ছাড়া দুইজনের জন্যে হতে পারে না। একক শক্তি একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা এবং অন্য কারো ওপর ভরসা কখনো একত্রিত হতে পারে না। আর যাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর ভরসা গড়ে ওঠে অথবা অন্য কোনো উপায়ের দিকে মন ঝুঁকে পড়ে, সে অবস্থায় তাদের জন্যে পহেলা কাজ হচ্ছে নিজেদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ওপর ঈমানের অবস্থাটা যাচাই করে দেখা।

তবে এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করার অর্থ এ নয় যে, কোনো উপায় উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না। মোমেন আল্লাহর ওপর ঈমানের দরজা দিয়ে নানা প্রকার উপায় উপকরণের দিকে এগিয়ে যাবে এবং তিনি যে সব নির্দেশ দিয়েছেন সে সব পালন করার জন্যে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করবে। কিন্তু ওইসব উপায় উপকরণের মাধ্যমেই ফল পাওয়া যাবে মনে করে সেগুলোর ওপর ভরসা করা নয়। যিনি যাবতীয় উপায় উপকরণ সৃষ্টিকারী একমাত্র তিনিই পূর্ণাংগ পরিণতিতে পৌঁছে দেয়ার মালিক এটাই হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা। অবশ্যই একজন মোমেনের চেতনার মধ্যে কোনো কাজের ফলের সাথে উপায় উপকরণের কোনো সংযোগ নেই। অর্থাৎ, বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করলেই যে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাবে– এটা কোনো মোমেন বিশ্বাস করে না। কার্য সম্পাদনের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং কোনো কিছুকে বাঞ্ছিত পরিণতিতে একমাত্র তিনিই পৌঁছে দেন– এ বিশ্বাস নিয়েই প্রত্যেক মোমেন ব্যক্তি মনে করে যে, উপায়-উপাদান গ্রহণ করা কর্তব্য এবং তা করতেও হবে– কিছুতেই তার মনে এ কথা স্থান পায় না যে, অমুক ব্যক্তি বা অমুক ওসীলা ধরলেই তার কাজটা উদ্ধার হয়ে যাবে। আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে এবং তাঁরই হুকুমে নানা উপায় অবলম্বন প্রয়োজন, আর পরিণতিতে পৌঁছানো সেটা আল্লাহরই একমাত্র অধিকার। তিনি কোনো উপায় ছাড়াই গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার মালিক– তিনি যা চান তাই করেন, করতে পারেন। অন্য কেউ যা ইচ্ছা তা করতে পারে না। এ দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই একজন মোমেন উপায় উপকরণের দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। আর এভাবেই আল্লাহর ওপর সে পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে। সাধ্যানুযায়ী সে চেষ্টা করবে এবং উপায় উপাদানকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য দানের বিনিময় লাভ করবে।

এ কালের বৈজ্ঞানিক জাহেলিয়াত

আধুনিক যুগের যে বৈজ্ঞানিক জাহেলিয়াত গজিয়ে উঠেছে, তার নাম দেয়া হয়েছে প্রাকৃতিক আইন। এরা তাকদীরকে ও আমাদের চোখের অন্তরালে যে আর একটা জগত আছে– এসব বিশ্বাসকে অস্বীকার করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত এরা বলে যে, সব কিছু নিজে নিজেই সংঘটিত হয়ে চলেছে, নেই এর পেছনে কোনো নিয়ন্তার হাত। এরা যে এ গোটা বিশ্ব ও আল্লাহর সুপরিকল্পিত সৃষ্টি– এসব কথা অস্বীকার করতে গিয়ে বলে– এসব হঠাৎ করে প্রাকৃতিক নিয়মেই সংঘটিত হয়ে গেছে এবং তারা এই মতবাদ গ্রহণ করেছে যে, বস্তু জগতের সবকিছু সম্ভবত এইভাবে এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে– এই আন্দাজ অনুমানই তাদের সকল বুদ্ধি বিবেকের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। এর ফলে যা কিছু নিশ্চিত ছিলো, তা সবকিছু অনিশ্চিত ও আনুমানিক হয়ে গেলো। কিন্তু গায়েবের বিষয়টা তাদের কাছে যেমন গোপন ছিলো, তেমনি গোপন রহস্য হিসাবেই বাকি রয়ে গেলো। আর তা হচ্ছে তাকদীর বা আল্লাহর নির্ধারিত বিষয়টা। এ হচ্ছে সুনিশ্চিত একমাত্র সত্য।

এ বিষয়ে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার কথা, 'তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ তায়ালা এরপর এই বিষয়ে কিছু কথা বলবেন।' সে কথা হচ্ছে সেই চূড়ান্ত ও একমাত্র আইন, যার সম্পর্কে নবী (স.) তাঁর স্বভাবগত মধুর বাণী দ্বারা জানিয়েছেন যে, মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তিনি দান করেছেন এক স্বতন্ত্র অবস্থা এবং এ বিষয়ে তিনি পূর্বেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। অংক ও প্রকৃতিবিদ্যার অধ্যাপক স্যর জেমস জীনস বলেন,

'অবশ্যই প্রাচীন কালের বিজ্ঞান স্থায়ী জ্ঞান দান করেছে, প্রকৃতি তো একটি পথেই মাত্র চলে আর তা হচ্ছে সেই আলোকোজ্জ্বল পথ, যা আগে রচিত হয়েছে। এমন ব্যবস্থা দান করেছে যার ওপর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলা যায় এবং সর্বদা চলমান এই পৃথিবীর চলার এই ধারার মধ্যে দেখা যায় যে, কোনো ঘটনা কোনো না কোনো কারণের জন্যেই সংঘটিত হয় এবং অবশ্যই এই কারণ ও সংঘটিত ঘটনার মধ্যে রয়েছে সদা সর্বদা এক সূক্ষ্ম যোগসূত্র আর এরই ফলে এক অবস্থার পর আসে আর একটি অবশ্যম্ভাবী অবস্থা। যারপর আসে আর একটা অবস্থা। যাকে দার্শনিকদের ভাষায় বলা হয়ে থাকে 'Thesis, anti-thesis and synthesis.' এ পর্যন্ত যা জানাতে পেরেছে তা হচ্ছে, (ক) একটা ঘটনা ঘটলে তার ফলে আর একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে (খ) অথবা (গ) অথবা (ঘ) অথবা এই ধরনের আরও অন্য কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। হাঁ, আর একটা কথা মানুষ বলতে পারে (ক) নামক একটা ঘটনা ঘটলো তারপর খ. নামক আরও একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে বেশী এবং (খ) ঘটনাটা ঘটলে (গ) ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও সাথে এসে যায়। আবার (ঘ) ঘটলে (ঙ) এর সম্ভাবনাও এসে যায়। এইভাবে যে কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য ঘটনা পর্যায়ক্রমে ঘটার সম্ভাবনা বরাবরই বাকী থাকে। এই কারণেই ক-এর, পর খ, গ, ঘ ও ঙ-র সম্ভাবনা সদা সর্বদাই রয়েছে বলে বলা যায় এবং একটার সাথে আর একটার গভীর সংযোগ সদা সর্বদাই থাকে। কিন্তু এসব হচ্ছে শুধুই সম্ভাবনা– এর মধ্যে কোনোটাকেই নিশ্চিত বলা যায় না। যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে তাদের প্রত্যেকটার পরই অন্য ঘটনাবলী পর্যায়ক্রমে আসার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু কোনো ঘটনা কখন ঘটবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এতোটুকু অবশ্য বলা যায় যে, একটা ঘটনা ঘটে গেলে তার প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীতে অন্য একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বেশী থাকে ও সে সম্পর্কে পূর্বাহ্নে কিছু অনুমান করা যায়। তা এসব অনুমানের মধ্যে যতোটুকু সত্যতাই থাকুক না কেন।(৩)

আর যখনই দুনিয়ার বাহ্যিক চাপ থেকে মানুষের অন্তর মুক্ত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো ওপর তাওয়াক্কুল করার মানসিকতা তাদের থাকবে না, আর তখনই তাদের মনের মধ্যে আল্লাহর কুদরতের কথা আনাগোনা করতে থাকবে। এটাই হচ্ছে সেই নিশ্চিত ও একমাত্র সত্য যার কারণে কথা এবং বাহ্যিক বিষয়াদি সবই আনুমানিক ও সম্ভাবনার মানসিকতা দূর করে দেয়!........... আর এটিই মানুষের মনে ও তার বুদ্ধিতেও সব থেকে বড় পরিবর্তন আনে। এ সেই পরিবর্তন যার কারণে উপর্যুপরি তিনটি শতাব্দী ধরে আধুনিক জাহেলিয়াত সঠিক ও উন্নততর অগ্রগতির সন্ধানে নিরন্তর অন্ধকারে অন্ধের মতো হাতড়িয়ে ফিরছে। কিন্তু তারা এমন কোনো যুক্তি বুদ্ধিসম্পন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি, যা তাদের মনকে আশ্বস্ত করতে পারে, অথবা আল্লাহর অমোঘ ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে, অথবা প্রকৃতির মধ্যে কর্মরত বাহ্যিক কার্য কারণ ও শক্তির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা সম্ভব হয়। মানুষের সত্য সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার পেছনে যে সব কারণ কাজ করে যাচ্ছে তা হচ্ছে, সাধারণভাবে আজ মানুষ

(৩) দেখুন আল্লাহ তায়ালার এই আয়াতে ব্যাখ্যা, 'আর তাঁরই কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।' ফী যিলালের ৬ষ্ঠ খন্ড দ্রষ্টব্য।

মুক্তচিন্তা, মুক্তবুদ্ধি, মুক্ত রাজনীতি, মুক্ত সামাজিকতা, মুক্ত নীতি নৈতিকতার চিন্তাধারা অবলম্বন করছে এবং জীবনের সকল ব্যাপারেই তারা স্বাধীনভাবে চলার পথ বেছে নিচ্ছে। হ্যাঁ মানুষের পক্ষে মূলত মুক্তবুদ্ধি হওয়া তখনই সম্ভব, যখন আল্লাহ্ তায়ালার নির্ধারিত চূড়ান্ত বিষয়াদির কাছে সে নতি স্বীকার করে চলবে এবং স্বতসিদ্ধ বিষয়গুলোকে সে মানতে থাকবে। তাঁর আনুগত্যের বাইরে যা কিছু আছে তা-ই হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা, অথবা তাঁর দাসত্ব মানেই প্রকৃতির দাসত্ব। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহর ইচ্ছা এবং ফয়সালা ছাড়া যা কিছু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে তা-ই হবে আল্লাহবিরোধী শক্তির ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তকে কার্যকর করা। আর এভাবে একমাত্র আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করার জন্যে তাকে তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং ঈমান থাকা না থাকা এই ভরসাটার ওপরই নির্ভর করে। আর ইসলামে এই গভীর বিশ্বাসের চেতনাই হচ্ছে চূড়ান্ত কথা। তারপর এই বিশ্বাসই মানুষের জীবনকে বাস্তব ক্ষেত্রে সঠিক পথে চলার জন্যে সাহায্য করে।(৪) এরশাদ হচ্ছে,

'যারা নামায কায়েম করে।'

এখানে আমরা ঈমানকে প্রকাশ্যভাবে গতিশীল এক বাস্তব রূপে দেখতে পাই, দেখতে পাই তখন, যখন অতি সংগোপনে আমাদের অন্তরের চেতনার মধ্যে নামাযের জন্যে তার পূর্বশর্ত হিসাবে জরুরী গুণগুলো এসে যায়। এই ভাবেই যে ঈমান হৃদয়ে স্থান পেয়েছে, তা বাহ্যিক কার্যাবলীর মাধ্যমে বাস্তব রূপ গ্রহণ করে এবং এ কাজ অন্তরের স্বীকৃতিকে দৃশ্যমান সাক্ষীতে পরিণত করে। সুতরাং বাহ্যিক ও দৃষ্টিগোচর কাজই ঈমানের উপস্থিতির প্রমাণ হাযির করে।

নামায শুধু আদায় করলেই একামতে সালাত (নামায প্রতিষ্ঠা)-এর দায়িত্ব পালন হয় না। 'আদায় করার' দ্বারের তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত করা হয় মাত্র। মাবুদ প্রভু প্রতিপালকের সামনে যেভাবে (আদবের সাথে) দাঁড়ানোর প্রয়োজন, সেইভাবে দাঁড়ানো দ্বারা নামায পূর্ণত্ব লাভ করে, যেহেতু তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সকল দুর্বলতার উর্ধে, তিনি সকল ত্রুটিমুক্ত। যদি অন্তরে আল্লাহর স্মরণ না থাকে তো শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে থাকা (কেয়াম) কেরাআত, রুকু সেজদা ইত্যাদিই যথেষ্ট নয়। এই পূর্ণাংগ নামায দ্বারা আল্লাহর প্রতি ঈমানের বাস্তব সাক্ষ্য প্রদান করা হয়। এরপর খরচ করার কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তাদেরকে আমি যা কিছু দিয়েছি তার থেকে তারা খরচ করে।'

যাকাত ও যাকাত ছাড়া অন্যান্য ঐচ্ছিক দান দ্বারা মোমেনরা খরচ করে। এ খরচ করার অর্থ তার সমুদয় সম্পদ নয়, বরং তাদেরকে যে সম্পদ আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তার থেকে তারা (একটা অংশ) কিছু খরচ করবে– এতোটুকু মাত্র। আল্লাহর কেতাব দ্বারা প্রমাণিত, সদা সর্বদা অবশ্যই কিছু না কিছু তারা খরচ করতে থাকবে, যেহেতু এ সম্পদ তারা তো নিজেরা সৃষ্টি করেনি। এ তো হচ্ছে সেই সম্পদ, যা তাদেরকে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দিয়েছেন। যা রেযেক তাদেরকে তিনি দিয়েছেন তার থেকে তারা খরচ করবে এবং এ কথা সত্য যে, যথেষ্ট পরিমাণেই তিনি তাদেরকে দিয়েছেন– এতো বেশী দিয়েছেন যা গুণে শেষ করা যায় না। কাজেই যখন তারা খরচ করে, তখন সব তো আর খরচ করে না– একটা অংশ মাত্র খরচ করে। এর থেকে তারা কিছু সঞ্চয়ও করে, মনে করে এটা তার নিজের মাল, অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে– এসব কিছু একমাত্র আল্লাহরই দান!

ওপরে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী হলেই মানুষদের ঈমানদার হওয়ার পর্যায়ে পৌছানো যাবে বলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন। এই ঈমানের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার একত্বের ওপর বিশ্বাস, তাঁকে স্মরণ করার জন্যে অন্তরের মধ্যে একটা আবেগ অনুভব করা, তাঁর

(৪) বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, 'খাসায়সুতাসাব্বুরিল ইসলামিয়্যা ওয়া কুমাওয়ামাতিহী'।

আয়াতসমূহের দ্বারা অন্তরের মধ্যে কিছু আবেগ সৃষ্টি হওয়া, একমাত্র তাঁর ওপর ভরসা করা, নামায কায়েম করা ও যাকাত আদায় করা সহ তাঁর দেয়া মাল থেকে স্বেচ্ছায় কিছু খরচ করা।

তবে ওপরের বিবরণীতে যে সব কথা এসেছে তা ঈমানের পূর্ণাংগ ও বিস্তারিত চিত্র নয়, যেমন আল্লাহর পবিত্র কালামের মধ্যে অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে। এ কথাগুলোতে ঈমানের বাস্তব চিত্রের প্রতি একটু ইংগিত করা হয়েছে মাত্র। সূরা আনফালে বর্ণিত যুদ্ধের ময়দান থেকে প্রাপ্ত মাল বন্টনে যে মতভেদ হয়েছিলো এবং এর ফলে যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিলো যে বিষয়ে মীমাংসা করতে গিয়েই প্রসংগক্রমে তাৎক্ষণিকভাবে ঈমানের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং মোমেনদের গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে যেন ওই গুণাবলীর ভিত্তিতে মোমেনরা সকল মতভেদের ফয়সালা করে ফেলতে পারে। ওই সময় মোমেনদের যে গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো না থাকলে ঈমানের বাস্তব কাজ থেকে দূরে সরে যাওয়া হবে, ঈমানের শর্তাবলী পালন করা হবে না। সুতরাং, আল কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর দেয়া ঈমানের এ শর্তাবলী বিভিন্ন বাস্তব কাজের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এর দ্বারা বুঝা গেলো ঈমান কোনো দার্শনিক চিন্তাধারার নাম নয়, বরং জীবনের বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণের স্বীকৃতির নাম, যার প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকবে অন্তরের অভ্যন্তরে এবং তার প্রতিফলন ঘটবে আল্লাহর হুকুমকে বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে।

এরই ফলে তাদের যে শেষ পরিণতি হবে, তা জানাতে গিয়ে বলা হচ্ছে,

'তারাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের রবের নিকট বহু মর্যাদাপূর্ণ ক্ষমা ও সম্মানজনক রেযেক।'

অতএব জানা গেলো যে, প্রকৃত ঈমানদারদের মধ্যে অবশ্যই এ গুণাবলী থাকতে হবে। এ সবের অবর্তমানে তাকে ঈমানী গুণাবলী থেকে বঞ্চিত বলে গণ্য করা হবে এবং এসব গুণের অধিকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কেই ওপরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সামনে পরীক্ষা এনে দেয়া হয়েছে যেন ওই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তারা সাফল্যমন্ডিত হতে পারে। আল্লাহর হুকুম মান্যকারী হয়ে যখন তারা পরীক্ষায় পাস করবে, তখনই তাদের জন্যে রয়েছে সুমহান প্রতিদানের আশ্বাসবাণী

'তাদের জন্যে তাদের পরওয়ারদেগারের কাছে বহু মর্যাদা রয়েছে'।

মোমেনদের দৃষ্টিকে এ প্রসংগে ওইসব ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে ফেরানো হয়েছে, যা তাদের মধ্যে ওই সময় দেখা দিয়েছিলো, যার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দিতে গিয়ে ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেছেন যে, ঈমানের ওই সব বাস্তব গুণ থাকলেই তাদের জন্যে রয়েছে তাদের মালিকের কাছে 'সম্মানজনক রেযেক'। এসব কথার মধ্যে তৎকালীন অবস্থায় সকল দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের তখনকার চিন্তা-চেতনা ও পদক্ষেপগুলো। সর্বোপরি নবী (স.)-এর নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে তাদের ঈমানী শক্তিও প্রমাণিত হয়েছে–এটাই হচ্ছে মোমেনদের গুণাবলী যে, আল্লাহ এবং রসূলের পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা এসে গেলে তারা সংগে সংগে তা মেনে নেয় এবং নিজেদের বুঝকে পরিহার করে সংগে সংগে আনুগত্য করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এরশাদ হয়েছে, 'তারাই প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার।'

প্রথম যুগের মুসলমানরা তাদের কার্যকলাপ ও ব্যবহারের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, ঈমানের একটা বাস্তব সত্ত্বা আছে যা মানুষ নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করে, আর এই কারণেই ঈমান শুধু কেবল মৌখিক দাবীরই নাম নয়, কারো মুখের কোনো ভাষাও এটা নয়, বা এটা কারো কোনো আশা আকাংখার বস্তুও নয়। হাফেয তাবারানী হারেস ইবনে মালেক আনসারীর বরাত দিয়ে বলেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ (স.)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি (স.) বললেন, 'তুমি কী অবস্থায় রাত্রি যাপন করেছ হে হারেস?' হারেস বললেন, আমি খাঁটি মোমেন হিসাবেই রাত

কাটিয়েছি। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'কি বলছো একটু ভেবে দেখো। প্রত্যেকটা জিনিসের জন্যেই কিন্তু একটা বাস্তবতা আছে, তোমার ঈমানের বাস্তবতা কী?' তিনি বললেন, আমার মনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে নিয়েছি এবং দিনকে আমি বানিয়েছি পিপাসার্ত (অর্থাৎ দিনে রোযা রেখে কাটানো সাব্যস্ত করেছি) আর তারপর থেকে আমি যেন আমার রবের আরশকে প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাচ্ছি। আরও যেন দেখতে পাচ্ছি জান্নাতবাসীদেরকে– তারা পরস্পরের সাক্ষাত করছে। আর এক দলকে দেখতে পাচ্ছি, তারা জাহান্নামের মধ্যে একে অপরকে দোষারোপ করে বেড়াচ্ছে। তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, ওহে হারেস, তুমি ঠিকই বুঝেছো, এই অবস্থার ওপর টিকে থাকো। কথাটা তিনি তিন বার বললেন। আর কথিত আছে যে, এই সাহাবী রসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুওতের যোগ্য সাক্ষ্য দানকারীই ছিলেন। তিনি নিজের অবস্থা জানতেন, সেইভাবে নিজেকে পরিচালনা করতেন এবং তাঁর কার্যকলাপও সেইভাবে সম্পাদিত হতো। সুতরাং অবশ্যই এটা বুঝবার বিষয় যে, যে ব্যক্তি স্পষ্টভাবে আল্লাহর আরশ (আসন)-কে দেখতেন, জান্নাতবাসীদের পরস্পরকে দেখা সাক্ষাত করতে দেখতেন এবং জাহান্নামবাসীদেরকে দেখতেন পরস্পরকে তিরস্কার করতে– এ চেতনা তার কোনো অন্তঃসারশূন্য চেতনা ছিলো না। অবশ্যই তিনি এই শক্তিশালী চেতনা নিয়েই জীবন যাপন করতেন এবং তাঁর প্রতিটি ব্যবহার ও কার্যকলাপ আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই নিবেদিত হতো, যার ফলে তিনি রাতের জাগরণ এবং দিনের রোযাকে নিজের ওপর বাধ্যতামূলক করে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর জীবনটাও এমন ভাবে নিবেদিত হয়ে গিয়েছিলো যেন তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর রবের আরশকে দেখতে পাচ্ছিলেন।

অবশ্যই ঈমানের মূল তাৎপর্য তো এটাই যে, মানুষ এই ঈমান আনার বিষয়টাকে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবে, তার জীবনের প্রতিটা কথা, কাজ ও ব্যবহারে সে হিসাব করে দেখবে যে, ঈমানের মাধ্যমে সে যে অঙ্গীকার করেছে, সেই মতোই কাজ করছে কিনা। তার বাহ্যিক ও প্রকাশ্য কার্যকলাপ তার স্বীকৃতির বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে কিনা। আর তার পাশেই দেখা যাচ্ছে বহু লোক আছে, যারা তাদের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ করে চলেছে। বাধা বিঘ্ন কিছু থাকলেই যে কর্তব্য কাজ থেকে গাফেল হয়ে যেতে হবে তাতো হতে পারে না। প্রকৃত ঈমানের জন্যে সঠিক চেতনাই প্রথম প্রয়োজন। আর বাধা বিপত্তি সত্য পথে তো আসবেই, এটা অবশ্যই মানতে হবে। বিশেষ করে তাদের জীবনে এসব বাধা বিপত্তি আসবে, যারা আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে বাস্তবে কায়েম করতে চায় এবং সেই সময়ে এ জন্যে সক্রিয়ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যখন চারিদিকে জাহেলিয়াতের পতাকা উড়ছে, সমাজের সর্বত্র মানব নির্মিত ব্যবস্থা চালু রয়েছে এবং সমাজের সকলের মধ্যে জাহেলিয়াতের প্রতি অন্ধ এক মহব্বত বিরাজ করছে।

গনীমত বন্টনের প্রথম ঘটনা

এরপর সূরাটির বর্ণনাধারায় সেই 'আনফাল' বন্টনের ঘটনাটা ফুটে উঠেছে, যা নিয়ে বদর যুদ্ধের মোজাহেদদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তাদের চরিত্রের খারাপ একটা দিক ফুটে উঠেছিলো। এ বিষয়ে ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সেই সময়কার ঘটনা বিশদভাবে ব্যক্ত করছেন। এ সময়কার কি ভূমিকা ছিলো, কি ছিলো তাদের চেতনা ও চিন্তা ভাবনা সবই তাঁর কথায় ফুঠে উঠেছে। তাদের সব ব্যবহার ও তৎপরতার মধ্য থেকে এ কথা বুঝা গেছে যে, তারা আল্লাহর ক্ষমতা ও কুদরত সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। আর 'আনফাল' বন্টন প্রশ্নে যা কিছু ঘটেছিলো এবং তাদের আচরণে যে ফল আমরা পাই, তাও তাঁর বিবৃতিতে অনেকাংশেই এসে গেছে। এটা অবশ্যই সত্য যে, বদর যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় এসেছিলো আল্লাহরই সাহায্যে এবং তাঁরই পরিকল্পনায়। হাঁ, তারা অবশ্য রসূল (স.)-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করার মর্যাদা পেতে চেয়েছিলেন এবং নিজেদের কল্যাণের জন্যেই তা চেয়েছিলেন। এ আকাংখা

অবশ্যই ভালো ছিলো। কিন্তু বিজয়ের তুলনায় এ আকাংখা ছিলো খুবই ছোট্ট ও তুচ্ছ জিনিস এবং অত্যন্ত সীমাবদ্ধ কাজ। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এর থেকে আরও কতোবড় জিনিস দিতে চেয়েছিলেন তা কল্পনাও করা যায় না। তিনি চেয়েছিলেন, তাদেরকে এই মহা গ্রন্থ আল কোরআন থেকে এমন কিছু দিতে, যা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড়ো জিনিস, যা নিয়ে আল্লাহর সর্বোচ্চ দরবারে নেতৃস্থানীয় ফেরেশতারা সদা সর্বদা ব্যস্ত, পৃথিবীব মানুষেরা ব্যস্ত, সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবীর সর্বকালের সব মানুষই ব্যস্ত রয়েছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্মরণ করাতে গিয়ে বলছেন যে, তাদের মধ্যে একটা দল ছিলো যারা যুদ্ধাভিযানে খুবই অনিচ্ছুক মন নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলো। তারা 'আনফাল'-এর বন্টনে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। বরং এ নিয়ে ঝগড়া করেছে, তারা চেয়েছিলো তাদেরকে উপস্থিত লাভের সেই জিনিস দেখিয়ে দিতে যা ওরা দেখতে চেয়েছিলো, যা তারা অপছন্দ করেছিলো অথবা পছন্দ করেছিলো। কিন্তু এসব সেই জিনিস নয়, যা আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের জন্যে চেয়েছিলেন এবং তাঁর ফয়সালা অনুযায়ী তাদের জন্যে বরাদ্দ করে রেখেছিলেন, আর তিনিই সকল কাজের শেষ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যেমন করে তোমার রব তোমাকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন সত্যের ধারক বাহক বানিয়ে .... আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে দোযখের আযাব।' (আয়াত-৫-১৪)

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা গনীমতের মাল তাঁর নিজের কাছে ও তাঁর রসূলের কাছে তাঁরই হুকুম বলে ফিরিয়ে দিলেন, যেন রসূলুল্লাহ (স.) এক-পঞ্চমাংশ বাদে তাদের মধ্যে সমভাবে ও ন্যায়ানুগভাবে তা বন্টন করে দেন।' এই এক পঞ্চমাংশ অর্থ কোন কোন খাতে ব্যয় করা হবে, তার বিবরণ পরে আসছে। বন্টনের এই নিয়ম এই জন্যে দেয়া হল যেন গনীমতের মালের ব্যাপারে পরবর্তী কালে মোমেনদের মধ্যে আর কোনো সংকট না দেখা দেয়। তারা যেন সর্বপ্রকার ঝগড়া-ফাসাদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে এবং যেন আল্লাহর রসূলও আল্লাহ প্রদর্শিত পন্থায় ও সঠিকভাবে তা ব্যয় করার অধিকার পান। এ বিষয়ে কারও মনে কোনো দ্বিধা সংকট না থাকে এবং গনীমতের মাল সংগ্রহ করার কারণে যাদের মনে দাগ কেটেছিলো, তা যেন সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়। তারপর যুদ্ধলব্ধ এ সম্পদ বাস্তব যোদ্ধা ও তাদের পাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিলো তাদের মধ্যে সমভাবে ভাগ করে দেয়া হলো।

এরপর, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এই সম্পদ বন্টনের যে নিয়ম করে দিলেন এবং তারা নিজেরা যেভাবে মাল গ্রহণ করার যৌক্তিকতা খাড়া করেছিলো দুটো অবস্থাকেই পাশাপাশি তুলে ধরলেন যেন তারা 'আনফাল' ও অন্যান্য সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে আল্লাহর ব্যবস্থার কল্যাণকারিতা যথাযথভাবে বুঝতে পারে। মানুষ তো সামনে যেটুকু দেখে সেইটুকুই মাত্র বুঝে। পেছনের বিষয়গুলো তার চোখের আড়ালে থেকে যাওয়ায় সব বিষয়ে সঠিকভাবে বুঝা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে সেই ঘটনাটা তুলে ধরলেন, যা তাদের সামনে ঘটেছিলো, অর্থাৎ 'আনফাল' বন্টনে তাদের মতবিরোধ..... এখন যারা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়নি বটে, কিন্তু যারা ওই সম্পদে নিজদের হাত আছে বলে মনে করতো, তাদের অবস্থাটা কী হবে? আর তাদেরই বা অবস্থা কী হবে যাদের হক আল্লাহ তায়ালা নিজে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন অথচ তারা ওদের সাথেই ছিলো? আবার এখানে এ প্রশ্ন আসে যে, তারা যেভাবে এ সম্পদ বিলি বন্টন করতে চেয়েছিলো এবং আল্লাহ তায়ালা যেভাবে বন্টন করতে চাইলেন এর মধ্যে কি কি বিষয়ে পার্থক্য ছিলো? এই বাস্তব অবস্থাকে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে যেন চোখের সামনে এবং কল্পনার চোখে ঘটনা তারা দেখতে পায়।

'যেমন করে সত্য সহ তোমার রব তোমাকে তোমার ঘর থেকে বের করেছিলেন, অথচ মোমেনদের মধ্যে একটা দল (ওই সময়ে) অবশ্যই এই বের হওয়ার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিলো। ..... (এই জন্যেই তোমাকে যুদ্ধের জন্যে তিনি বের করেছিলেন) যেন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং মিথ্যা ধ্বংস হয়ে যায়, যদিও অপরাধীরা এটা পছন্দ করেনি।' – (৫ আয়াত)

অবশ্যই আল্লাহর রসূলের কাছে 'আনফাল' বন্টনের ভার ছেড়ে দেয়া, সবার মধ্যে সমান সমান ভাগ হওয়া, কোনো কোনো মোমেনের কাছে এই সমান সমান বন্টন ভালো না লাগা .... আর এর আগে কোনো কোনো যুবককে বিশেষভাবে কিছু বেশী দেয়াতে কারো কারো কাছে খারাপ লাগা....... এসব অবস্থাকে তুলনা করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা যে সত্যের জন্যে দুর্ধর্ষ শত্রুর সাথে লড়াই করার জন্যে তোমাকে ঘর থেকে বের করেছিলেন তার সাথে। আরও তুলনা করা যায় কোনো কোনো মোমেনের পক্ষে যুদ্ধ করতে না চাওয়ার সাথে ...... অথচ 'আনফাল' বন্টন নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিলো, তা তাদের সামনেই ছিলো।

বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব

সীরাতের কেতাবসমূহ থেকে আমরা আনফাল বন্টনের ঘটনাবলী বিস্তারিত ভাবে জানতে পেরেছি। আমরা দেখেছি রসূল (স.) যখন যুদ্ধের ব্যাপারে ইংগিত দিলেন, তখন আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.) দাঁড়ালেন এবং তাঁরা অতি সুন্দরভাবে সাথে সাথে সব কথা মেনে নিলেন এবং পূর্ণ আনুগত্য পেশ করলেন। এ সময় স্পষ্টভাবে জানা গেলো যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা পথ পরিবর্তন করে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে যাওয়া সত্তেও কোরায়শ বাহিনী সর্বপ্রকার সমর সাজে সজ্জিত হয়ে এবং তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। এ খবর জানার সাথে সাথে মেকদাদ ইবনে আমর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্যে চলুন এগিয়ে যাই, অবশ্যই আমরা আপনার সাথে আছি। বনী ইসরাইল জাতি যেমন করে তাদের নবীকে বলেছিলো, আপনি ও আপনার রব যান, আপনারাই যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে রইলাম– সেইভাবে আমরা বলব না। বরং আমরা বলবো, আপনি ও আপনার রব এগিয়ে যান, যুদ্ধ করুন, আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবো। .... আয়াতে বর্ণিত কথাগুলো শেষ পর্যন্ত (দেখুন)। একথাগুলো ছিলো মোহাজেরদের পক্ষ থেকে, অর্থাৎ মক্কা থেকে আগত মেকদাদ এ কথা দ্বারা মোহাজেরদের সবার অন্তরের কথারই প্রতিধ্বনি করছিলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স.) যখন যুদ্ধ সম্পর্কে বারবার প্রশ্ন করছিলেন, তখন আনসাররাও তাঁর কথার যথাযথ অর্থ বুঝতে পারলেন এবং সা'দ ইবনে মোয়ায তাদের পক্ষে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি দীর্ঘ এক বক্তৃতা করলেন এবং তাঁদের চূড়ান্ত মনোভাব জানিয়ে রসূলুল্লাহ (স.)-কে নিশ্চিন্ত করলেন।

কিন্তু এ কথাও সত্য যে, এ কথাগুলো ছিলো একদিকে আবু বকর, ওমর-এর মুখে উচ্চারিত কথা, অপরদিকে ছিলো মেকদাদ ও সাদ ইবনে মোয়ায (রা.)-এর কথা। কিন্তু কিছু কিছু সাহাবা এমনও ছিলেন, যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে মদীনা থেকে বেরিয়েছিলেন। তারা সবাই যুদ্ধকে পছন্দ করেননি, বরং যুদ্ধের ব্যাপারে তারা কিছু আপত্তিও উথাপন করেছেন, যেহেতু তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি ছিলো না। তাঁরা তো বেরিয়েছিলেন ওই ছোট্ট ও দুর্বল মুসলিম দলটির সাথে মিলিত হতে, যারা (আবু সুফিয়ানের) উঁটের বহরের অবস্থা জানার জন্যে বেরিয়েছিলো। তারপর যখন তারা জানতে পারলো যে, কোরায়শ বাহিনী তাদের অশ্বারোহী, পদাতিক, বীর যোদ্ধা ও ঘোড়সওয়ার সবাইকে নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে রওয়ানা হয়ে পড়েছে, তখন তারা যে কোনোভাবে হোক যুদ্ধ এরিয়ে যেতে চাইলো। তাদের এই অপছন্দের কথাটাকেই কোরআনুল কারীম অনন্য এক প্রকাশভংগি দ্বারা ব্যক্ত করেছে,

'যেমন করে তোমার রব তোমার ঘর থেকে সত্য সহ ও সঠিকভাবে তোমাকে বের করেছিলেন, কিন্তু মোমেনদের একটা দল অবশ্যই তখন তা (যুদ্ধ) পছন্দ করেনি। এই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রশ্নে তাদের কাছে স্পষ্টভাবে মনে হচ্ছিলো যে, তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তারা যেন মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করছে।

হাফেয মারদাবিয়াহ তাঁর তাফসীরে– আবু আইউব আনসারীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমরা যখন মদীনার অভ্যন্তরে ছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, আমাকে আবু সুফিয়ানের উঁট-বহর সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে, তারা (যুদ্ধাস্ত্র সহ মক্কার দিকে) এগিয়ে যাচ্ছে এখন কি তোমরা এই উঁটের কাফেলাকে ধরার জন্যে এগিয়ে যেতে চাও? গেলে হয়তো অনেক গনীমতের মাল পাবে! আমরা বললাম, হাঁ, অবশ্যই আমরা যাবো। এরপর তিনি ও আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তারপর যখন আমরা এক অথবা দুই দিনের সফর অতিক্রম করলাম, তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, 'কোরায়শ কওমের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমাদের মত কী? তোমাদের রওয়ানা হয়ে যাওয়ার খবর তাদের কাছে পৌঁছে গেছে।' এতে আমরা বললাম, না, আল্লাহর কসম, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো আমাদের তেমন কোনো শক্তি-ক্ষমতা ও প্রস্তুতি নেই, আমরা তো উঁটের কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করার জন্যেই এসেছিলাম। এরপরও তিনি আবার বললেন, ওই কোরায়শ জাতির সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে তোমাদের কী চিন্তা ভাবনা? তখন আমরা পূর্বের মতোই একই কথা বললাম। এসময়ে মেকদাদ ইবনে আমর বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (যদি যুদ্ধ করতেই হয়) সে অবস্থায় আমরা তেমনি করে বলবো না যেমন করে মূসা (আ.)-কে তাঁর জাতির লোকেরা বলেছিলো, যাও তুমি আর তোমার রব যাও তোমরা যুদ্ধ করো গিয়ে, আমরা এখানেই বসে থাকবো।' তখন আমরা আশা করছিলাম আহ্, আমরা আনসারগণও যদি সেইভাবে বলতে পারতাম যেমন করে মেকদাদ ইবনে আমর বলেছেন, তাহলে বিপুল সম্পদ লাভ করা থেকেও তা আমাদের জন্যে অনেক ভালো হতো! তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলের কাছে নাযিল করলেন, 'যেমন করে সঠিকভাবে তোমার রব তোমাকে তোমার ঘর থেকে বের করেছিলেন, অথচ তখন মোমেনদের একটা অংশ এটা মোটেই পছন্দ করছিলো না।'

সেদিন মোমেনদের মনের মধ্যে পূর্বোক্ত ওই কথাগুলোই খটকা সৃষ্টি করেছিলো এবং এই কারণেই তারা যুদ্ধকে অপছন্দ করেছিলো, আর এজন্যে তাদের সম্পর্কে কোরআনুল কারীমও জানিয়ে দিলো,

'(তাদের অনিচ্ছা সত্তেও যখন তারা যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিলো, তখন তাদের কাছে মনে হচ্ছিলো) যেন তারা দেখতে পাচ্ছে যে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মৃত্যুর দিকে।'

আর তাদের এই মনে হওয়াটা ছিলো 'সত্য' তাদের সামনে একবার সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠার পর এবং একথাও তারা জেনে নিয়েছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে ওয়াদা করেছিলেন যে, উক্ত দুটো দলের যে কোনো একটাকে তিনি তাদের হস্তগত করাবেনই এবং দুটো দলের মধ্যে উঁটের কাফেলাটা যখন হাতছাড়া হয়ে গেলো এবং ভিন্ন পথ ধরে মক্কায় পৌঁছে গেলো, তখন অপর দলটা, অর্থাৎ মক্কার কোরায়শ বাহিনীই রয়ে গেলো তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে, যারা আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী অবশ্যই মোমেনদের মোকাবেলায় আসবে এবং অবশ্যই মোমেনরা তাদের ওপর বিজয়ী হবে। আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক হয় কাফেলা, নয় মক্কী বাহিনী দুটোর যে কোনো একটাকে অবশ্যই হস্তগত হতেই হবে। একটা ছিলো দুর্বল ও নিষ্কন্টক কাফেলা এবং অপরটা ছিলো শক্তিশালী ও অস্ত্র-সম্ভারে সজ্জিত গর্বিত বাহিনী।

আল্লাহ দ্বীনের বিজয় চান, প্রয়োজন সত্যিকার মোমেনের

এই যে বিজয়ের অবস্থাটা, এটা সরাসরি এক বিপদাবস্থার মধ্য দিয়েই আসতে যাচ্ছিলো এবং এটাও সুনিশ্চিত ছিলো যে, বিজয় সম্পর্কে তাদের অন্তরে গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও এ বিজয় অর্জনের জন্যে রণাংগনে মোকাবেলা ছিলো অপরিহার্য এবং কোরআনে কারীম আমাদেরকে একথাই জানাচ্ছে যে, আমাদের ভাগ্যের লিখনকে বাস্তবে পেতে হলে অবশ্যই মোকাবেলায় ময়দানে নামতে হবে। আর এটাও সত্য যে, আল্লাহর মেহেরবানী ও ওয়াদা সম্পর্কে মনের মধ্যে নিশ্চিন্ততা থাকা সত্ত্বেও মানবীয় দুর্বলতার কারণে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সময়ে মনের মধ্যে অবশ্যই কিছু অস্থিরতা আসে। সুতরাং সে অবস্থায় এই মনকে আশ্বস্ত করতেই হবে এবং নামতে হবে পথে ও এগিয়ে যেতে হবে বীর বিক্রমে সম্মুখ সমরে।

এভাবেই নেমে এলো প্রথম সাক্ষাত সমরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ওয়াদাকৃত সাহায্য ও বিজয়। এই সেই বদরের বাহিনী– যাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'তোমরা কি জানো, হয়ত আল্লাহ তায়ালা বদরের বাহিনীর লোকদেরকে এক মহা মূল্যবান খবর দিয়ে দিয়েছেন। এ খবরে তিনি বলেছেন, 'তোমাদের যা খুশী তাই করো, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি।' আর এটাই ছিলো (তাদের জন্যে) পুরস্কার হিসাবে।

মুসলমানদের মধ্যে এক দল বাকি রয়ে গিয়েছিলো, যারা মনে করতো আল্লাহ তায়ালা দুর্বল ও নিরস্ত্র একটি দল অবশ্যই তাদেরকে মিলিয়ে দেবেন। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে ওয়াদা করছিলেন যে, দুটো দলের যে কোনো একটিকে তিনি করায়ত্ত করাবেন। আর তোমরা তো আকাংখা করছিলে যে, নিরস্ত্র দলটিই তোমাদের কবযায় আসুক।'

এই জিনিসটাই মুসলমানদের মধ্য থেকে একটা দল নিজেদের স্বার্থের জন্যে চেয়েছিলো। আর তাদের জন্যে, তাদের দ্বারাতেই এ স্বার্থ অর্জিত হোক বলে আল্লাহ তায়ালা যে জিনিসটা চেয়েছিলেন, তা ছিলো অন্য জিনিস। এরশাদ হচ্ছে,

আর আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন তাঁর ঘোষণা দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক কাফেরদের মূল শেকড়গুলো। তিনি চান (এইভাবে অস্বীকারকারীদের মূল শেকড়গুলো কেটে দিয়ে নাফরমানদের বিস্তার রোধ করতে এবং) সত্যকে জয়যুক্ত করতে আর মিথ্যাকে ধ্বংস করে দিতে– যদিও অপরাধী গোষ্ঠী এটা মোটেই পছন্দ করেনি।'

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সকল দয়া ও মহানুভবতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কাফেরদের এই হত্যাকান্ড চেয়েছেন, গনীমত চান নাই। তিনি চেয়েছিলেন সত্য ও বাতিলের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধুক, তাহলেই সত্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও টিকে থাকার যোগ্য বানানো যাবে এবং অন্যায়ের কর্তৃত্ব ও নাকচ করে দেয়া যাবে। মিথ্যাকে সমূলে দূর করে দেয়া যাবে। আর এ জন্যেই তিনি চেয়েছিলেন কাফেরদের (শক্তির) শেকড়কে কেটে দিতে। অতএব, যাকে তিনি চাইবেন, সে অবশ্যই নিহত হবে এবং যার বন্দী হওয়া তিনি চাইবেন সে অবশ্যই বন্দী হবে। যে বন্দী হবে, তাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদের অহংকারকে পদদলিত করা হবে, তাদের শক্তিকে চূর্ণ করে দেয়া হবে এবং ইসলামের ঝান্ডাকে বুলন্দ করা হবে আর আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা হবে। এভাবেই মুসলিম জামায়াতের পক্ষে আল্লাহর পথে জীবন যাপন করা সম্ভব হবে এবং এভাবেই পৃথিবীর বুকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েমের পথ সুগম হবে এবং অহংকারী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অহংকারকে চূর্ণ করে দেয়া যাবে। আর আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন সত্যের এই প্রতিষ্ঠা যুক্তির মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হোক। ঝোঁক প্রবণতা দ্বারা

অথবা আবেগ সৃষ্টির মাধ্যমে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক— কিছুতেই তা তিনি চান নাই। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন যুক্তি-বুদ্ধিহীন আবেগ প্রবণতা সৃষ্টি করা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি চান, মানুষ চেষ্টার মাধ্যমে সত্যকে গ্রহণ করুক, একনিষ্ঠতার সাথে বাস্তব জীবনের সকল প্রকার সংগ্রাম সংঘাতে লিপ্ত হয়ে বাস্তব ময়দানে নেমে যাক, কঠিন সংঘর্ষে জড়িত হয়ে এবং এই সংগ্রামী জীবনের সকল প্রকার দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণা সয়ে সত্যের পথে এগিয়ে যাক ।

হাঁ, আল্লাহ রব্বুল আলামীন চেয়েছেন মুসলিম জামায়াত একটা আত্মনির্ভরশীল ও বলিষ্ঠ জাতিতে পরিণত হোক এবং তাদের জন্যে বাস্তবে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। পৃথিবীর বুকে এক দুর্লংঘও সত্যাশ্রয়ী শক্তিতে পরিণত হোক এবং এই জাতিই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোক। তিনি আরও চেয়েছেন শত্রুর মোকাবেলায় টিকে থাকার জন্যে তারা ভারসাম্যপূর্ণ এক সামরিক বাহিনী গড়ে তুলুক। তিনি চেয়েছেন মুসলিম উম্মাহ এমন শক্তির অধিকারী হোক যেন তারা দুশমনদের ওপর সকল দিক দিয়ে প্রভাবশীল হয়ে উঠতে পারে এবং দুশমনদেরকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে। ঈমানী চেতনা, শৃংখলা, নিয়মানুবর্তিতা ও সকল বিষয়ে সঠিক ও সুবিচার প্রদর্শন দ্বারা তারা যেন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে এবং বিশ্বকে একথা জানিয়ে দিতে পারে যে, সম্পদ, সংখ্যা, মেয়াদের দৈর্ঘ ও সরঞ্জামের মধ্যেই আসল শক্তি নিবদ্ধ নয়, বরং সকল শক্তির উৎস হচ্ছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তাঁর সাথে সম্পর্কের গভীরতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে যাবতীয় শক্তি। এ সম্পর্ক যতো গভীর হবে ততই হবে তার শক্তি বেশী, যেহেতু তিনিই সকল শক্তির আধার। একথা কোনো কল্পনা-বিলাস বা নিছক কোনো বিশ্বাসের আবেগ নয়, এটাই হচ্ছে মুসলিম জাতির ইতিহাসে বাস্তব সত্য। এজন্যে মুসলিম জাতিকে এই আকীদা বিশ্বাস মযবুত বানানোর জন্যে এবং তাদের কার্যকলাপকে ওই বিশ্বাসের আলোকে সুন্দর ও সুসংহত করার জন্যে বারবার উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তবে শুধু বিশ্বাস ও আল্লাহ ভরসা নিয়ে বসে থাকতে বলা হয়নি, বরং দুশমনদের প্রস্তুতির অনুরূপ সাজ সরঞ্জাম ও সাধ্যমত অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন ভবিষ্যতে দুনিয়ার মানুষের কাছেও অস্ত্রধারী ও শক্তিশালী জাতি রূপে তারা বিবেচিত হতে পারে। মুসলমানরা নিজেরাও যেন প্রত্যেক যামানায় ঈমানী দৃঢ়তার সাথে সাথে নিজেদের অস্ত্র ভান্ডার থাকার কারণে প্রভাবশীল হতে পারে এজন্যে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এতে যদি শত্রুদের তুলনায় অস্ত্র ভান্ডার পরিমাণে কমও থাকে, তবু শত্রুদের অনুরূপ অস্ত্রের অধিকারী তাদের অবশ্যই হতে হবে। আর জনসংখ্যার দিক দিয়ে যদি শত্রুর তুলনায় তারা কম হয়, তাতেও চিন্তার কিছু নেই। তাদের সংখ্যা যাই হোক না কেন, তাদেরকে একতাবদ্ধ ও সুসংগঠিত হতে হবে এবং অবশ্যই তাদের মনের মধ্যে ঈমানী শক্তি ও বাতিল শক্তির ভেতরকার পার্থক্যের অনুভূতিও থাকতে হবে, যা বদরের সিদ্ধান্তকর যুদ্ধে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিলো।

এ সত্য দেখতে পাবে আজকের যে কোনো দশক, ভবিষ্যতের মানুষও এ সত্য দেখতে পাবে এবং সে দিনকার মুসলমানরা যেভাবে এ সত্যকে দেখেছিলো সেভাবেই মানুষ এই দীর্ঘস্থায়ী জীবন লক্ষ্য দেখতে পাবে। তারা দেখবে সেই কল্যাণকে, যা আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। যতোই তারা দেখবে ততোই তাদের কাছে মনে হবে এ চাওয়া ও পাওয়া দীর্ঘস্থায়ী এক সত্য। আর যখন তারা জানতে পারবে তাদের জন্যে কোন কোন ভালো ও কল্যাণকর জিনিস আল্লাহ তায়ালা ঠিক করে রেখেছেন, আর যখন তারা বুঝবে এই কল্যাণের পথে চলতে গেলে তাদের বহু বাধা বিঘ্ন এবং বিপদ আপদ অতিক্রম করতে হবে, তখন এসব বিপদ তাদেরকে মুষড়ে ফেলতে পারবে না এবং তখন এগুলোকে তারা আদৌ কোনো বিপদই মনে করবে না।

কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যে কল্যাণ চেয়েছিলেন, সে কল্যাণের অধিকারী হওয়ার জন্যে তারা কী ভূমিকা নিয়েছিলো? এটাই তো বাস্তবে মনে হয়, তারা যদি

ঝামেলামুক্ত কাফেলাটাকে ধরতে পারতো, তাহলে সেটা গ্রহণ করেই তারা খুশী হয়ে যেতো। এরপর আসছে গনীমতের মাল নিয়ে তাদের মধ্যে যে গন্ডগোলটা হয়ে গেলো এ ব্যাপারে। প্রশ্ন আসে যদি তারা কাফেলাটা কবযায় আনতে পারতো, তাহলে তাদের সমস্ত মালামাল অতি সহজেই হস্তগত করতে পারতো! আর বদরের যুদ্ধে জয়লাভ এটা তো অবশ্যই বিশ্বাসের দৃঢ়তার পুরস্কার স্বরূপ তাদের জন্যে এসেছিলো। এটা ছিলো এক চূড়ান্ত সাহায্য ও বিজয় এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী এক বিস্ময়কর অধ্যায়ও বটে। এ ছিলো সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও রণসম্ভারে পরিপূর্ণ এক মহাদর্পী শত্রুর মোকাবেলায় সত্যের মহা বিজয়ের কাহিনী। এ চরম সত্য ও সঠিক কাহিনীর মধ্যে একথা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, সংখ্যা ও সরঞ্জামই বিজয় আনে না, বিজয় আনে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের গভীরতা ও তাঁর সাহায্য। যখন মানুষ তার ব্যক্তিগত দুর্বলতা থেকে মুক্ত হয়, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে। এ কথা আরো ভাস্বর হয়ে ফুটে উঠেছে সেই ঘটনা থেকে যখন অনিচ্ছুক যোদ্ধাদের মধ্যে একটা ছোট্ট দল আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দোয়া করেছিলো। তারা আল্লাহর সাহায্যের ওপর নির্ভর করে বস্তুগত সব কিছুর তুচ্ছতাকে উপেক্ষা করেছিলো এবং অন্তরের প্রগাঢ় বিশ্বাস নিয়ে শত্রুর দিকে এগিয়ে যাওয়ায় তাঁর সাহায্যের হকদার হয়েছিলো। নিজেদের দুর্বলতার ওপর তারা বিজয়ী হয়েছিলো। বিজয়ী হয়েছিলো ময়দানে বিরাজমান সকল পরিস্থিতির ওপর এবং এইভাবে যুদ্ধের মোড় ফিরে গিয়েছিলো এবং মিথ্যা-শক্তির দাপট থমকে গিয়েছিলো, সত্যের পাল্লা ভারী হয়ে গিয়েছিলো এবং পরিশেষে সত্যের চূড়ান্ত বিজয় হয়েছিলো।

তাকিয়ে দেখুন বদর যুদ্ধের প্রান্তরের দিকে। এ যুদ্ধ মানবেতিহাসের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করেছিলো। দেখুন এ যুদ্ধ জয় পরাজয়ের একটি মৌলিক নিয়ম নির্ধারণ করেছে এবং মানব জাতিকে, জানিয়ে দিয়েছে বুঝিয়ে দিয়েছে তাদেরকে জয় পরাজয়ের কারণগুলো, যুদ্ধ জয়ের মূল ও প্রকৃত কারণ কোনটা জানিয়ে দিয়েছে এবং পরিষ্কার করে একথা জানিয়ে দিয়েছে যে বাহ্যিক বস্তুগত উপরণ বিজয়ের একমাত্র কারণ নয়। সত্যের বিজয়ের জন্যে লিখিত এ শর্তগুলো দেশে দেশে এবং যুগ যুগ ধরে পঠিত হতে থাকবে। সত্যের এ গ্রন্থ সবখানে খোলা রয়েছে। এর পথ ও পদ্ধতি অপরিবর্তনীয়। এর প্রকৃতি কোনো দিন বদলায় না। এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে এক বিশেষ নিদর্শন। এ হচ্ছে সৃষ্টির বুকে যে সব নিয়ম চালু রয়েছে তার মধ্যে এক অমোঘ নিয়ম। এ নিয়ম ততোদিন চালু থাকবে, যতোদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে। চিন্তা করুন মুসলিম দল কোন কোন কারণে এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো! এ দলটার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো জাহেলিয়াতের তমসায় আচ্ছন্ন থাকার পর আবার পৃথিবীর বুকে পূর্ণাংগ ইসলামী ব্যবস্থা চালু করা।

আপনি বদর প্রান্তরের সামনে একবার দাঁড়ান এবং চিন্তা করুন। দেখুন সেই চূড়ান্ত পদক্ষেপের দিকে, যা সেদিন গ্রহণ করা হয়েছিলো। আরও চিন্তা করুন সেই কঠিন পার্থক্যের দিকে, যা মানুষ নিজের জন্যে চেয়েছিলো আর যা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দিতে চেয়েছিলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের (অবস্থার) কথা, যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে দুটো দলের যে কোনোটাকে তোমাদের হস্তগত করে দেবেন বলে ওয়াদা করছিলেন– তোমরা চাচ্ছিলে নিরস্ত্র দুর্বল দলটি তোমাদের হাতের মুঠোয় এসে যাক। আর আল্লাহ তায়ালা চাচ্ছিলেন তাঁর ঘোষণা দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং চাচ্ছিলেন কাফেরদের সুদৃঢ় শেকড়কে কেটে দিতে, যাতে সত্য বিজয়ী হয় ও মিথ্যা পর্যুদস্ত হয়ে যায়, যদিও কাফেররা এটা পছন্দ করতে পারে না।'

আজকের যে দলটা এই দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা করে যাচ্ছে, এ সুন্দরতম ব্যবস্থাকে মানুষের অন্তরের মধ্যে এবং জগতের সবখানে বিজয়ী করতে চাচ্ছে, তারা আজকে বদরের পরিস্থিতিতে গৃহীত মুসলমানদের ভূমিকার মতো সেই ভূমিকা গ্রহণ না করে সফলতার কোনো আশাই করতে পারে না- যেহেতু তখনকার ও এখনকর পরিস্থিতির মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বিশ্বের যে কোনো সময়ে বাতেল শক্তি যেখানে যেখানে নিজের থাবা বিস্তার করেছে, সেখানে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করতে চাইলে মুসলমানদের বদরের সাহাবাদের মতো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে। সেই নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে এবং আল্লাহ তায়ালার ওপর পূর্ণ ভরসা করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হবে- যেমন করেছিলেন বদরের মুসলমানরা। যতোদিন আসমান যমীন টিকে আছে, ততোদিন ওই একই ধারায় যদি কাজ করা যায়, তাহলে আল্লাহর সাহায্য ও রহমত আজও তেমনি করে বর্ষিত হবে যেমন তৎকালীন মুসলমানদের ওপর বর্ষিত হয়েছিলো আর আল্লাহর সাহায্য বর্ষিত হলে পূর্ণ ইসলামী বিপ্লব পুনরায় আশা করা যায়। ....

বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ

তারপর আলোচনার ধারা এগিয়ে চলেছে বদর যুদ্ধের পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং মুসলমানদের অনবদ্য সেই ভূমিকা সম্পর্কে, যা তখনকার মুসলমানরা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে তাদের অবস্থা জানা যায় কেমন করে দুশমনদের শক্তির মূল শেকড়গুলো আল্লাহ তায়ালা কেটে দিয়েছিলেন এবং কেমন করে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে বিজয়ের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। এজন্যে নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ যাবতীয় তদবীর করেছেন। এ প্রসংগে আল কোরআনের অনন্য বর্ণনাভংগি বদর প্রান্তরের মুসলমানদের দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা অতি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছে। ওই সময়ের অবস্থা ও ঘটনাবলীকে তুলে ধরেছে, যেন মানুষ ওই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন জীবনের স্বাদ পায়। অবশ্য এ সময়ে সীমালংঘনকর যে সব ঘটনা ঘটেছিলো আল কোরআনের শিক্ষা অনুসারে সেগুলো থেকে পরহেয করতে হবে। সেই সব আচরণ, পরিহার করতে হবে যা এক সময় আরবের বুকে অশান্তি ঘটিয়েছিলো, বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছিলো। এসব আচরণের ফল মানুষকে অবশ্যই দুনিয়াতে কিছু না কিছু ভোগ করতে হয়, আর আখেরাতে তো এর সাজা অবধারিত রয়েছেই। উম্মাতে মুসলিমাহ যদি সঠিক আচরণ করে এবং মানুষকে কল্যাণ ও শান্তির পথ দেখায়, তাহলে তার প্রতিদানও তারা পাবে। তাদের মর্যাদা দুনিয়াতে যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি আখেরাতেও তারা হবে মর্যাদাবান। এই দ্বীন ইসলামের সঠিক অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমেই তারা আল্লাহ তায়ালার দরবারে সর্বাধিক ইযযত লাভ করবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা, যখন তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা করছিলে, তখন তোমাদের রব তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা পরপর ছোট ছোট সাহায্যকারী দল হিসাবে তোমাদের পেছন দিক থেকে এসে তোমাদের সাথে যোগ দিতে থাকবে। তবে জেনে রেখো................ আর যারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করবে, তাদের জানা দরকার যে, আল্লাহ তায়ালা খুব শক্তভাবে তাদেরকে পাকড়াওকারী। হাঁ, এই হবে তোমাদের পরিণাম (হে সীমালংঘনকারীরা, সেদিন তোমাদেরকে বলা হবে), গ্রহণ করো এই কঠিন শাস্তির স্বাদ। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে দোযখের দগদগে আগুন। (আয়াত ৯-১৪)

এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো পুরোপুরিভাবে আল্লাহর হুকুম ও তাঁর ইচ্ছানুযায়ী। তাঁরই পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং নির্ধারিত সময়ে। এ যুদ্ধ চলছিলো আল্লাহর সৈন্য দ্বারা এবং স্বয়ং

আল্লাহরই পরিচালনায়। এ যুদ্ধের ঘটনাগুলো এমনই চমকপ্রদ যে, আল কোরআনে উল্লেখিত এর বিবরণীর দিকে পাঠক যখন তাকায়, তখন সে হতভম্ব হয়ে যায় এবং তার কাছে মনে হয় যেন এখনই এবং তার সামনেই বুঝি এ বিস্ময়কর যুদ্ধটি সংঘটিত হচ্ছে।

এরপর আসছে আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্যে মুসলমানদের আকুল আবেদনের দৃশ্য। এ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ জানাচ্ছেন, যখন বদর যুদ্ধের দিন ঘনিয়ে এলো, তখন নবী (স.) তাঁর তিন শতের কিছু বেশী সাহাবার দিকে তাকালেন এবং তাকালেন মোশরেকদের দিকেও- যারা ছিলো হাজারেরও বেশী।(৫) তারপর তিনি কেবলামুখী হয়ে বসলেন। তাঁর পরনে ছিলো একটা বস্ত্র এবং গায়ে ছিলো একটা চাদর। এসময়ে তিনি দোয়া করছিলেন, 'হে আল্লাহ, সেই ওয়াদা পূরণ করো- যা তুমি আমার সাথে করেছো। আয় আল্লাহ, যদি (আজকের দিনে) ইসলামের এই ছোট্ট বাহিনীটা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে আর কখনই তোমার এবাদাত করা হবে না।' এভাবে তিনি তাঁর রবের কাছে সাহায্য চাইতেই থাকলেন এবং অবিরামভাবে দোয়া করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কাঁধ দুটো থেকে চাদর খসে পড়ে গেলো। এসময় আবু বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং চাদরটি তাঁর কাঁধে তুলে দিলেন এবং পেছন থেকে তাঁর কাছ ঘেষে বসে বললেন, হে আল্লাহর নবী, আপনার পরওয়ারদেগারের কাছে আপনার কাকুতি মিনতি যথেষ্ট হয়েছে। অবশ্যই তিনি আপনাকে প্রদত্ত ওয়াদা পূরণ করবেন।' এর পর পরই আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, 'স্মরণ করে দেখো সে সময়কার অবস্থা, যখন তোমরা তোমাদের মালিকের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দোয়া করছিলে, তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দোয়া কবুল করলেন ও বললেন, 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা পেছন দিক থেকে পর্যায়ক্রমে দলে দলে সাহায্যকারী হিসাবে আসতে থাকবে (ও তোমাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে থাকবে)।

বদরের যুদ্ধের সময় ফেরেশতাদের আগমন সম্পর্কে বহু হাদীস এসেছে, যার মধ্যে বহু বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। তাদের সংখ্যা এবং বাস্তবে তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কথা জানা যায়। আরও জানা যায়, মোমেনদেরকে লক্ষ্য করে দৃঢ়তা অবলম্বন করার জন্যে আল্লাহর আহ্বান সম্পর্কিত কথা। মোশরেকদের দিকে তিরস্কার-বাণী নিক্ষেপ করা সম্পর্কেও এখানে জানা যায়.... আর আমরা একই ভাবে এই কেতাব 'ফী যিলাল'-এর মধ্যে কোরআন হাদীসে উল্লেখিত কথাগুলোকে উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত হচ্ছি এবং এ বিষয় সম্পর্কিত আয়াতটিই তুলে দেয়া যথেষ্ট মনে করছি,

'স্মরণ করে দেখো সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দোয়া করছিলে, যার জওয়াব দিতে গিয়ে তিনি বললেন, 'আর অবশ্যই আমি হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবো, যারা সাহায্যকারী দল হিসাবে পেছন থেকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পর্যায়ক্রমে আসতে থাকবে, ...

এইতো ছিলো মূল ঘটনা। 'স্মরণ করে দেখো একবার সেই ঘটনার কথাও, যখন তোমার রব ওহী নাযেল করে ফেরেশতাদের উদ্দেশে বলছিলেন, আমি (নিজে) তোমাদের সাথে আছি। অতএব, তোমরা ঈমানদারদেরকে মযবুত করে রাখো। খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবো। অতপর তোমরা আঘাত করতে থাকো কাফেরদের গর্দানের ওপর এবং আঘাত করো তাদের প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায়।' ..... এটাই ছিলো যুদ্ধের ময়দানে ওই ফেরেশতাদের বাস্তব কাজ। এর থেকে বেশী বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। এই বর্ণনাকে আমরা যথেষ্ট মনে করে এ প্রসংগে ইতি করতে চাই। আর আমাদের জন্যে এতোটুকু জানাই যথেষ্ট যে, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন সেদিন যুদ্ধের ময়দানে

মুসলমানদেরকে অসহায় অবস্থায় এবং একাকী ছেড়ে দেননি। কারণ মুসলমানরা ছিলো সংখ্যায় অনেক কম, আর কাফেররা ছিলো বহু গুণে বেশী। আর এই দল এবং এই দ্বীনের সাহায্যার্থে ফেরেশতাদের আগমন সংবাদ আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম। জানতে পারলাম যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের দ্বারা সাহায্য করার কথা জানিয়েছিলেন তারা সেই ভাবেই এসেছিলেন। এটা আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী ও ক্ষমতার নিদর্শন, যা আল কোরআনের আলোকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছি।

বদর প্রান্তরে ফেরেশতাদের আগমনের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে ইমাম বোখারী তাঁর মহান কেতাব বুখারী শরীফের 'বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের যোগদান' অধ্যায়ে উদ্ধৃত করছেন, 'রাফে আযযারকী বলছেন, তাঁর পিতা বদরে যোগদানকারী একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেছেন, নবী (স.)-এর কাছে জিবরাঈল (আ.) আগমন করে বললেন, বদরের যুদ্ধে যোগদানকারীদের সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কি? তিনি বললেন, 'এরা শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান মুসলমান অথবা এই ধরনেরই কিছু কথা বললেন। তখন তিনি (জিবরাঈল) বললেন, ফেরেশতাদের মধ্য থেকেও এই রকম উত্তম কিছু সংখ্যক ফেরেশতা আপনাদের সাথে রয়েছে।' (এ হাদীসটি বোখারীতে একক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত)। পুনরায় দেখুন, বলা হয়েছে,

'স্মরণ করে দেখো সেই সময়কার কথা, যখন তোমাদের রবের কাছে তোমরা সাহায্য চেয়ে দোয়া করছিলে। .... নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মহা শক্তিমান। মহা বিজ্ঞানময় (আয়াত ৯-১০)

ওরা যখন সাহায্য চেয়ে দোয়া করছিলো, তখন অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন; যারা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সাহায্যকারী দল হিসাবে একের পর এক আসতে থাকবে ....।

...... এঘটনাতে আল্লাহ রব্বুল ইযযতের মাপকাঠিতে মুসলিম জামায়াত ও এই মহান দ্বীনের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এ জামায়াত যেহেতু আল্লাহ তায়ালারই দল, এজন্যে এদেরকে সাহায্য করা ও হেফাযতের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা চান না যে, মুসলিম জামায়াত তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে নানা প্রকার ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী হোক এবং বুঝুক যে, এ সাহায্য এই-এই কারণে এসেছে, বরং তিনি চান তারা বুঝুক যে, আল্লাহর সাহায্য বিনা ওসীলাতেই আসতে পারে। এজন্যে তিনি জানিয়েছেন যে, এ সাহায্য এসেছে মানবীয় যুক্তি বুদ্ধির উর্ধে সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব বাহিনী দ্বারা, যাতে করে ভবিষ্যতের মুসলমানরা আল্লাহর মদদের ক্ষমতার ওপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করতে পারে। এরপর আবারও তিনি জানিয়েছেন যে, ফেরেশতাদের মাধ্যমে এসব সাহায্যের খবর দান এটাও এক সুসংবাদ হিসাবে এসেছে। তিনি সাহায্য করতে চাইলে সরাসরি করতে পারেন, তবু মোমেনদের অন্তরকে শান্ত করার জন্যেই ফেরেশতাদের একটা সংখ্যারও উল্লেখ করেছেন। আল কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে মোমেনদের অন্তরে এই প্রতীতিই জন্মানো হয়েছে।

আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য

মুসলিম জনগণের কর্তব্য হচ্ছে তাদের সাধ্যে যতোটুকু শক্তি সামর্থ আছে তাকে পুরোপুরিই কাজে লাগানো। এর অতিরিক্ত যা কিছু প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নিজেই গ্রহণ করেছেন। এজন্যে ইসলামের দুশমনদের সাথে প্রথম মোকাবেলাতেই আল্লাহ তায়ালা সাধ্যমত প্রস্তুতি নিয়েই অগ্রসর হতে বলেছেন। যতোটুকু প্রস্তুতি তাদের ছিলো, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানতেন, এজন্যে এর অতিরিক্ত যা প্রয়োজন ছিলো তার পুরো

(৫) অন্য রেওয়াতের আছে যে, তারা ছিল হাজার ও নয় শতের মধ্যকার একটা সংখ্যা।

দায়িত্ব সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা নিজেই নিয়েছেন এবং তাঁর সাহায্যের ওপর পূর্ণ ভরসা করে সমর ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, যুদ্ধকে বিজয়ের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। তবে তাদের কর্তব্য হিসাবে তারা অবশ্যই যথাসম্ভব প্রস্তুতি নেবে এবং শত্রুর মোকাবেলায় সাধ্যমত চেষ্টা চালাবে। সাধ্যের বাইরে যা প্রয়োজন তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তৃপ্তিজনক সুসংবাদ দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন এবং বাস্তব বিপদের মোকাবেলায় যেন তারা দৃঢ় ও সংকল্পবদ্ধ থাকতে পারে, তার জন্যে তিনি তাদেরকে আগাম বিজয়ের আভাসও দিয়েছেন। আর মোমেনদের অন্তরের মধ্যে নিশ্চিন্ততার জন্যে এটাই যথেষ্ট যে, স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহর সৈন্য তাদের সাথে রয়েছে। এর ফলে তাদের মনকে চিন্তামুক্ত করা এবং যুদ্ধে মযবুতীর সাথে টিকে থাকা সহজ হবে। তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলো যে, একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই বিজয় আসা অবশ্যম্ভাবী– অন্য কেউই বিজয় দিতে পারে না। তিনি মহাশক্তিমান। তিনিই সব কিছু করতে সক্ষম। তিনিই তাঁর নির্দেশ পালন করানোর ব্যাপারে বিজয়ী এবং তিনিই মহা বিজ্ঞানময়, অর্থাৎ সব কিছুকে তার স্বস্থানে সংস্থাপনকারী। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ কর ওই সময়ের কথা, যখন তোমাদেরকে পরম প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততার কারণে ভীষণ তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো এবং তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রবল বৃষ্টিধারা, বর্ষণ করছিলেন যাতে করে তোমাদেরকে তিনি অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে দেন (সজীবতা ফিরিয়ে আনেন) আর দূর করে দেন তোমাদের থেকে শয়তানের (এনে দেয়া) বিভিন্ন প্রকার অপবিত্র অনুভূতিকে, মযবুত করে বেঁধে দেন তোমাদের অন্তরগুলোকে এবং মযবুত করে দেন তোমাদের পা-গুলোকে।'

এখন দেখা যাক এই তন্দ্রার বিষয়টা, যা মুসলমানদেরকে যুদ্ধের পূর্বে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। এ ছিলো যুদ্ধের পূর্বে এমন এক আশ্চর্যজনক অবস্থা, যা একমাত্র আল্লাহর হুকুমে ও ক্ষমতার কারণে আসা সম্ভব হয়েছিলো। এ অবস্থার পূর্বে মুসলমানরা দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। যেহেতু তারা সংখ্যায় নিজেদেরকে অত্যন্ত অল্প দেখছিলো, তাই ওই অকল্পনীয় বিপদের মোকাবেলার সাহস পাচ্ছিলো না। এজন্যে তন্দ্রা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। এরপর এই ভীষণ তন্দ্রা দ্বারা তাদের মধ্যে এক মনোরম প্রশান্তি এনে দেয়া হয়েছিলো। অন্তরকে এমনভাবে নিরুদ্বিগ্ন করে দেয়া হয়েছিলো যে, তাদেরকে তন্দ্রার জড়তা এমনিভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলা এটা ছিলো তাদের মানসিক এক অদ্ভুত অবস্থা। তাদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিলো যে, আল্লাহর ফয়সালার বাইরে কিছুই হবে না এবং পূর্বাহ্নেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর ফয়সালা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি তাদেরকে বিজয় দান করবেন। নিজেদের সংখ্যার তুচ্ছতার দিকে তাকিয়ে এবং তাদের তুলনায় মোশরেকদের সুসজ্জিত বিশাল বাহিনীর দিকে তাকিয়ে মুসলমানরা প্রথমে অবশ্যই আতংকিত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু হঠাৎ করে এমনভাবে গভীর তন্দ্রা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেললো যে, তারা ভুলে গেলো যুদ্ধের বিভীষিকার কথা এবং মানষিক অস্থিরতা মুক্ত হয়ে তারা একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলো, অজানা এক প্রশান্তি নেমে এল মুষ্টিমেয় এই বাহিনীর ওপর।

ওহুদ যুদ্ধের দিনেও এই ধরনের প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা নেমে এসেছিলো। কখনও আসছিলো ভয়, আবার কখনও আসছিলো নির্লিপ্ততা। ভয় ও প্রশান্তি পর্যায়ক্রমে বারবার ঘুরে ঘুরে আসছিলো। ওই সময়ে বদরের দিবসের ন্যায় গভীর তন্দ্রা তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলছিলো যে, তারা কিছুতেই চোখ খোলা রাখতে পারছিলো না। আমি এই আয়াতগুলোকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি এবং এই তন্দ্রার বিষয়টি যতোবারই পড়ছি ততোবারই আমি অনুভব করছি যেন আমার সামনেই এ ঘটনা ঘটছে। এর সঠিক তাৎপর্য তো আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

তিনি আমাদেরকে যতোটুকু জানান ততোটুকুই আমরা জানতে পারি। কিন্তু এসব ঘটনার বিবরণীর যে গম্ভীর প্রভাব আমার ওপর পড়ছে তা হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন। এসব ঘটনা পড়ার সময় আমার ওপর দিয়ে অতি সূক্ষ্ম কিছু মুহূর্ত অতি সংগোপনে অতিক্রম করে। যেন পড়ন্ত বেলায় দারুণ উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আমার বুক দুরুদুরু করে কাঁপতে থাকে। এরপর এসে যায় এক তন্দ্রা, যা আমাকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে। এসময় আমি যেন এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাই। মন নির্লিপ্ত, হয়ে যায় শান্ত। অন্তর আমার সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। তখন গভীর প্রশান্তির সাগরে আমি যেন ডুবে যাই। পরে এ অবস্থা আমার কিভাবে শেষ হলো জানি না। হঠাৎ করে কি ভাবে আমাকে পরবর্তী অবস্থা পেয়ে বসলো কিছুই আমি জানি না। কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে পরে মনে পড়েছে বদর ও উহুদ যুদ্ধের কথা। তখন আমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে, বদর ও ওহুদ প্রান্তরে তন্দ্রায় অভিভূত হওয়ার অবস্থাটা অনুভব করেছি। এটা এমন এক অবস্থা, যা আমি কোনো যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারিনি, বুঝাতেও পারবো না। আমার অন্তরের গভীরে তীব্রভাবে আমি অনুভব করেছি। এটা কোনো অলীক কল্পনা নয়, আর এর মধ্যে আমি আল্লাহর সাহায্যকে যেন জীবন্ত রূপে দেখতে পেয়েছি, যা অতি সংগোপনে এবং সরাসরি আমার মধ্যে কাজ করেছে। এরপর আমার অন্তর প্রশান্ত হয়ে গেলো। মন নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ততায় ভরে গেলো।

এই আচ্ছন্ন অবস্থা এবং এই প্রশান্তিই বদরের ওই মোজাহেদদের মধ্যে আল্লাহর সাহায্যের তীব্র অনুভূতি পয়দা করে দিয়েছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন,

'স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, যখন তোমাদেরকে গভীর তন্দ্রা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো, যার মধ্যে ছিলো সুগভীর এক প্রশান্তি।'

'এ বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত তিনটি শব্দ 'তোমাদেরকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করছিলো', 'তন্দ্রা' ও 'প্রশান্তি'– এ তিনটি শব্দই প্রায় একই অর্থবোধক। এ তিনটি শব্দই অতি সূক্ষ্মভাবে মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ব্যাপারে একই সাথে কাজ করে। যার ফলে তখন যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়, তা যে কোনো মানুষের কাছে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং মোমেনদের সেদিনকার অবস্থাটা কল্পনার চোখে সহজেই ভেসে ওঠে। সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে পাঠকের সামনে ওই দৃশ্য। ওই দৃশ্যের বিবরণ মুসলমানদের মনের ওপর তখনকার সময়ের অবস্থাটিকে টেনে আনে।

এবারে দেখা যাক পানি বর্ষণের ঘটনার রহস্য।

'আর তিনি তোমাদের ওপর (বৃষ্টির) পানি বর্ষণ করছিলেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে পারেন এবং দূর করে দেন তোমাদের মন থেকে শয়তানের অপবিত্রতা। তোমাদের অন্তরগুলোকে পরস্পর ঐক্য ও মহব্বতের সাথে বেঁধে দেন এবং যাতে করে তোমাদের কদমগুলো জমে যায়।' (আয়াত-১১)

যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই আল্লাহর পক্ষে তাঁর অদৃশ্য হাতে মুসলমানদের সাহায্য করার এ ছিলো আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আবু তালহার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নবী (স.) যখন বদর প্রান্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, তখন মোশরেকদের অবস্থান ছিলো 'রমলা' ও 'ইচ্ছা' নামক দুটি পানিধারা ও তাদের মধ্যবর্তী স্থানে। এসময় মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো এবং তাদের অন্তরের মধ্যে শয়তান নানাভাবে ওয়াসওয়াসা দিয়ে তাদের মধ্যে ক্রোধ এনে দিচ্ছিলো। যার কারণে তাদের মধ্যে কেউ কেউ এতোদূর পর্যন্ত বলতে শুরু করেছিলো, তোমরা মনে করো যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু আর তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূলও বর্তমান রয়েছেন, অথচ মোশরেকেরা পানির স্থানটা দখল করে নিয়ে তোমাদের ওপর ইতিমধ্যেই বিজয়ী হয়ে গেছে। আর তোমরা শুধু আল্লাহমুখী হয়ে নামাযে রত হয়ে রয়েছো? এরপরই আল্লাহ

তায়ালা পরওয়ারদেগার তাদের ওপর প্রবল বারিধারা বর্ষণ করলেন। অতপর মুসলমানরা সেই পানি বিভিন্ন পাত্রে ধরলেন, কিছু পান করলেন এবং গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করলেন এবং এইভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর থেকে শয়তান আনীত অপবিত্রতা দূর করে দিলেন। আর সেই বৃষ্টি দ্বারা বালুকে জমিয়ে দিলেন। তারা মানুষ ও যুদ্ধের সওয়ার এবং রসদ বহন করার জন্যে আনা পশুগুলো আসানীর সাথে চলাচল করার সুবিধা পেলো। তারপর মুসলমানরা শত্রুর দিকে অগ্রসর হলো এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করলেন। জিবরাঈল (আ.) একদিকে পাঁচশত ফেরেশতাকে পরিচালনা করছিলেন এবং মীকাঈল (আ.) পরিচালনা করছিলেন অন্য আর এক দিকে আর পাঁচশত ফেরেশতাকে। হাব্বাব ইবনে মুনযেরের বর্ণনায় জানা যায় যে, এই ফেরেশতাদের আগমন ঘটেছিলো বদর-প্রান্তরে পানির স্থলটা রসূলুল্লাহ (স.)-এর দখলে আসার পূর্বে এবং এর ফলে মুসলমানদের মধ্য থেকে ভীতি দূর হয়ে যাওয়ায় তাদের মধ্যে প্রভূত আশার সঞ্চার হয়েছিলো।

আর একটা ঘটনা জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (স.) বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলেন এবং ওখানে পৌঁছে সব থেকে নিকটবর্তী পানির স্থলের পাশেই অবতরণ করলেন। এসময় হাব্বাব ইবনে মুনযের এগিয়ে এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, যে স্থানে আপনি নেমেছেন তা যদি আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়, তাহলে কিছু বলার নেই। আর যদি তা না হয়, তাহলে কি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বা যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে এ স্থানটা নির্বাচন করেছেন? তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, 'হাঁ যুদ্ধের প্রয়োজনেই এ স্থানটা আমি নির্বাচন করেছি।' তখন সাহাবী বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, না, এ স্থানটা যুদ্ধ কৌশলগত দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং আপনি আমাদের সাথে আসুন, শত্রুর অবস্থানের কাছাকাছি পানির স্থানটিতে আমরা অবস্থান নেবো। সেখান থেকে আমরা শত্রুর গতিবিধি সঠিকভাবে লক্ষ্য করতে পারবো এবং আমাদের হাউযগুলো আমরা পানি দ্বারা ভর্তি করে রাখতে পারবো। অন্যদিকে শত্রুর হাতে পানি থাকবে না, এতে তারা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবে এবং পরাজয় বা প্রত্যাবর্তনের দিকে এগিয়ে যাবে। তখন রসূলুল্লাহ (স.) ওই স্থান পরিত্যাগ করে আমাদের সাথে চলে এসে উপরোক্ত জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করলেন।(৬)

সুতরাং, এই রাত্রিতে হাব্বাব ইবনে মুনযেরের পরামর্শ কার্যকরী করার পূর্বে সাহাবাদের ওপর ওই অবস্থাটা নেমে এলো, যা বদর যুদ্ধে যোগদানকারী (সাহাবা)দের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন। এ সমর-ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য দ্বিগুণ এসেছিলো। এসেছিলো বস্তুগত দিক থেকে এবং আত্মিক দিক থেকেও। মরুভূমির মধ্যে পানির সুবিধা অবশ্যই একটা বস্তুগত প্রাপ্তি এবং জীবন রক্ষাকারী জিনিস বটে। অতিরিক্ত যে উপকারীতা এ পানি থেকে পাওয়া গিয়েছিলো তা হচ্ছে বিজয়ের জন্যে এই পানি অতিরিক্ত একটা কার্যকারণ হিসাবে কাজ করেছে। আর এটা একটা বড় সত্য যে, যে বাহিনী মরুভূমির মধ্যে পানির উৎস থেকে বঞ্চিত হয়, অথবা প্রচুর পানির ব্যবস্থা না রাখতে পারে, তারা যুদ্ধে নামার আগেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। তারপর আসছে পবিত্রতার প্রশ্ন। শয়তানী ওয়াসওয়াসা অনেক সময় মানসিক শক্তিকে কমিয়ে দেয়। শয়তানের ওয়াসওয়াসায় মুসলমানদের এ দুর্বলতার অবস্থা এসে গিয়েছিলো। পানির অভাবে, অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়তে যে অসুবিধা হয়, (তায়াম্মুম করার অনুমতি তখনও, পঞ্চম হিজরীতে বনু মুসতালিক যুদ্ধে রসূল (স.)-এর সাথে যারা ছিলেন, সেই সকল সাহাবাকে কেন্দ্র করেই প্রথম এ অনুমতি এসেছিলো)। এসময়ে অনেকেরই স্বপ্নদোষ হয়ে গিয়েছিলো এবং ঈমানের দরজা দিয়ে প্রবিষ্ট শয়তানী প্ররোচনার কারণে তাদের মন দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। তাদের অন্তরগুলো কাঁপতে শুরু

করে। এই কম্পিত ও দুর্বল মন নিয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়াটা তাদের জন্যে একটা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। অপবিত্রতার অনুভূতি মনকে আরো দুর্বল করে দেয় এবং অন্তরের হতাশা সৃষ্টি করে। এই কারণেই দেখুন কিভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এসে গেলো। পানি পেয়ে গোসল করে ফেলার পর তাদের মন খোলাসা হয়ে গেলো। এরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর পানি বর্ষন করেছেন, যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে পারেন এবং দূর করেছেন তোমাদের শয়তানের অপবিত্রতা, আর তোমাদের হালকা মনকে বেঁধে দেন এবং কদমগুলোকে মযবুত করে দেন।'

এরপর আল্লাহ তায়ালা বস্তুগত উপাদানের সাথে আত্মিকভাবেও তাদেরকে মযবুত বানালেন– তাদের অন্তরগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পেয়ে শান্ত হয়ে গেলো। পরম প্রশান্তিতে ভরে গেলো তাদের হৃদয়, এক পবিত্রতার পরশে তাদের কদমগুলো শক্ত মাটিতে জমে গেলো। পানিপ্রাপ্তির কারণে বালুময় যমীন জমাট বেঁধে গেলো ও চলাচলের জন্যে মাটি সুগম হয়ে গেলো।

মোমেনদেরকে দৃঢ়ভাবে ময়দানে টিকিয়ে রাখার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন, নির্দেশ দিলেন কাফেরদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করার জন্যে এবং আরো নির্দেশ দিলেন মুসলমানদের সাথে বাস্তব যুদ্ধে শরীক হতে। এরশাদ হচ্ছে,

'স্মরণ করে দেখো ওই সময়ের কথা, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে বলছিলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি ....এবং আঘাত করো তাদের জোড়ায় জোড়ায়।' (আয়াত-১২)

এ বিষয়টি ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ...... ফেরেশতাদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর নিজে উপস্থিত থাকা এবং মুসলিম জামায়াতের সাথে ফেরেশতাদের যুদ্ধে শরীক থাকাটাই সব থেকে বিস্ময়কর কাজ। আসলে এ বিষয়ে মাথা ঘামানো আমাদের মোটেই উচিত নয়। কারণ যতোই আমরা চিন্তা করি না কেন, কিছুতেই আমরা এ ব্যাপারটা বুঝতে পারবো না। কেমন করে ফেরেশতারা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো? কতজনকে তারা হত্যা করেছিলো? কেমন করে হত্যা করেছিলো? এ সব প্রশ্ন আসল কথা নয় ...... এ যুদ্ধের মধ্যে সব থেকে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, এই দ্বীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রয়োজন মুসলমানদের চূড়ান্ত আন্দোলন, যার শেষ পর্যায় হচ্ছে যুদ্ধ। এ যুদ্ধ শত্রুর মোকাবেলায় শুধু টিকে থাকার জন্যে নয়, বরং আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর আইন কানুন চালু করার মাধ্যমে তাঁর প্রভুত্ব কায়েম করা। এ উদ্দেশ্যে এর বিরোধীদেরকে উৎখাত করতে হবে, যার জন্যেই হবে এ প্রাণান্তকর যুদ্ধ। যুদ্ধ যেহেতু আল্লাহ তায়ালা নিজেই চান এ জন্যে যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতাদের সাথে তাঁর থাকার ব্যাপারটা বুঝা যায় এবং ফেরেশতাদেরও মুসলিম জামায়াতের সাথে থাকা প্রয়োজন হয়।

অবশ্যই আমরা অন্যান্য সৃষ্টির মতো বিশ্বজাহানে ফেরেশতা নামক এক সৃষ্টির অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানি না। তাদের সৃষ্টিকর্তা তাদের সম্পর্কে আমাদের যতোটুকু জানিয়েছেন ততোটুকু মাত্র জানি। কিন্তু মুসলমানদেরকে বদর যুদ্ধে সাহায্যের জন্যে ঠিক কিভাবে তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে যতোটুকু বলা হয়েছে তার অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করা বা বুঝা আমাদের জন্যে সম্ভব নয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদেরকে বলছেন, 'অবশ্যই আমি তোমাদের সাথে আছি।' আবার তিনিই মুসলমানদেরকে ময়দানে মযবুতভাবে টিকিয়ে রাখার জন্যে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ জারি করেছেন– তারাও এ নির্দেশ পালন করেছেন, যেহেতু তাদেরকে যা কিছু নির্দেশ দেয়া হয়, তারা সেগুলো সবই পালন করেন। কিন্তু আমরা জানি না, তাঁরা কিভাবে সে নির্দেশ পালন করলেন। তিনি তাদেরকে আরও

(৬) দেখুন তাফসীরে ইবনে কাসীর।

নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁরা মোশরেকদের গর্দানের ওপর আঘাত হানেন এবং আঘাত হানেন তাদের জোড়ায় জোড়ায়। এ হুকুম যথাযথভাবে তামিল করতে গিয়ে তারা অবশ্যই এ কাজ করেছেন, কিন্তু কিভাবে তারা একাজ করলেন তা আমরা জানি না। ফেরেশতাদের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা যেটুকু জ্ঞান রাখি, তা হচ্ছে তাদের সম্পর্কে জানার একটা দিক মাত্র আমাদের সামনে আছে। আর তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে যতোটুকু জানিয়েছেন, আমরা ততোটুকুই জানি। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি কাফেরদের অন্তরের মধ্যে এক ভীষণ ভীতি এনে দেবেন। আর অবশ্যই এটা হয়েছে এবং অবশ্যই তাঁর ওয়াদা সত্য। কিন্তু একই ভাবে এ কথাটা আমরা জানি না যে, তিনি সে ওয়াদা কিভাবে পূরণ করলেন। আল্লাহ তায়ালাই তো সেই সত্ত্বা, যিনি সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই ভালো জানেন কি কি তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মানুষ ও তার মনের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং তিনি তাদের গর্দানের শাহ-রগ দুটো থেকেও তাদের বেশী কাছে ....।

অবশ্য এসব কার্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখা আমাদের ঈমানের অংগ নয় এবং আমাদের আকীদা বিশ্বাসের কোনো বাস্তব অবস্থারও প্রতিরূপ এটা নয়। বরং এ বিষয়টাই ইসলামী চিন্তাবিদ ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে এক দারুণ বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিতর্ক তখন সৃষ্টি হয়েছে, যখন এ দ্বীন সম্পর্কে সঠিক চিন্তা গবেষণা করা মানুষ ছেড়ে দিয়েছে এবং আধুনিক যুক্তি বুদ্ধি মানুষকে বশীভূত করে ফেলেছে। আর অবশ্যই যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার ফেরেশতাদের সাথে থাকার বিষয়টা এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণের বিষয়টা এমন রহস্যপূর্ণ ছিলো, যা সাধারণ যুক্তিবুদ্ধিতে বুঝে আসে না। এমতাবস্থায় এ বিষয়ে চুপ থাকাটাই শ্রেয়।

এ বিষয়ের আলোচনা শেষে এবং ওই কঠিন বিষয়টা যা ওই সময়ে সংঘটিত হয়েছিলো, তার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে যুদ্ধ ও বিজয়ের মধ্যে যে মূল সত্যটা আমরা জানতে পারছি তা হচ্ছে সকল কাজের জন্যেই রয়েছে এক নিয়ম, তা জয়ের প্রশ্নেই হোক বা পরাজয়ের প্রশ্নেই হোক। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'হাঁ ঐটাই হচ্ছে প্রতিফল সেই কদর্য ব্যবহারের, যা তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতায় করে এসেছে। আর যারাই আল্লাহ ও রসূলের বিরোধিতা করবে, তাদের জেনে রাখা দরকার যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা বড় শক্তভাবে পাকড়াওকারী।'

মুসলিম জামায়াতকে আল্লাহর সাহায্য দান এবং তাদের দুশমনদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করা ও মুসলমানদের সাথে যোগদান করে ফেরেশতাদের যুদ্ধ করা কোনো সাময়িক যুক্তিহীন ঘটনা বা কোনো আকস্মিকতা নয়। বরং যেহেতু ইসলামের দুশমনরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করেছে এবং আল্লাহ ও রসূলের পথ ছাড়া অন্য জীবন পথ বেছে নিয়েছে, আল্লাহ ও রসূল (স.) জীবনের যে মূল্যায়ন করেছেন তার থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তারা জীবনের মূল্যায়ন করেছে এবং সর্বস্তরেই ইসলামী ভাবধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার বাইরে মানুষকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে-এ জন্যেই আল্লাহর সরাসরি মদদ মুসলমানদের জন্যে চিরদিন ছিলো, আছে ও থাকবে। তাই জানানো হচ্ছে,

'আর যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের বিরোধিতা করবে তার জেনে রাখা দরকার যে, অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা শক্তভাবে পাকড়াওকারী।'

যারাই আল্লাহ ও রসূলের বিরোধিতা করবে, তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই শাস্তি বর্ষণ করবেন, আর অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দিতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম এবং তারা এতই দুর্বল যে, তাঁর শাস্তির মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকা তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

এক স্থায়ী নিয়ম ও প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ীই আল্লাহর সাহায্য ও শাস্তি নেমে আসে- এটা কোনো আকস্মিক সিদ্ধান্ত বা যুক্তিবিহীন কোনো কাজ নয়। এই সুসামঞ্জস্য ও যুক্তিপূর্ণ বিধি অনুযায়ীই পৃথিবীর যে কোনো এলাকায় মুসলমানরা একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যে গিয়েছে ও তাঁর রাজ্যে একমাত্র তাঁরই আইন-কানুন চালু করার জন্যে চেষ্টা করেছে, সেখানে যখনই কেউ আল্লাহ ও রসূলের কাজের বিরোধিতা করেছে, সেখানেই মুসলমানদেরকে মযবুতী দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে সরাসরি সাহায্য করা হয়েছে। অপরদিকে যারাই আল্লাহ ও রসূলের বিরোধিতা করেছে, তাদেরকে ভয় ও পরাজয়ের গ্লানি ছেয়ে ফেলেছে। কিন্তু মুসলমানদেরকে তখনই মদদ করা হয়েছে, যখনই তারা আল্লাহর পথে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে এবং তাদের রব-এর সাহায্যের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে, আর একমাত্র তাঁর ওপরেই তারা পুরোপুরি ভরসা করেছে।

এ প্রসংগের শেষের দিকে আল্লাহ ও রসূলের বিরোধীদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ দুনিয়াতে যাদের ওপর ভয় ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে এবং পরাজয়ের গ্লানি যাদের ওপর সওয়ার হয়ে গিয়েছে, তাদের এ করুণ অবস্থা দুনিয়াতেই শেষ হয়ে যাবে না। দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এ জীবন বিধান এবং এর জন্যে পরিচালিত দুর্বার আন্দোলন শুধুমাত্র এ দুনিয়ার জন্যেই নয়, বরং এর সীমানা ছড়িয়ে রয়েছে পরপারের জগত পর্যন্ত এবং এ জীবনের সীমানা পেরিয়ে আখেরাতের জীবন পর্যন্ত। ছড়িয়ে আছে এর আশা-আকাংখা এ জগতের বাইরে আরেক জগত পর্যন্ত। তাই এরশাদ হচ্ছে,

হাঁ, ঐটাই হচ্ছে নির্ধারিত সেই প্রতিদান, যার ওয়াদা করা হয়েছে। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে দোযখের আগুনের শাস্তি। ওদের মৃত্যুর সাথে এখানেই এ সফরের শেষ। আর এই হচ্ছে সেই আযাব যার কোনো কল্পনাও মানুষ করতে পারে না। আর দুনিয়ার শাস্তি, যেমন ভয়-ভীতি, পরাজয়, গর্দানের ওপর আঘাত, জোড়ায় জোড়ায় আঘাত ইত্যাদির কোনো তুলনাই হয় না পরকালীন আযাবের সাথে!

যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন

এখন আমরা আসছি আরেক প্রসংগে.... এ পর্যন্ত ওদের সামনে তুলে ধরা হল সেই সব ঘটনার চিত্র ও তার আনুষংগিক বিষয়াদি। তাদের এর মধ্যে বিদ্যমান আল্লাহর ক্ষমতা, তাঁর ব্যবস্থাপনা ও তাঁর সাহায্য দেখিয়ে দেয়া হলো এবং তারা এ কথাও বুঝে গেলো যে, আল্লাহর নিরাপত্তা ও ক্ষমতা ছাড়া তাদেরকে রক্ষা করার আর কেউ নেই, নেই অন্য কোনো ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা সেই সর্বশক্তিমান সত্ত্বা, যিনি তাঁর রসূলকে সত্যের পতাকাবাহী হিসাবে এবং সঠিকভাবে তাঁর ঘর থেকে বের করলেন। তাঁকে গর্বিত, সীমালংঘনকারী ও বিদ্রোহী হিসাবে ঘর থেকে বের করেননি। আর আল্লাহ তায়ালাই তাদের জন্যে ওপরে বর্ণিত দুটো দলের মধ্যে একটা দলকে তাঁর সেই কাজের জন্যে বাছাই করেছেন, যা তিনি চেয়েছিলেন। তিনিই কাফেরদের শেকড় কেটে দিয়েছিলেন (যাতে করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মিথ্যাকে ধ্বংস করেন- যদিও অপরাধী চক্র এটা পছন্দ করে না।) আর আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন, যারা এসেছিলো দলে দলে- পর্যায়ক্রমে। আল্লাহ তায়ালাই তন্দ্রাভিভূত করে ফেলেছিলেন তাদেরকে সেই দারুণ পেরেশানীর মুহূর্তে এবং এভাবেই তাদেরকে দান করেছিলেন এক অভাবনীয় প্রশান্তি আর বর্ষণ করেছিলেন আকাশ থেকে তাদের ওপর তাঁর রহমতের বারিধারা

যাতে করে তাদেরকে এর দ্বারা পবিত্র করে দেয়া যায় এবং তাদের থেকে শয়তানী ওয়াসওয়াসাকে দূর করে দেয়া যায়, তাদের অন্তরগুলোকে বেঁধে দেয়া যায় এবং তাদের পা গুলোকে জমিয়ে দেয়া যায় ......আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সেই মহান সত্ত্বা– যিনি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা মোমেনদেরকে ভীষণ সমরক্ষেত্রে দৃঢ় করে রাখে এবং কাফেরদের অন্তরের মধ্যে প্রচন্ড ভয়ভীতি অনুভূতি এনে দেয়। আল্লাহ তায়ালাই সেই মহান সত্ত্বা, যিনি মুসলমানদের সাথে শরীক হয়ে বাস্তবে যুদ্ধ করার জন্যে ফেরেশতাদেরকে নিয়োগ করেছিলেন এবং ফেরেশতাদেরকে মোশরেকদের গর্দানের ওপর ও প্রত্যেক জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হানার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর মহান আল্লাহ তায়ালাই সেই সত্ত্বা যিনি তাদেরকে কাফেরদের পরিত্যক্ত মাল সম্পদ (গনীমতের মাল)-এর অধিকারী বানিয়েছিলেন এবং তাঁর নিজ মেহেরবানী দ্বারা তাদের সকল প্রয়োজন সেই কঠিন সময়ে মেটালেন, যখন তারা সহায় সম্বলহীন ও সরঞ্জামবিহীন অবস্থায় ছিলো।

এখন ..... দেখুন আল কোরআন তাঁর মেহেরবানীর এ সকল দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ধরে তাদের অন্তরের কাছে সত্যকে এমনভাবে পেশ করলেন যেন তারা নিষ্পলক নেত্রে এগুলোর দিকে তাকিয়েই রয়ে গেলো। আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদেরকে এমন চূড়ান্তভাবে সাহায্য করার দায়িত্ব নিলেন, যা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিলো না, যা করার জন্যে তিনি কোনো জনশক্তি, কোনো সংখ্যা বা অন্য কোনো সরঞ্জামের প্রস্তুতি পাঠাননি। তাদেরকে তিনি আল্লাহর মুখাপেক্ষী বানালেন, তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করতে শেখালেন, তাঁর সাহায্যের ওপর ভরসা করতে বললেন, তাঁর কাছেই আশ্রয় চাইতে উদ্বুদ্ধ করলেন, তাঁর কাছেই কাতর কণ্ঠে দোয়া করতে বললেন এবং তাকদীরের ওপর নির্ভর করে এগিয়ে যেতে হুকুম দিলেন।

এখন আসছে আর একটা দৃশ্য। দেখুন, কেমন করে সেদিকে নিষ্পলক নেত্রে মানুষ তাকিয়ে থাকে, অন্তর আবেশে ঝুঁকে পড়ে মুগ্ধ .... যে দৃশ্যে মোমেনদের অন্তরে এসব চমকপ্রদ পরিবেশে এক আবেগময় অনুভূতি পয়দা হয়– সে দৃশ্য হচ্ছে, কাফেরদের সাথে যখন তাদের সাক্ষাত হয়, তখন তারা দৃঢ় হয়ে যায়, পালিয়ে যাওয়ার মনোবৃত্তি নিয়ে অথবা পরাজয়ের অনুভূতি নিয়ে তারা দমে যায় না। নিশ্চিতভাবে তারা বিশ্বাস করে যে, জয় পরাজয় একমাত্র আল্লাহরই হাতে, কোনো মানুষের হাতে নয় এবং জয় পরাজয়ের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এমন কিছু ব্যবস্থা দান করেন যা মানুষ তাদের বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখতে পায় না এবং মোমেনদেরকে যুদ্ধে বিজয়ী করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নিজেই কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনিই মোমেনদের হাত দ্বারা কাফেরদেরকে হত্যা করেন। যখন তারা তীর নিক্ষেপ করে, তখন সে তীরকে যথাস্থানে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তিনিই বহন করেন। আর মোমেনদেরকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ হেফাযতে রেখেছেন, তাদেরকে তিনি নিজেই জেহাদের সওয়াব দিতে চান, বালা মুসীবতের মধ্যে তারা যে দৃঢ়তা দেখাবে তারও প্রতিদান তাদেরকে দেয়ার ব্যবস্থা তিনি রেখেছেন। অপরদিকে কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার তিনিই করেন এবং ওদের সকল চেষ্টাকে নিষ্ফল করে দিয়ে তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে তিনিই আযাব ভোগ করাতে চান– যেহেতু তারা আল্লাহ ও রসূলের বিরোধিতা করেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা, যখন তোমরা কাফেরদের সাথে সামনা সামনি সাক্ষাত করবে .... এবং আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে বানচাল করে দেন।' (১৫-১৮ আয়াত)

এখন কোরআনের ভাষায়, কাফেরদের প্রতি কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারিত হচ্ছে, শাস্তির ভয়াবহতা জানানো হচ্ছে আল্লাহর গযব ও দোযখের আগুনের বিবরণ দ্বারা। তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে,

হে ঈমানদাররা, যখন কাফেরদের মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে ....এবং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তন-স্থল। (আয়াত ১৫-১৬)

এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে, হে ঈমানদাররা, যখনই তোমরা কাফেরদের দিকে এগিয়ে যাবে, 'যাহফান' অর্থাৎ কাছে পৌছে যাবে, সামনা সামনি হবে এবং একে অপরকে কটমট করে দেখতে থাকবে, তখন তোমরা ভয়ে পালিয়ে যেয়ো না। যুদ্ধের পরিচালনা করার জন্যে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থানে গিয়ে হামলার উদ্দেশ্যে অথবা নিজ দলের সাথে (বিচ্ছিন্ন বা দলছুট হয়ে যাওয়ার অবস্থায়) মিলিত হওয়ার প্রয়োজন ছাড়া যুদ্ধের দিনে যদি কেউ পিঠ ফিরিয়ে চলে যাও, (পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো) ..... এভাবে যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, মোকাবেলার সময় দুশমনকে পিঠ দেখাবে, তারাই আল্লাহর কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে এবং তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নামের মধ্যে।

এই ফয়সালার সপক্ষে আরও কিছু কথা এসেছে, বিশেষ করে বদর যুদ্ধের মোজাহেদদের প্রসংগে অথবা সেই সব যুদ্ধ সম্পর্কে যেখানে রসূলুল্লাহ (স.) নিজে উপস্থিত থেকেছেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে এ কথাটা সবার জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। আর যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া প্রধান ও ধ্বংসাত্মক সাতটি কবীরা গুনাহের অন্যতম। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, রসূলাল্লাহ (স.) বলেছেন, 'সাতটি ধ্বংসাত্মক গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো।' বলা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ, সেগুলো কী? বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, জাদু করা, সঠিক কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা, যার প্রাণকে আল্লাহ তায়ালা মর্যাদাবান (হারাম) করেছেন, তবে ন্যায্য ও যুক্তিসংগত কারণ থাকলে সে ভিন্ন কথা (সেখানেও ব্যক্তিগত ফয়সালা অনুযায়ী নয়। তবে আক্রান্তাবস্থায় আত্মরক্ষার্থে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার সময় কেউ নিহত হলে সে এজন্যে দায়ী হবে না), সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা এবং সতী নারীর ওপর মিথ্যা দুর্নাম রটানো।' আল জাসসাস তাঁর রচিত 'আহকামুল কোরআন' নামক কেতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন- যাতে এক পর্যায়ে বলা হয়েছে, সঠিক কোনো কথা জানা থাকলে ভিন্ন কথা। অর্থাৎ প্রয়োজনে কাউকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বলে দেয়াতে কোনো অসুবিধা নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদের পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যাবে (সে আল্লাহর আক্রোশের ভাগী হবে) তবে যুদ্ধের কৌশলের জন্যে, অথবা কোনো দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পিঠ ফেরাতে হলে সেটা ভিন্ন কথা।'

আবু নাদরা আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বদর যুদ্ধের দিনেই এ কথা নাযেল হয়েছে। আবু নাদরা বলেন, সেদিন যেহেতু মোশরেকদের দল ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম দল ছিলো না, এ জন্যে মুখ ফিরিয়ে কোনো দলে যোগ দিতে হলে একমাত্র মোশরেকদের দলেই যোগ দেয়া যেতো। আমরা যেভাবে বুঝেছি, তাতে এ কথাটা ভুল মনে হয়। আরও এক বর্ণনায় এসেছে, সে (বদরের) দিন দলছুট হওয়া বা অন্য কোনো দলের সাথে যোগ দেয়ার জন্যে পিঠ ফেরানো জায়েয ছিলো না, যেহেতু মুসলমানরা সবাই সেদিন রসূল (স.)-এর সাথে থেকেই যুদ্ধ করছিলেন। অতএব তাঁর থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া সেদিন কারো জন্যে জায়েয ছিলো না। আল্লাহ বলছেন, 'আল্লাহর রসূল থেকে ভিন্ন মত পোষণ করা সেদিন কোনোভাবেই মদীনাবাসী বা মদীনার উপকণ্ঠের বাসিন্দাদের জন্যে বৈধ ছিলো না। এটাও তাদের জন্যে সত্য যে, রসূলুল্লাহ (স.) থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াও বৈধ ছিলো না।'

এতে বুঝা গেলো, তাদের পক্ষে তাদের নবীকে অপদস্থ করা কিছুতেই জায়েয ছিলো না।' অর্থাৎ তাঁর থেকে সরে গিয়ে অথবা কাফেরদের হাতে তাঁকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে পেছন দিকে চলে যাওয়া তাদের জন্যে কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না। যদিও এটা অবশ্য সত্য যে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন এবং সকল মানুষের দৌরাত্ম্য থেকে তাঁকে রক্ষা করার দায়িত্ব তিনি নিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'আর অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে রক্ষা করবেন মানুষ (-এর অনিষ্ঠ) থেকে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স.)-এর সংগে দৃঢ়তার সাথে টিকে থেকে যুদ্ধ করা ছিলো তাদের জন্যে ফরয, তাদের দুশমন কম-বেশী যাই হোক না কেন। আর এ কারণেও বটে যে, রসূল (স.) মুসলমানদের জন্যে নিজে একাই ছিলেন একটি দলের মতো। আর যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রয়োজন কেউ বোধ করলে তাও কিছু শর্তের সাথে জায়েয আছে। অর্থাৎ তার সরে যাওয়া হবে কোনো দলের দিকে। আর সেদিন তাদের দল বলতে রসূলুল্লাহ (স.)ই ছিলেন তাদের একমাত্র দল। তিনি ছাড়া তাদের জন্যে আর কোনো দল ছিলো না।

ইবনে ওমর (রা.) বলেন, 'আমি একটি বাহিনীতে ছিলাম। তখন বিরোধীরা একযোগে আমাদের ওপর হামলা করলো। আমরা গত্যন্তর না দেখে মদীনার দিকে ফিরে এলাম। তখন আত্ম পর্যালোচনা করতে গিয়ে মনে হলো আমরা পলাতক হয়ে গিয়েছি। সেজন্যে অপরাধী মন নিয়ে রসূল (স.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমরা পলাতক হয়ে গিয়েছি (এখন কী হবে?)। তখন রসূল (স.) আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বললেন, 'আমিই তোমাদের (একমাত্র) দল এবং আল কোরআনে কোনো দলের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্যে যে অনুমতির কথা বলা হয়েছে, তার আওতায় অবশ্যই তোমরা পড়ে গিয়েছো। সুতরাং তোমরা বিপথগামী হও নাই।' তবে যে ব্যক্তি নবী (স.) থেকে দূরে সরে গিয়ে অন্য দলে ভিড়বে, সে-ই কাফেরদের থেকে পলাতক বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং, এটা প্রমাণ হয়ে গেলো যে, নবী (স.)-এর দলের দিকে ফিরে যাওয়া অবশ্যই জায়েয।

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা নবী (স.)-কে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছেন, মুসলমানরা হয়েছে তাঁর সহযোগী। কোনো সময়ে যুদ্ধ করতে করতে ও শত্রুকে ধাওয়া করতে করতে যদি নবী (স.) থেকে তারা দূরে চলে যায় এবং পরবর্তীতে যে কোনো সময় যদি শত্রু বাহিনী শক্তি সঞ্চয় করে ও সম্মিলিত হয়ে পাল্টা আক্রমণ করে, সে অবস্থায় পিছিয়ে এসে নবী (স.) এবং তাঁর অবর্তমানে মূল বাহিনীর দিকে যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে তা কোনো অপরাধজনক কাজ বলে বিবেচিত হবে না। কিন্তু তারা ছাড়া ময়দানে মুসলমানদের দোসর অন্য কোনো দল যদি না থাকে, সে অবস্থায় পেছন ফিরে দিকবিদিক জ্ঞানহারা অবস্থায় পালানোর মতো ছুটোছুটি করা কিছুতেই বৈধ হবে না।

আল্লাহর ঘোষণা, 'আর যে ব্যক্তি সেদিন পেছন ফিরে পালাবে'– এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাসান বলেছেন, 'আমি বদরবাসীদের প্রতি খুব কড়াকড়ি করলাম, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে যে দুটো দল সেদিন ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো, সেই কঠিন দিনে যেদিন দুটো যোদ্ধা দল পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিলো, সে দিন অবশ্যই মরদূদ শয়তান তাদের কিছু ভুল কাজের দরুন তাদের পা পিছলে দিয়েছিলো'। আর তাদের এ অবস্থা এই জন্যেই হয়েছিলো যে, তারা নবী (স.) থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো।

আর এভাবে হোনায়ন যুদ্ধের দিনেও তারা নবী (স.)-কে ঘিরে না রেখে দূরে সরে গিয়েছিলো, যার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এমন শাস্তি দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর এতো প্রশস্ততা থাকা সত্তেও তাদের জন্যে তা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। এ দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বহু স্থানে সাহায্য করেছিলেন এবং হুনায়নের দিনেও যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য খুশী করে ফেলেছিলো; কিন্তু এ সংখ্যাধিক্য (দুঃসময়ে) কোনোই কাজে লাগেনি। আর পৃথিবীর এতো প্রশস্ততা সত্তেও তোমাদের কাছে এ পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, এরপর তোমরা পেছন ফিরে পালিয়ে গিয়েছিলে।' ......

যখন তারা নবী (স.)-এর সাথে ছিলো, তখন তাদের সম্পর্কে এটাই ফয়সালা ছিলো। সেনাবাহিনী ছোটো হোক বা বড় হোক, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক না থাকলে তাদের অবস্থা একই প্রকার হবে। আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেছেন,

'হে নবী, মোমেনদেরকে যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করো, যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন থাকে ধৈর্যধারণকারী অবিচল, যোদ্ধা তাহলে তারা দু'শ জনের ওপর জয়লাভ করবে, আর এক'শ জন থাকলে কাফেরদের হাজার জনের ওপর তারা বিজয়ী হবে।'

আর এই হচ্ছে তাদের বাস্তব অবস্থা এবং আল্লাহ তায়ালাই সকল অবস্থা ভাল জানেন। আর যে সময়ে নবী (স.) তাদের সাথে উপস্থিত না থাকেন সে অবস্থাতেও তাদের বিশজনও যদি থাকে, তাহলে তারা দুশ জনের ওপর জয়লাভ করবে এবং কেউ পালিয়ে যাবে না। কিন্তু দুশমনদের সংখ্যা এর অধিক হলে তাদের জন্যে অন্য কোনো মুসলিম দলের সাথে যোগ দেয়ার জন্যে যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে যাওয়া জায়েয আছে। সেখানেই যুদ্ধের ময়দানে পুনরায় আসার জন্যে খোদ আল্লাহর পক্ষ থেকেই সাহায্য নেমে আসবে।

এরপর আল্লাহর অন্য আয়াত দ্বারা এ আয়াতের কার্যকারিতা নাকচ হয়ে গিয়েছিলো। এখন আল্লাহ তায়ালা আমাদের থেকে (দুশমনদের আক্রমণের) বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে (পূর্বের তুলনায় অনেক) দুর্বলতা রয়েছে ....আল্লাহর হুকুমে দু হাজারের ওপর জয়লাভ করবে।' (৬৬ -আয়াত)

অতপর ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, তোমাদের ওপর এটা বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে যে, শত্রুদের তুলনায় তোমরা যদি প্রতি দশ জনে একজনও থাকো, তবু খবরদার পালাতে পারবে না (অর্থাৎ পালাবার অনুমতি নেই)। তারপর অবশ্য এই সংখ্যাটা হালকা করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, এখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন এবং জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।' (আয়াতের শেষ অবধি দেখুন)। অতপর পরবর্তীকালের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এটা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন যেন একশ জন দু'শ জনকে দেখে ভয়ে না পালায়।

ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেন, কোনো এক ব্যক্তি যদি দুজনের ভয়ে পালায়, তাহলেই পালানো হলো, কিন্তু একজনের প্রতিপক্ষে তিনজন থাকলে তাদের ভয়ে পালালে সেটাকে পালানো বলে গণ্য করা হবে না। 'সে পালিয়ে গেছে বলে গণ্য হবে'– এ কথার ব্যাখ্যায় শেখ সাহেব (সম্ভবত ইবনে আব্বাস) বলেন, আয়াতের মধ্যে 'প্রতিপক্ষ বাহিনী থেকে পালানোর' অর্থ হচ্ছে এক ব্যক্তির জন্যে কাফেরদের দু'ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করা যে ফরয– এ কথা মেনে নেয়া। অবশ্য অনুপাত দুইয়ের বেশী যদি কাফেরদের সংখ্যা হয়, তাহলে যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই কোনো মুসলমান যোদ্ধা দলের সাথে মিলতে পারবে– সেখানেই তার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য থাকবে। কিন্তু যদি যোদ্ধা দল মুসলমান কোনো জনগোষ্ঠীর কাছে আশ্রয় পাওয়ার জন্যে এগিয়ে যায়, তাহলে তাদের সাথে আল্লাহর কোনো সাহায্য থাকবে না। বরং সেখানে ওপরে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে!

'আর যে ব্যক্তি সেদিন পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যাবে .... সে আল্লাহর আক্রোশে পতিত হবে'। (আয়াত-১৬)

এ জন্যেই নবী (স.) বলেছেন, 'আমি প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে এক যোদ্ধা দল'। আর ওমর (রা.)-এর কাছে যখন খবর এলো যে, আবূ ওবায়েদ ইবনে মাসউদ যুদ্ধে যোগদান করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করে অবশেষে শহীদ হয়েছেন, কিন্তু তবু পরাজয় স্বীকার করেননি, তখন তিনি বলে উঠলেন, আবু ওবায়েদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা রহম করুন! সে যদি আমার কাছে যুদ্ধের জন্যে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে ময়দান থেকে চলে আসতো, তাহলে আমি (খলীফা হিসাবে) তার জন্যে 'যোদ্ধা দল' হিসেবে পরিগণিত হতাম। তারপর যখন আবূ ওবায়েদের সংগী সাথীরা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট পৌছলেন, তখন তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'আমিই তোমাদের জন্যে 'যোদ্ধা দল' এবং এরপর তাদের ওপর তিনি কোনো কড়াকড়ি করলেন না। আমরাও এ বিষয়টা সম্পর্কে এই ফয়সালা দেয়াটাই সঠিক মনে করি যে,, মুসলমান সৈন্যদের সংখ্যা বার হাজার না হওয়া পর্যন্ত তাদের জন্যে তাদের দ্বিগুণের কাছে পরাজয় স্বীকার করা জায়েয নেই। তবে যুদ্ধের কৌশলের জন্যে তারা ময়দান ছাড়তে পারে। অর্থাৎ, এ হচ্ছে শত্রুকে বাধা দানের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ কৌশল হিসাবে একস্থান হতে অন্যস্থানে সরে যাওয়া এবং এ অবস্থায় তারা অনুরূপ পদক্ষেপ নিতে পারবে। তবে তার উদ্দেশ্য হতে হবে শত্রুকে ধোকা দেয়া এবং যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। বরং অন্য কোনো মুসলিম যোদ্ধা দলের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করা, যেন তারা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করতে পারে। তারপর যখন তাদের (মুসলমানদের) সংখ্যা বারো হাজারে পৌঁছে যাবে মোহাম্মদ ইবনে আবুল হাসানের মতে তখন আর তাদের দুশমনদের সংখ্যাধিক্যের ভয়ে পালানো জায়েয থাকবে না।

এ বিষয়ে আমাদের লোকজনের মধ্যে কোনো মতভেদ আছে বলে উল্লেখ করা হয়নি। এবং এ ব্যাপারে ইমাম যুহরী থেকে আনীত উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর বরাত দিয়ে একটা হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, সর্বোত্তম সংগী চারজন, ছোট বাহিনীর মধ্যে সর্বোত্তম চারশত এবং সর্বোত্তম সেনাবাহিনী হচ্ছে চার হাজার আর বার হাজার সেনা বাহিনীকে কখনও কম মনে করা হবে না এবং এরা কখনও পরাজিত হবে না।

অন্য হাদীসে আছে, বারো হাজার সৈন্যবাহিনী যতোক্ষণ পর্যন্ত একতাবদ্ধ ও একমত থাকবে, ততোদিন তাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। তাহাবী বলেন (তাঁকে) হযরত মালেক (র.) বলেছেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে ব্যক্তি যুদ্ধের সময়ে মতভেদ করলো, সে কি আল্লাহর হুকুম আহকাম থেকে বেরিয়ে যায়নি অথবা আল্লাহর হুকুম বহির্ভূত কাজ করলো না? তখন মালেক (র.) বললেন, তোমার মতো ব্যক্তিদের নিয়ে বারো হাজারের এক সেনাদল যতোক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবে, ততোক্ষণ কেউ বিরোধিতা করবে না, আর বিরোধিতা করেও কেউ সুবিধা করতে পারবে না। যিনি এ কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর। এ মতটি হচ্ছে মোহাম্মদ ইবনে হাসানের মতেরই অনুরূপ। এই মোহাম্মদ ইবনে হাসান রসূলুল্লাহ (স.) থেকে বারো হাজার বাহিনী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এই আলোচ্য বিষয়ের আসল কথা হচ্ছে, মোশরেকদের সংখ্যা ময়দানে বেশী হলেই যে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে আসতে হবে এটা তাদের জন্যে জায়েয নয়, তা সংখ্যায় তারা যতো বেশীই হোক না কেন। যেহেতু রসূল (স.) বলেছেন, 'যদি তারা একতাবদ্ধ থাকে।' সুতরাং এ পর্যায়ে বোঝা যাচ্ছে, একতাই আসল কথা .....।

এই ইবনুল আরাবীও তাঁর রচিত 'আহকামুল কোরআন' নামক কেতাবে মতভেদ সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

লোকেরা এ বিষয়ে নানা প্রকার কথা বলেছে। বিষয়টা হচ্ছে 'বদর যুদ্ধে শত্রুর মুখোমুখি হওয়া কালে পালানো সম্পর্কেই কি এই নিষেধাজ্ঞা এসেছে? না কেয়ামত পর্যন্ত পলায়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে?'

এ বিষয়ে আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত যে, হাঁ এটা বদর যুদ্ধ সম্পর্কিতই। তখন রসূলুল্লাহ (স.)-এর যুদ্ধ-বাহিনী ছাড়া আর কোনো বাহিনী ছিলো না। নাফে', হাসান, কাতাদা, যায়ীদ ইবনে হাবীব ও যাহহাক-এরা সবাই এই একই মত পোষণ করেন। অপরদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সকল ওলামার মতে, এ কথাটা কেয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানের জন্যেই প্রযোজ্য। আর যারা এ মতের বাইরে অন্য মত পোষণ করেছেন, বলেছেন যে- এ কথাটা শুধু বদর যুদ্ধের মোজাহেদদের জন্যেই খাস করে বলা হয়েছে, তারা সম্ভবত কোরআনের এই আয়াত থেকে দলীল নিয়েছেন, 'আর যে কেউ সেদিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।' এ আয়াত থেকে একদল লোক বদর যুদ্ধের দিনকে বুঝেছেন- আসলে এটা ঠিক নয়। এ আয়াত দ্বারা সকল সম্মুখ সমরই বুঝানো হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রমাণ হচ্ছে, আয়াতটা নাযিলই হয়েছে যুদ্ধের পরে এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনার পরিসমাপ্তিতে এবং রসূল (স.) থেকেই এ বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। বিশুদ্ধ একটা হাদীস থেকে আমরা চূড়ান্তভাবে যে কথাটা ইতিমধ্যেই জেনেছি তা হচ্ছে, কবীরা গুনাহ সম্পর্কে গুনে গুনে কয়েকটা বলা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে মুখোমুখি যুদ্ধ থেকে পালানোও একটা। কোরআনের এই আয়াতটার দিকে খেয়াল করলে মতভেদ দূর হয়ে যায় এবং সিদ্ধান্তও স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটাই ওই বিশেষ বিষয়টা বুঝতে সহায়তা করেছে, যাতে মনে করা হয় যে, শুধু বদর যুদ্ধের ব্যাপারেই আয়াতটা বিশেষিত।

এ ব্যাপারে ইবনুল আরাবী যে মত পোষণ করেছেন আমরা ওটাকেই ভাল মনে করি। কারণ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সকল ওলামাও ওই মতের অনুসারী অর্থাৎ যে কোনো সম্মুখ যুদ্ধ থেকে পালানো, যেহেতু চিরদিনের জন্যে এটা যেমন গর্হিত কাজ, তেমনি আল্লাহর ওপর তায়াক্কুলের পরিপন্থী ব্যবহারও বটে।

মোমেনের অন্তর অবশ্যই মযবুত হতে হবে এবং আল্লাহ তায়ালার শক্তি ক্ষমতার ওপর পুরোপুরিই আস্থাশীল হতে হবে। সে কখনও পার্থিব কোনো শক্তিকে বড় মনে করবে না- একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকেই সে সাহায্যের জন্যে রুজু করবে, যেহেতু তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর পুরোপুরি ক্ষমতার মালিক। যা ইচ্ছা তিনি করতে পারেন-এতে বাধা দেয়ার মতো কোনো ব্যক্তি বা কোনো শক্তি নেই। আর যখনই কোনো অন্তরে পরাজয় মেনে নেয়ার প্রবণতা এসে যাবে, তখনই সে বিপদে পড়বে। অন্তর নড়বড়ে হয়ে গেলেই যে পরাজয় মেনে নিতে হবে এবং পালিয়ে যেতে হবে, এটা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। সকল কাজের পরিণতি তো আল্লাহরই হাতে। সুতরাং প্রাণের ভয়ে কোনো মোমেনের পক্ষে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো কিছুতেই বৈধ হতে পারে না। আর এভাবে সাহস করা যে তার সাধ্যের একেবারে বাইরে তাও নয়। মোমেন ব্যক্তি তো মানুষ এবং সে শত্রুপক্ষের কোনো মানুষেরই তো মোকাবেলা করবে, আর তারা তো একই দেশের মানুষ! এরপর একজন মোমেন তার বিপক্ষীয় মানুষটার ওপর অবশ্যই এ জন্যে প্রাধান্যের অধিকারী, যেহেতু সে সম্পৃক্ত মহাশক্তিমান আল্লাহর সাথে, যাঁর শক্তিকে কেউ নাকচ করে দিতে অথবা পর্যুদস্ত করতে পারে না। এরপর শেষ কথা হচ্ছে যে, যদি জীবিত থাকে সে তো আল্লাহর দিকেই ফিরে যাবে, আর শাহাদাত লাভ করলেও আল্লাহরই কাছে সে ফিরে যাবে। সর্বাবস্থায় সে তার বিপক্ষীয় ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য ও শক্তিশালী। যেহেতু ওই বিরোধী ব্যক্তি বা শক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী আর এই কারণেই এই চূড়ান্ত ফয়সালা এসেছে।

'আর যে সেদিন পেছন দিকে ফিরে যাবে ...... তাদের ঠিকানা জাহান্নাম ও নিকৃষ্ট সে ফিরে যাওয়ার জায়গা।' (আয়াত-১৬)

'তোমরা পেছন ফিরে পালিয়ে যেয়ো না'-আয়াতের এই অংশটুকুর অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই একটু গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে, দেখতে হবে এর মধ্যে কোন বিশেষ ইংগিত দেয়া হয়েছে। এই পেছন ফিরে পালানোর কথাটার মধ্যে পরাজয় বরণ করার প্রশ্ন আসে, অর্থাৎ পরাজয়ের মনোভাব নিয়েই তো মানুষ পালায়। দুশমনের ভয় যখন মানুষকে পেয়ে বসে, আত্মবিশ্বাস যখন নষ্ট হয়, সাহসহারা হয়ে যায় এবং অপমানের জীবন যখন কবুল করার জন্যে মানুষ প্রস্তুত হয়ে যায়, তখনই পেছন ফিরে পলায়নের মনোবৃত্তি জেগে যায়..... আর এই অবস্থার জন্যেই 'আল্লাহর আযাবের দিকে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন আসে। সুতরাং পরাজিত ব্যক্তি পলাতক হয়, আর এর সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসে চূড়ান্ত গযব। এই গযব তাকে নিয়ে যায় তার শেষ আশ্রয় স্থল জাহান্নামে আর নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তন-স্থল।

আর এ ভাবে আয়াতের ব্যাখ্যায় একথা আসে যে, সম্মুখ সমরে পলায়নের মধ্যে মানসিক পরাজয়ের গ্লানি, অপমান ও হীনতা রয়েছে।

মোমেনদের পক্ষে আল্লাহর সাহায্য সুনিশ্চিত

এরপর, সামনা সামনি যুদ্ধের সময়ে যারা পালিয়ে যায়, তাদের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার পর আল্লাহর সাহায্যের বিবরণ আসছে, যা পেছন থেকে যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দেয়, তাদের দুশমনদের হত্যা করা হয় এবং তাদের পক্ষ থেকে তীর ছোঁড়া হয় ও সে তীরগুলো আল্লাহর ইচ্ছাতেই জায়গা মতো পৌঁছে দেয়া হয়। উপরন্তু, বিপদের ঝুঁকি নেয়ার কারণে তারা ন্যায্য পুরস্কার পায়। কারণ আল্লাহ তায়ালা এ বিপজ্জনক পরীক্ষার মাধ্যমেই তাদেরকে মহান মর্যাদা দান করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজ মেহেরবানীতেই তাদেরকে এই মর্যাদা দেন।

এরশাদ হচ্ছে, এটাই সত্য কথা, 'তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে হত্যা করেছেন .... নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সঠিকভাবে সবকিছু শোনেন এবং জানেন।' (১৭-আয়াত)

'রাময়ুন'-নিক্ষেপণ শব্দটির ব্যাখ্যায় হাদীস শরীফে বেশ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এখন দেখতে হবে, কোন বর্ণনাটা এ প্রসংগে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক নিক্ষেপণ তো রসূলুল্লাহ (স.)-এর হাতে হয়েছে- যখন তিনি 'শাহাতিল উজুহ'- 'শাহাতিল উজূহ' বলে মোশরেকদের দিকে কাঁকর ছুঁড়ে মেরেছিলেন- (এ অর্থ হতে পারে)। এতে সেই মোশরেকদের চেহারাগুলো বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো, যাদের নিহত হওয়ার সিদ্ধান্ত আল্লাহ তায়ালা পূর্বাহ্নেই গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর জ্ঞানেই এটা ছিলো। এ আয়াতটাকে সাধারণভাবে সবখানে সমানভাবে প্রয়োগ করা যায়। নবী (স.) ও তাঁর সাথের মুসলিম বাহিনীর যে সব বাহ্যিক কাজ ও তৎপরতা ছিলো, তার বাইরে ছিলো আল্লাহর এক তদবীর- যা ফুটে উঠেছে এই আয়াতটিতে। এ জন্যে আল্লাহর কথা পেশ করতে গিয়ে আয়াতটি জানাচ্ছে, বলা হচ্ছে,

'এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে সুন্দরভাবে পরীক্ষা করে নিতে চান।'

অর্থাৎ, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে রেযেক দান করবেন, তাদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবেন। এখানে সুন্দরভাবে তাদের পরীক্ষা হয়ে যায় এবং এ পরীক্ষায় তাদেরকে পাস করানোর পর তারা বিজয় লাভ করে উত্তম পুরস্কার পায়। এটিই হচ্ছে তাদের জন্যে বহুগুণে বর্ধিত মর্যাদা, যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের জন্যেই নির্ধারিত রয়েছে।

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবকিছু যথাযথভাবে শোনেন ও জানেন।'

তিনি তোমাদের কাতর কণ্ঠের মিনতি শোনেন, আর তিনি তোমাদের অবস্থাগুলোকে জানেন। আর তিনিই তাঁর ক্ষমতা বলে তাদের জন্যে নিরাপত্তা বেষ্টনী বানিয়ে রেখেছেন। এটা কোনো এক বিশেষ সময়ের জন্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যখনই আল্লাহর বান্দারা তাঁর জন্যে নিষ্ঠার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে কোনো বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে, তখনই তাঁর পক্ষ থেকে এসব নিরাপত্তা আসবে, তিনি তাদের সাক্ষাত বিজয় ও নেক প্রতিদান দেবেন, যেমন করে দিয়েছিলেন বদর যুদ্ধের দিনে।

হাঁ, তাই হবে, (যা আল্লাহ চান) এবং আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র বানচালকারী।

প্রথম বিজয়দানের পরে পরবর্তীতে আল্লাহ প্রদত্ত দ্বিতীয় বিজয় হচ্ছে কাফেরদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়া এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করা। তোমাদের হত্যা করার পর আল্লাহর তদবীর শেষ হয়ে যায়নি, তাদেরকে তোমাদের রসূলের নিক্ষেপণ দ্বারা বিপদে ফেলে দিয়েছেন, আর তোমাদেরকে চমৎকার এক পরীক্ষায় ফেলেছেন যেন তিনি তোমাদেরকে এই পরীক্ষায় পাস করিয়ে সুন্দর প্রতিদান দেন....... আর তোমাদের এই পুরস্কারপ্রাপ্তিতে কাফেরদের মধ্যে অপমানের অনুভূতি আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে, নস্যাৎ হয়ে যাবে তাদের যাবতীয় চক্রান্ত ও পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনাসমূহ। সুতরাং তখন আর কোনো ভয়ের কারণ থাকবে না, বা পরাজয়েরও আর কোনো আশংকা থাকবে না এরপর কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হওয়ার সময় পেছন ফিরে পালানোরও আর কোনো প্রয়োজন হবে না।.......

এরপর পর্যায়ক্রমে যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সবগুলো বিষয় সম্পর্কেই আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাই মোশরেকদের কতল করেছেন। তিনিই তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেছেন। তিনিই মোমেনদেরকে কঠিন এক বিপদের মধ্যে ফেলে তাদেরকে পরীক্ষা করেছেন। আর তিনিই কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এই যখন অবস্থা তখন যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে শত্রু-পরিত্যক্ত সম্পদের ব্যাপারে ঝগড়া হবে কেন? যুদ্ধ তো পুরোটাই পরিচালিত হয়েছে আল্লাহর তদবীর ও পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা মতে। মুসলমানরাও এই তদবীর এবং পূর্ব নির্ধারিত ও স্থিরীকৃত পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরাপত্তা পেয়েছে!

আলোচনা প্রসংগে যখন এই প্রতিবেদন পেশ করা হলো যে, আল্লাহ তায়ালাই কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎকারী, তখন কাফেরদের দিকে সম্বোধনের গতি ফিরে গেলো। তারাই তো যুদ্ধের পূর্বে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করেছিলো যে, দুটি দলের মধ্যে যারা অধিক পথভ্রষ্ট, তাদের ওপর যেন ধ্বংস নেমে আসে। যে অজানা অচেনা মত পথ নিয়ে এসেছে এবং যারা দেশবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং যারা আত্মীয়স্বজনের সম্পর্কের বন্ধন কেটে দিয়েছে, তারা যেন বিপর্যস্ত হয়ে যায়, যেমন আবু জাহল বিজয় ও চূড়ান্ত ফয়সালার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলো । অতপর মোশরেকদের ওপরেই বিপর্যয় নেমে এলো ....। তখন তির্যকভাবে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সম্বোধন করা হয়েছে এবং বিদ্রূপাত্মক ভাষায় তাদের বিজয়ের জন্যে দোয়া করার কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে একথাটাই তুলে ধরা হয়েছে যে, বদর যুদ্ধ ও তার ফলাফল কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, নয় এটা এলোমেলো কোনো বিপদ, এটা প্রচলিত চিরন্তন নিয়ম। বরং তা হচ্ছে তাদের দোয়ার ফল ও পূর্ব নির্ধারিত এক অমোঘ ফয়সালা। জানানো হয়েছে, তাদের সম্মিলিত বাহিনী ও তাদের সংখ্যাধিক্য তাদের কোনো কাজে লাগেনি। কারণ তা ছিলো চিরাচরিত অমোঘ নিয়মের ধারাবাহিকতা মাত্র। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে,

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসীদের সাথে আছেন।' বলা হয়েছে,

'তোমরা বিজয় চেয়েছিলে সুতরাং বিজয় এসে গেছে। এখন যদি তোমরা থেমে যাও, তাহলে এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে। আর তোমরা যদি আবার ফিরে আস, আমরাও ফিরে

আসবো। আর (খেয়াল করে দেখো) তোমাদের যোদ্ধা দল, যদিও তারা সংখ্যায় অধিক ছিলো, কিন্তু তারা তোমাদের কোনো কাজে লাগেনি কারণ আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মোমেনদের সাথে আছেন।'

অর্থাৎ, তোমরা যখন বিজয় চেয়েছিলে, তখন তোমরা আল্লাহর কাছে এই বলে দরখাস্ত করেছিলে, যেন তিনি তোমাদের ও মুসলমানদের মধ্যে চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেন এবং দুটো দলের মধ্যে যারা বেশী বিপথগামী এবং অধিক আত্মিয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী তাদেরকে যেন ধ্বংস করে দেয়া হয়! আর প্রকৃতপক্ষেই যদি তোমরা জানতে চেয়ে থাকো– দুটো দলের মধ্যে কে অধিক পথভ্রষ্ট এবং কে অধিক সম্পর্ক ছিন্নকারী– তা অবশ্যই তোমরা ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছো!

এই সত্যের আলোকে এবং এই প্রাণবন্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে অবশেষে তাদেরকে শেরক ও কুফর এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করতে বারণ করা হচ্ছে এরশাদ হচ্ছে,

'যদি থেমে যাও, তাহলে তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হবে।'

আর উৎসাহ দিতে গিয়ে এবং ভীতি প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে,

'আর যদি তোমরা ফিরে আসো, আমরাও ফিরে আসবো।'

এই পরিণতি তো সবার কাছে সুপরিচিত, যা কোনো জনসমষ্টিই পরিবর্তন করতে পারে না। আর এ পরিণতি কোনো সংখ্যাধিক্য বদলে দিতে পারে না। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তোমাদের যোদ্ধাদের এতোবড় সমাবেশ তোমাদের কোনোই কাজে লাগেনি– যদিও সংখ্যায় ছিলো তারা অনেক বেশী।'

আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজেই যখন মোমেনদের সাথে রয়েছেন, তখন তাদের সংখ্যা যাই হোক না কেন, তাতে কী আসে যায়! আল্লাহ পাক নিজেই বলছেন,

'আর আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মোমেনদের সাথে আছেন।'

এ যুদ্ধ কখনও সমান সমান দুটো দলের যুদ্ধ হতে পারে না। কারণ একদিকে রয়েছে মোমেন দল এবং তাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজে সবাই তারা এক সারিতে। অপরদিকে রয়েছে কাফের দল– তাদেরই মতো ওই অবিশ্বাসী ও দুনিয়ালোভী কিছু লোক ছাড়া তাদের সাথে আর কেউ নেই– আর এ যুদ্ধের ফলাফল কী হবে, তাও পূর্ব থেকে নির্ধারিত রয়েছে!

শুধু বিশ্বাস করলেই ঈমানদার হওয়া যায়না

অবশ্যই আরবের মোশরেকরা এই কঠিন সত্যটা বুঝতো। আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা সম্পর্কে তাদের চেতনা পুরোপুরি চাংগা ছিলো– সে জ্ঞান যে নেহাৎ কম বা ভাসাভাসা বা একেবারে গোপন ছিলো তা ও নয়, আজকের মানুষেরা তাদের সেসব ইতিহাসের অনেক ঘটনা। জানতে পারে। আরব লোকদের শেরেকের অর্থ এ ছিলো না যে, তারা আল্লাহকে অস্বীকার বা তারা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিলো না। তাদের যে অবস্থাটা জানা যায় তা হচ্ছে এই যে, তারা একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে– এ কথাটা মানতো না। এর প্রধান কারণ ছিলো এই যে, তাদের বাস্তব জীবনের নিয়ম কানুন সবই ছিলো তাদের নিজেদের মনগড়া, স্বরচিত অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের রচিত। আর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানার ব্যাপারে তাদের মধ্যে ছিলো নানা মত ও পথ। সত্য সঠিক কোনো বিষয় মানার ব্যাপারেও ছিলো তারা দ্বিধা বিভক্ত। ওই সময়ের ইতিহাসে পাওয়া যায়, খাফফাফ ইবনে আয়মা ইবনে রহদত আল গাফফারী, অথবা তার পিতা আয়মা ইবনে রহদত আল গাফফারী মক্কার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কোরায়শদের কাছে তার দুজন ছেলেকে হাদিয়া স্বরূপ কিছু যবাইয়ের পশু সহ পাঠালো এবং তাদেরকে বলে পাঠালো যে, আপনারা চাইলে আমরা আপনাদেরকে যুদ্ধের সরঞ্জাম ও কিছু যোদ্ধা দ্বারা সাহায্য

করবো। তখন কোরায়শবাসীরা তাদের পক্ষ থেকে তার ছেলের সাথে কিছু উপহার পাঠিয়ে দিয়ে তাকে বলে পাঠালো', আত্মীয়তার প্রতি দয়া সহানুভূতির কসম! তুমি সাহায্য দানের যে ফয়সালা করেছিলে সেটা তোমার ব্যাপার। তবে আমাদের জীবন ও বয়সের কসম, আমরা যদি কোনো জনপদের সাথে যুদ্ধ করি তো সে ব্যাপারে আমাদের কোনো দুর্বলতা নেই। কিন্তু যদি আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার প্রশ্ন আসে– যেমন মোহাম্মাদ মনে করে– সে ব্যাপারে বলবো, আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার কোনো ক্ষমতা আমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তির নেই।'

এমনি করে বনী যোহরা সম্পর্কে আখনাস ইবনে শুরায়েক–এর কথা আমরা জানতে পেরেছি। সে নিজে মোশরেক এবং যাদেরকে কথাটা বলেছে তারাও মোশরেক! হে বনু যুহরা, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে তোমাদের সম্পদকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, আর তোমাদেরকে তোমাদের সংগী ইবনে নওফল কমলিওয়ালা রেহাই দিয়েছেন.... (শেষ অবধি)। আর তার উদাহরণ দিতে গিয়ে আবু জাহল নিজেই বলেছে, (রসূলুল্লাহ (স.) তার সম্পর্কে বলেছেন যে) সে এ জাতির জন্যে এক ফেরাউন। সে বলেছিলো যে, আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছি। আর সে এমন একটা ধর্ম নিয়ে এসেছে, যা আমাদের মধ্যে কেউ জানে না। সুতরাং তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরবর্তী ভোর বেলায় এক চরম শাস্তির নিকটবর্তী করে দিলো।'

এমনি করে সে হাকীম ইবনে হেযামকেও বলেছিলো, যখন তার কাছে ওতবা ইবনে রবীয়ার একজন দূত এলো, উদ্দেশ্য ছিলো তাকে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। সে বলেছিলো 'না, কখনই না, আল্লাহর কসম, আমরা কিছুতেই ফিরবো না যতোক্ষণ না আমাদের ও মোহাম্মদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যায়!'

এই ছিলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা এবং এই বিশ্বাসটাই তাদের ব্যবহার, কার্যকলাপ বা কথার মধ্যে ফুটে উঠতো। তারা আল্লাহকে চিনতো না এমন নয়। আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতার মতো আরও শক্তি আছে এটাও তারা মনে করতো না। আর তিনিই বিচার ফয়সালার একমাত্র অধিকারী এবং তাকদীরের ফয়সালার একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর এটাও যে তারা মানতো না, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে এরা শেরেক করতো, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের কাছ থেকে জীবনের আইন কানুন নিতো। আল্লাহকে সর্বশক্তিমান ও যাবতীয় ক্ষমতার মালিক তারা ঠিকই মানতো। আজকের মুসলমানরাও আইন-কানুন নিজেরা তৈরী করছে বা অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করছে। এভাবেই ওই সময়েও তারা অপরের আইন গ্রহণ করতো। এরপরও আজকের অনেক মুসলমান যেমন মনে করে যে, তারা মোহাম্মাদের দ্বীনের ওপর আছে, তেমনি ওরাও মনে করত তারা তাদের জাতির পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের ওপর আছে। এমনকি আবু জাহল যে প্রকৃতপক্ষেই ছিলো 'মূর্খতার বাপ', সেও আল্লাহ সম্পর্কে বুঝত ও বলতো, 'হে আল্লাহ, মোহাম্মদ আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেটে দিয়েছে এবং এমন একটা ধর্ম নিয়ে এসেছে, যা কেউ জানে না'। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, 'হে আল্লাহ, সে আমাদেরকে দুটো দলে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং আমাদের মধ্যকার সম্পর্ক কেটে দিয়েছে। অতএব তাকে আগামীকালের মধ্যে বিপদগ্রস্ত করুন'। তারা যে সব মূর্তির পূজা করতো, তাদেরকে কখনও বিশ্বাস করতো না যে, আল্লাহর মতোই তারা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। তাদের এ বিশ্বাস সম্পর্কে কোরআনে কারীমেও পরিষ্কার উল্লেখ আছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে (বলে) আমরা তাদের এবাদাত করি শুধুমাত্র এই জন্যে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে।' এটা হচ্ছে তাদের ওই চিন্তা ভাবনার লক্ষ্য। তারা তাদেরকে আল্লাহর কাছে পৌঁছুনোর জন্যে সুপারিশকারী হিসাবেই পেতে চায়। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে প্রকৃতপক্ষে তারা শেরেক করে না বলেই মনে হয়।

সঠিক পথের পথিক তারাই, যারা এসব মূর্তির পূজা করা ও তাদের ওপর নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করে সবকিছুর ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর দিকে রুজু করেছে। এভাবে যারা আল্লাহর দেয়া প্রতীকী কাজগুলো গ্রহণ করবে তাদেরকেই মুসলমান হিসাবে কবুল করা হবে! তাকে পুরোপুরিভাবে ইসলাম কবুল করতে হবে, চিন্তা বিশ্বাসে, পরিচয়বাহী চিহ্নসমূহে। শাসন ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা–এ কথা মানার ব্যাপারেও ইসলামের কথা মানতে হবে। আর যারা যে কোনো সময়ে বা যে কোনো দেশে একমাত্র আল্লাহকে শাসন কর্তৃত্বের মালিক মানতে চায় না বা মানে না, তারাই মোশরেক। শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ– কথাটা বিশ্বাসগত দিক দিয়ে মেনে নিলেই এই শেরেক থেকে তারা মুক্ত হবে না। শুধু বিশ্বাস করা হলো (অন্তরে), কিন্তু জীবনের সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে আল্লাহর গোলাম (অনুগত চাকর) হিসাবে নিজেকে পরিচিত করলো না এমন অবস্থায়...... সে কতক্ষণ ওই সকল নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানদার লোকদের চোখে মুসলমান বলে পরিচিত থাকবে? তাদেরকে তো মানুষ তখনই মুসলমান হিসাবে জানবে, যখন তারা কোনো শেকলের কড়ি হওয়ার শর্তগুলো পুরোপুরি পূরণ করবে। অর্থাৎ যখন তারা নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস ও বাস্তব পরিচয়বহ কাজের সমন্বয় ঘটাবে, তখনই তারা মুসলমান বলে গৃহীত হবে, একমাত্র আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাকে শাসন ক্ষমতার মালিক মানবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে আসা আচার আচরণ, নিয়ম কানুন, অভ্যাস ও প্রথা মূল্যায়ন ও অনুসরণ পরিত্যাগ করবে ...... একমাত্র এই পদ্ধতিতেই তাদের ইসলাম গ্রহণ করা পূর্ণাংগ হয়। একমাত্র এভাবে তার উচ্চারিত শাহাদাত– সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই এবং মোহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রসূল' এ কথা বাস্তবে প্রমাণিত করা হবে। সুতরাং বুঝা গেলো, মনে মগযের বিশ্বাসে যেমন হবে সে মান্যকারী, তেমনি কাজে-কথায়-চিন্তায় ও ব্যবহারে হবে সে একইভাবে তার বাস্তব অনুসারী। তারপর যারা এভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র সাক্ষ্য দিয়েছে, দিয়েছে এ সাক্ষ্যের বাস্তব প্রমাণ, তাদের সাথে যোগ দিয়ে এক ও অবিচ্ছেদ্য দল হিসাবে কাজ করবে। কোনো মুসলমানের নেতৃত্বে ইসলামী আইন কানুনকে প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনধর্মী হয়ে কাজ করবে এবং এই সত্যের অনুসারী দল নিজেদেরকে হঠকারী যুক্তি-বুদ্ধিহীন অন্যান্য দল ও তাদের নেতৃত্ব থেকে মুক্ত করবে!

আর এভাবেই যারা মুসলমান বলে পরিচিত হতে চায়, তারা তাদের অবস্থানকে সুস্পষ্ট করে তুলবে যেন তাদেরকে বিশ্বাসগত দিক দিয়ে ও বাস্তব কাজের নিরিখে চিনতে অসুবিধা না হয় বা ধোকা খেতে না হয়। হুকুম দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং আইন কানুন প্রণয়ন ও শাসন ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর–যে কোনো বান্দার শাসন কর্তৃত্বের অধিকার অস্বীকার করা এবং জাহেলী সমাজ ও নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করা পর্যন্ত শুধু মুখে কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ উচ্চারণ করলেই মুসলমান হওয়া যায় না।

অনেক (তথাকথিত) ধার্মিক (!) মোত্তাকী পরহেযগার ও নিষ্ঠাপূর্ণ মানুষ এ ব্যাপারে ধোকার মধ্যে রয়েছেন। তারা অবশ্যই ইসলাম চান, ইসলামকে ভালোবাসেন এবং ভালো মুসলমান বলে পরিচিত হতে চান, কিন্তু তারা কিছু ধোকার মধ্যে থাকার কারণে ইসলামকে পূর্ণাংগভাবে বুঝতে পারছেন না। তাদের জন্যে প্রথম প্রয়োজন ইসলামের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝা এবং এর আকীদা বিশ্বাসকে সর্বান্তকরণে এবং নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করা। তাদের জন্যে আরও প্রয়োজন এ কথাটা স্পষ্টভাবে বুঝা যে, আরবের মোশরেকরা (যারা মোশরেক বলেই পরিচিত ছিলো), তাদের থেকে খুব ভিন্ন ছিলো তা নয়। তারা আল্লাহকে তাঁর প্রকৃত রূপে চিনত, জানতো ও মানতো– যেমন

ওপরের বর্ণনায় বলা হয়েছে। কিন্তু তাদের কিছু সংখ্যক মূর্তিকে আল্লাহর সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছিলো। তাদের আচরণে মৌলিক যে শেরেক ছিলো, তা বিশ্বাসগত দিক দিয়ে নয়, বরং তা ছিলো শাসন কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে।

তথাকথিত পাক পবিত্র মোখলেস ব্যক্তিরা যখন সত্যিকারের মুসলমান হতে চায়, তখন তাদেরও এই বিষয়টা সুস্পষ্টভাবে অবগত হওয়া দরকার। অপরদিকে যে মুসলিম জামায়াত পৃথিবীর বুকে এই ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায়, তাদের সুনিশ্চিতভাবে ও গভীর অনুভূতি নিয়ে দ্বীন ইসলামের এসব মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া প্রয়োজন– এবং যারা ধোকার মধ্যে রয়েছে তাদেরকে সঠিকভাবে ইসলামটাকে বুঝিয়ে দেয়া প্রয়োজন যেন এ বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে। আরো প্রয়োজন এ বিষয়ে মানুষকে পরিষ্কার করে ও সুনিশ্চিতভাবে জানিয়ে দেয়া..... এটাই হচ্ছে দ্বীন ইসলামের প্রথম ও অগ্রযাত্রার কথা। কিন্তু সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর আইন চালু করার আন্দোলন যদি সূচনাতেই থেমে যায়, তাহলে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হওয়ার সকল আশা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে এবং দ্বীন ইসলামের বুনিয়াদ অন্য কোনো জিনিসের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। এই আন্দোলন যদি একবার থেমে যায়, তারপর যতো আন্তরিকতাই থাকুক না কেন, যতো ধৈর্যই অবলম্বন করা হোক না কেন এবং এপথে যতো দৃঢ়তাই দেখানো হোক না কেন, তাতে আর কোনোই ফায়দা হবে না!

মোমেনদেরকে এই উপদেশ দেয়ার পর তাদেরকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানানো হচ্ছে– যেমন করে অতীতেও বারবার এভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তারা ইসলামী আন্দোলনরত দলের দিকে ফিরে এসে তাদের সাথে একত্রিত হয়ে যায়। তাদেরকে স্মরণ করানো হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে আছেন। তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের দিকে ফিরে আসার জন্যে বারবার আহ্বান জানানো হচ্ছে। তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যেন তারা আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে না যায় এবং তাদেরকে আরও সতর্ক করা হচ্ছে যেন তারা ওই সব লোকের মতো না হয়ে যায়, যারা আল্লাহর কথা শুনেও শোনে না। তারা বধির ও বোবা, যদিও তাদের কান আছে, যা দিয়ে তারা শোনে এবং জিহ্বা আছে, যা দিয়ে কথা বলে..... ওরা হচ্ছে নিকৃষ্ট জানোয়ার যারা যমীনের বুকে হামাগুড়ি দিয়ে চলে। কারণ তারা যা শোনে তা মেনে চলে না। এরশাদ হচ্ছে,

নৈরাজ্যকবলিত মানবজাতির প্রতি ইসলামের আহ্বান

'হে ঈমানদাররা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো..... আর ওদেরকে শুনালেও ওরা মুখ ফিরিয়ে চলে যেতো এবং অস্বীকার করতো।' (আয়াত-২০-২৩)

এখানে আহবান করা হচ্ছে ঈমানদারদেরকে, যাতে করে তারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে এবং তাঁর আয়াত ও কথাগুলো শোনা সত্তেও তারা মুখ ফিরিয়ে চলে না যায়...... এখানে এ আহবান আসছে প্রেরণা সৃষ্টিকারী প্রাথমিক কথাগুলোর পর, এ আহ্বান আসছে যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ পেশ করার পর সর্বোপরি যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের বিভিন্ন তদবীর ও তাঁর পূর্ব নির্ধারিত বিভিন্ন ফয়সালা এবং নানাভাবে প্রদত্ত সাহায্য দেখার পর যে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সাথে আছেন এবং তিনি কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎকারী তাও বলে দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা শোনেনি তার পরিণতি কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এসব দৃষ্টান্ত ও শিক্ষাপ্রদ ঘটনা সামনে এসে যাওয়ার পর রসূল (স.) ও তাঁর নির্দেশ থেকে যে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে, তার পরিণতি হবে এতো কঠিন, যা কেউ চিন্তা করতে পারে না এবং যা মানুষের কোনো বুদ্ধিতেও আসে না।

এখান থেকে পশুর বিবরণ শুরু হচ্ছে এবং তা এর উপযুক্ত স্থানেই পেশ করা হয়েছে। সাধারণভাবে 'দাওয়াব'– প্রাণী বলতে মানুষ ও পশু সবাইকে বুঝায়। কিন্তু এর দ্বারা বিশেষভাবে সেই সব পশুকে বুঝায়, যারা কথা বলতে পারে না, ভালো মন্দের পার্থক্য বুঝে না এবং যারা নিজের কর্তব্য কী, তাও বুঝে না। অবশ্য এখানে নির্দিষ্ট কোনো পশুর নাম না নিয়ে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর আওতায় যাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাদেরকে বলা হয়েছে 'বোবা-বধির', যারা বুঝে না। এ দুটি শব্দ সেই সকল পশুর বৈশিষ্ট্য, যারা চতুষ্পদ ও বুকের ওপর ভর করে হাঁটে। মানুষের মধ্যে যারা শুনেও শোনে না এবং সঠিক কথা বলে না, তারা ওই বোবা ও বধির জানোয়ারের শামিল। এ জন্যে তাদের ওপরও ওই শব্দ দুটোর প্রয়োগ হয়েছে, বরং বলতে হবে তারা নিকৃষ্ট পশু। জীব জানোয়ারের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের কান আছে, তারা কথা শোনে, কথার অর্থ পুরোপুরি বুঝে না। তারা অস্পষ্ট ইংগিতগুলো থেকে অস্পষ্ট অর্থ বুঝে সাড়া দেয়। তাদের জিহ্বা আছে ঠিকই, কিন্তু তারা বোধগম্য কোনো কথা বলতে পারে না। কিন্তু তা সত্তেও এসব জীব জানোয়ার প্রকৃতিগতভাবে সঠিক পথপ্রাপ্ত, অন্তত তাদের জীবনের জরুরী বিষয়গুলোর ব্যাপারে তারা সঠিক কাজ করে। কিন্তু এসব মানব এদেরকে দেয়া বিবেক বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার করে না এবং এদের বিবেক দ্বারা কোনো উপকারও পায় না, সুতরাং এরা নিকৃষ্ট পশু!

'আল্লাহর দৃষ্টিতে তারাই নিকৃষ্ট পশু, যারা বধির ও বোবা, যারা (সত্য ও সঠিক কথা) বুঝে না।' 'আল্লাহ তায়ালা যদি জানতেন, তাদের মধ্যে ভালো কোনোগুনও আছে, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই (ভালো কথা) শোনাতেন।'

অর্থাৎ, তাদের অন্তরগুলোতে সঠিক কথা প্রবিষ্ট করাতেন এবং যে সব কথা তাদের কান শোনে, সেগুলোর তাৎপর্য তাদেরকে বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা জানেন যে, তাদের মধ্যে ভালো কিছু নেই এবং সঠিক পথে চলার কোনো আগ্রহও তাদের মধ্যে নেই। সেজন্য তিনি তাদের সত্যপথ দেখা ও সে পথে চলার প্রকৃতিগত যোগ্যতা নষ্ট করে দিয়েছেন। তারপর সত্য সঠিক পথ গ্রহণ করার জন্য তাদের মনের দুয়ারগুলোকে তারা নিজেরা বন্ধ করে দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা আর সেগুলো খুলে দেননি। আর তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদেরকে যেদিকে ডাকা হচ্ছে, সেদিকের কল্যাণকারিতা অবশ্যই তারা তাদের বুদ্ধি দ্বারা বুঝতো। কিন্তু তাদের মনের দরজা খোলেনি এবং তারা সত্যকে বোঝা সত্তেও গ্রহণ করতে পারেনি। এরশাদ হচ্ছে,

'আর (বর্তমান অনিচ্ছুক অবস্থায়) যদি তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কোনো সঠিক কথা শোনাতেনও, তাহলে তারা তা মানবে না, বরং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে।'

কারণ যুক্তি বুদ্ধি বা জাগ্রত বিবেক সত্যকে বুঝে এবং তাতে সাড়া দেয়। কিন্তু যে অন্তরে সত্য কবুল করার ক্ষমতা মুছে গেছে, তা কখনও সাড়া দেয় না, কবুল করেও না। এমনকি আল্লাহ তায়ালা যদি তাদেরকে বুঝার মতো কার্যকরীভাবে শোনানও, তবু তারা সাড়া দেয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে!

মোমেনদেরকে আবারও আহবান জানানো হচ্ছে, ডাকা হচ্ছে যেন তারা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে আগ্রহভরে সাড়া দেয়, তাঁকে অস্বীকার করতে যেন ভয় পায় এবং যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দেবে, তখন যেন তারা আল্লাহর নেয়ামতকেও স্মরণ করে। তাই এরশাদ হচ্ছে, 'হে ঈমানদাররা, যখন ......তিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিস থেকে রেযেক দিয়েছেন, তার থেকে খরচ করো, তাহলেই তোমাদের শোকর করা হবে।' (আয়াত ২৪-২৬)

নিশ্চয়ই রসূল (স.) তাদেরকে সেই জিনিসের দিকে ডাকছেন, যা তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে.... এ দাওয়াত সকল দিক দিয়ে এবং সকল অর্থে জীবনের দিকে.......।

তিনি তাদেরকে এমন এক বিশ্বাস গ্রহণ করার দিকে ডাকছেন, যা অন্তর ও বুদ্ধিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে। যাবতীয় মূর্খতা, কুসংস্কারের অন্ধকার কল্পনা ও রূপকথার জাল, সামান্য বস্তুগত উপকরণাদির সামনে অপমানজনকভাবে মাথা নোয়ানো থেকে মুক্ত করবে। কোনো সিদ্ধান্তকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া থেকে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব করা থেকে, দাসত্বের অপমানের জ্বালা থেকে অথবা একইভাবে কুপ্রবৃত্তির তাড়ন থেকেও তাকে নাজাত দেবে।

তাদেরকে রসূল (স.) ডাকছেন আল্লাহর দেয়া বিধান মানার জন্য। তিনি মানুষকে সর্বপ্রকার পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার ঘোষণা দিচ্ছেন এবং আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। আরও গ্যারান্টি দিচ্ছেন সকল মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের, যেখানে স্বৈরাচার থাকবে না, থাকবে না মুষ্টিমেয় লোকের শাসন। এক শ্রেণীর ওপর অন্য শ্রেণীর প্রাধান্য ও এক জাতির ওপর অপর জাতির কর্তৃত্ব থাকবে না। আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর বান্দারা সবাই হবে স্বাধীন ও সমান সমান মান-সম্ভ্রমের অধিকারী।

তিনি ডাকছেন তাদেরকে তার প্রদত্ত জীবন বিধান গ্রহণ করার দিকে। তাদের তিনি দান করছেন চিন্তা ভাবনা ও কল্পনা করার এক বিশেষ পদ্ধতি। তাদেরকে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করে প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি গ্রহণ করতে শেখাচ্ছেন, যা সৃষ্টিকর্তার বিধানের সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল, একমাত্র তিনিই সঠিকভাবে জানেন যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের জন্য তিনি সুন্দরভাবে জীবন যাপন প্রণালী বানিয়ে দিয়েছেন। এই জীবন-বিধান তাদের জান-মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা বিধান করে এবং সকল প্রকার বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করে। রসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে ডাকছেন শক্তি সম্মান ও পৃথিবীর বুকে প্রাধান্য লাভ করার দিকে, আর এটা সম্ভব হবে তাদের আকীদা বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান কায়েম থাকার মাধ্যমে, দ্বীন ইসলামের সাথে ও তাদের রবের সাথে বিশ্বস্ত থাকার মাধ্যমে সকল মানুষের মুক্তির জন্যে বলিষ্ঠ একটি আন্দোলনের মাধ্যমেও এটা সম্ভব। তাদের কর্তব্য এখানেই শেষ নয়, বরং তাদের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং পৃথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত সকল মানুষের প্রাধান্য ও সম্মান পুনরুদ্ধার করা, যা কতিপয় বিদ্রোহী ও সীমালংঘনকারীদের দ্বারা পদদলিত হয়ে আছে!

তিনি তাদেরকে আরও ডাকছেন তার পথে জেহাদ করতে, যেন আল্লাহর রাজ্যে ও মানুষের জীবনে একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম হয়, তুচ্ছ এই মানুষের প্রভুত্ব ধ্বংস হয়ে যায় এবং আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার সার্বভৌমত্বের ঝান্ডা বুলন্দ হয়। আর বিতাড়িত হয় তারা, যারা আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করার চেষ্টা করে। যারা তাঁর শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে উচ্ছেদ করতে চায়। কিন্তু অবশেষে যেদিন তারা আল্লাহর শাসন কর্তৃত্বের দিকে ফিরে আসবে, সেদিনই একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম হবে এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েমের আন্দোলনে যারা শরীক হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তারা এই শাহাদাতের মধ্যেই পেয়ে যাবে চিরন্তন ও অমর জীবন।

এটাই হচ্ছে সংক্ষেপে রসূল (স.)-এর দাওয়াতের মূল কথাগুলো। এ দাওয়াত হচ্ছে সকল অর্থে যে জীবন, সেই জীবন লাভ করার জন্যে তিনি তাগিদ করেছেন।

অবশ্যই এই দ্বীনই একমাত্র পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এটা শুধু সহজ একটা আকীদারই নাম নয়। এটাই একমাত্র পূর্ণাংগ ও বাস্তব জীবন ব্যবস্থা, যার আলোকে জীবন সবদিক দিয়ে উন্নত হয় ও তার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পায়। এই অর্থে আকীদা তার সকল রূপ ও প্রকৃতিতে

মানুষকে আসল জীবনের দিকেই ডাকে। প্রতি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি দিক নির্দেশনায় এক অমর জীবন লাভের দিকে ডাকে। এসব কথা মহান আল কোরআন খুব সংক্ষিপ্ত কথায় বড়ই প্রাণ সঞ্চারী ভংগিতে ব্যক্ত করছে। এরশাদ হচ্ছে,

মানুষের মনের ওপর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ

'হে ঈমানদাররা, আল্লাহ ও রসূলের সেই ডাকে সাড়া দাও, যা তোমাদেরকে সত্যিকারে জীবন দেবে।'

অর্থাৎ, আনুগত্য সহকারে ও স্বেচ্ছায় তাঁর ডাকে সাড়া দাও যদিও আল্লাহ তায়ালা চাইলে তোমাদেরকে জোর করে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করতে পারতেন। এরশাদ হচ্ছে,

'আর জেনে নাও, আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে এক প্রতিবন্ধক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছেন।'

হায় তাঁর কি সে ভয়ানক রূপ এবং সর্বশক্তিমান মালিকের কি সেই সূক্ষ্ম ও জবরদস্ত পরিচয়............

'তিনি বাধা হয়ে দাঁড়ান মানুষ ও তার অন্তরের মাঝখানে।' তারপর তিনি তার ও তার অন্তরের মধ্যে ফয়সালা করে দেন, অর্থাৎ এই অন্তরকে বশীভূত করে ফেলেন ও তাকে বাধাগ্রস্ত করে ফেলেন। তারপর তাকে যেমন ইচ্ছা তেমনি ঘুরান এবং যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকেই পরিচালিত করেন। কিন্তু এই অন্তরের ধারক যে শরীর, তা এর ওপর কোনোই কর্তৃত্ব রাখে না। আর এ হচ্ছে সেই অন্তর, যা তার দুই বাহুর মাঝখানে অবস্থিত।

এটা প্রকৃতপক্ষেই এক ভীতিপ্রদ অবস্থা। কোরআনের আয়াতের মাধ্যমেই শুধু এ অন্তরের অবস্থা জানা সম্ভব। কিন্তু অন্তরের মধ্যে যে সব অবস্থা সংঘটিত হয়, তার চিত্র তুলে ধরতে মানুষের ভাষা ব্যর্থ হয়ে যায়। তার শিরা উপশিরা ও তার অনুভূতির মধ্যে চাঞ্চল্যকর এ ঘটনা সদা সর্বদা ঘটতে থাকে।

এ এমন এক অবস্থা যা বুঝার জন্যে প্রয়োজন কোনো অতন্দ্র প্রহরীর মনের। প্রয়োজন এক সতর্ক দৃষ্টির, প্রয়োজন সর্বদা সাবধান থাকার। জাগ্রত থাকা এই জন্যে যেন অন্তরের মধ্যে কখনো ভুল ধারণাসমূহ পয়দা না হতে পারে, অন্তর এদিকে ওদিকে চলে না যায়। আর সকল প্রকার ভুল ও ভিত্তিহীন ধারণা আসার পথ বন্ধ করে দেয়ার জন্যে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে, যেন কোনো সময় তার পা পিছলে না যায়, কোনো পদস্খলন না হয়। তার জন্য এই সতর্কাবস্থা–বড়ই ক্লান্তিকর। রসূলুল্লাহ (স.) আল্লাহর রসূল হওয়া সত্তেও তিনি আল্লাহর কাছে সদা-সর্বদা এই বলে দোয়া করতেন,

'হে আল্লাহ, হে অন্তর পরিবর্তনকারী!' সাধারণ মানুষের অবস্থা কি হতে পারে চিন্তা করে দেখুন। তারা তো রসূল নয়, মাসুমও নয়!

এ এমন একটা অবস্থা, যা অন্তরকে কাঁপিয়ে তোলে। এ বিষয়ে যখন কোনো মোমেন নিরিবিলিতে চিন্তা করে, তখন তার গোটা অস্তিত্ব প্রকম্পিত হতে থাকে। সে যেন তার দুটি বাহুর মাঝে তার দিলটাকে দেখতে পায় এবং সে অনুভব করে যে, সে মহাশক্তিমান আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তার দিলটা যদিও সে তার বাহুদ্বয়ের মাঝে সহজেই বহন করে চলেছে, কিন্তু এর ওপর তার কোনোই কর্তৃত্ব নেই। যখন এ অবস্থা মোমেনদের ওপর আসে, তখনই তিনি তাদেরকে ডেকে বলেন,

'হে ঈমানদাররা, আল্লাহ ও রসূল যখন তোমাদের ডাকেন এমন জিনিসের দিকে, যা তোমাদের জীবিত রাখবে, তখন সে ডাকে সাড়া দিও।'

এ আহ্বানের অর্থ হচ্ছে, যেন তিনি বলছেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা চাইলে জোর করে তোমাদেরকে হেদায়াত করতে পারেন এবং এ আহ্বানের উদ্দেশ্যও তোমাদের দ্বারা পূরণ করিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তিনি মহান আল্লাহ, তিনি তোমাদেরকে সম্মানিত করছেন ও ডেকে ডেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অনুসরণ করতে বলছেন, যার বিনিময়ে তিনি তোমাদেরকে পুরস্কৃত করার ঘোষণাও দিচ্ছেন। তোমাদের এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে, তোমাদের এই আনুগত্য তোমাদের মানবতাকে উন্নত করবে এবং তোমাদেরকে আমানত বহনকারী বানাবে, মর্যাদার সাথে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্যশীল বানাবে। এ আমানত হচ্ছে হেদায়াতের আমানত, যা বহন করার দায়িত্ব তোমরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নিয়েছ। দিয়েছেন খেলাফতের আমানত, যা তোমরা গ্রহণ করেছ, দিয়েছেন তোমাদেরকে ইচ্ছাশক্তিতে স্বাধীনতার আমানত, যা তোমরা জেনে বুঝে ব্যবহার করতে পার। তিনি বলছেন, 'আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।'

অতএব জানা গেলো, তোমাদের অন্তরগুলো তোমাদের বাহুদ্বয়ের মাঝে অবস্থিত। এতদসত্তেও তোমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে নেয়া হবে, যেখান থেকে কেউ চাইলেও পালানোর কোনো পথ পাবে না। দুনিয়াতেও নয়, আখেরাতেও নয়। আর তিনি এসব সত্তেও তোমাদেরকে ডেকে বলছেন, যেন তোমরা যথাযথভাবে সাড়া দাও। তবে এ সাড়া দেয়া কোনো জোরজবরদস্তির কারণে নয়, বরং স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে তোমাদের নিজ নিজ খুশীতেই তোমরা সাড়া দেবে।

অপরাধীকে প্রশ্রয় দেয়া কঠিন অপরাধ

তারপর আল্লাহ তায়ালা ওই সব ব্যক্তিকে সতর্ক করছেন, যারা জেহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে। জীবন দানকারী এই দাওয়াতে সাড়া দেয় না। অন্যায় কাজ দমনের ব্যাপারে ঢিলেমি করে এবং কোনোভাবেই কল্যাণকর কাজের কোনো চেষ্টা করে না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

ভয় কর তোমরা সেই ফেতনা (বিশৃংখলা ও অশান্তিকর অবস্থা)কে, যা তোমাদের মধ্যে শুধু যালেমদেরকেই স্পর্শ করবে– তা নয় এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ তায়ালা আযাব দেয়ার ব্যাপারে বড়ই কঠোর।'

ফেতনা বলতে বুঝায় কোনো পরীক্ষা বা কোনো বালা-মুসীবত ...... আর যে সব লোক ওই যালেমদেরকে সহ্য করবে ও কোনো না কোনোভাবে তাদের সহায়তা করবে তারা নিজেরাও যালেমদের উপর আপতিত গযবের কবলে পড়ে যাবে। আর সব থেকে বড় যুলুম হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া প্রত্যাখ্যান করা, তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে মানব রচিত জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ ও কার্যকর করা, যালেমদের যুলুম প্রতিরোধকল্পে কোনো ভূমিকা না রাখা, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের দমন করার জন্যেও কোনো ব্যবস্থা না নেয়া একটি বড় যুলুম......... এসব লোক যালেম ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের দৌরাত্মের জন্য বহুলাংশে দায়ী। ইসলাম মানুষের সকল কর্ম নির্বাহ করার জন্যে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে এসেছে। সেখানে যালেম ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকেরা অবলীলাক্রমে ও অবাধে অন্যায় কাজ করে যাবে, আর কেউ তাদের প্রতিরোধ, দমন করবে না, বরং সবাই নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকবে, এর পরেও তারা দুনিয়ার মুসীবত ও আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে– তা কখনো হতে পারে না। এসব অন্যায় প্রতিরোধ ও দমন এবং আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর আইন চালু করাই মুসলিম জাতির প্রধান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করে নীরবতা অবলম্বন করলে দুনিয়া ও আখেরাতে যালেমদের জন্যে আসা শাস্তি থেকে তারাও রেহাই পাবে না। তারা ব্যক্তিগতভাবে ভালো ছিলো ও ভালভাবে জীবন যাপন করেছে– এ জন্য তারা ফেতনা ফাসাদ, অশান্তি ও আল্লাহর আযাব থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না। কিছুতেই

আল্লাহ তায়ালা যালেমদের ওপর আপতিত আযাব থেকে এই তথাকথিত 'ভালো মানুষ'দেরকে বাঁচাবেন না কারণ, তারা খেলাফতের দায়িত্ব পালন না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করেছিলো।

আর যে সময়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কারণে মানুষের জান মালের ওপর কষ্ট এসে পড়েছিলো, সেই সময়েই আল কোরআন এই সব উপদেশ দিয়েছে এবং মুসলমানদেরকে তাদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যেহেতু মুসলমানরাই এ সম্বোধনের ছিলো প্রথম লক্ষ্য এ জন্য অন্যায় প্রতিরোধ করার দায়িত্ব তাদের ঘাড়েই প্রথম পড়েছে, যদিও সে সময় তারা বড়ই দুর্বল ছিলো। সংখ্যায় খুবই কম, শত্রুপক্ষ তাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিলো। সকল দিক থেকে তাদের ওপর ভয়-ভীতি ছেয়ে ছিলো। দেখুন, ওই কঠিন দুঃসময়ে আল্লাহ তায়ালা কেমন করে তাদেরকে তাঁর 'দ্বীন' দ্বারা রক্ষা করেছিলেন, আশ্রয় দিয়েছিলেন, ইযযত দিয়েছিলেন এবং সুন্দর ও পবিত্র রেযেক দিয়েছিলেন। সুতরাং (হে মুসলমানরা) তোমাদের জন্যে জীবন দানকারী এ জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ ও কায়েম করা থেকে তোমরা কিছুতেই পিছিয়ে থেকো না, যার দিকে রসূল (স.) তোমাদেরকে ডাকছেন। এ মহান জীবন ব্যবস্থার মাধ্যমেই তো আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে মান-সম্মান ও সহায় সম্পদ দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে হেফাযত করেছেন।

সংখ্যার স্বল্পতা দেখে ঘাবড়ানোর কারণ নেই

'স্মরণ করো ওই সময়ের কথা, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প এবং দুর্বল ছিলে, (নানা প্রকার সমস্যার মধ্যে ঘেরাও অবস্থায়) ছিলে ...... যেন তোমরা শোকর করতে পারো।' (আয়াত ২৬)

এসব কথা এমনভাবে স্মরণ করো, যেন তোমরা বুঝতে পারো যে প্রকৃতপক্ষেই রসূল আমাদেরকে সেই কাজের দিকে ডাকছেন, যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে-যিন্দা রাখবে, জীবন্ত জাতি হিসাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। আর তোমরা স্মরণ করো তাঁকে এবং দায়িত্ব পালনে তাঁর ওপর ভরসা করে এমনভাবে এগিয়ে যাও যেন কোনো অবস্থাতেই তোমাদেরকে যলুম প্রতিরোধের পথ পরিহার করে বসে যেতে না হয়। স্মরণ করো মোশরেকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে তোমাদের পেছনের দুর্বলতা ও ভীতিপূর্ণ দিনগুলোকে এবং স্মরণ করো সেই কঠিন দিনকে, যেদিন শক্তিশালী ও দাম্ভিক এক বাহিনীর মোকাবেলার জন্যে আল্লাহর রসূল তোমাদেরকে ডাক দিয়েছিলেন– যাদের সাথে লড়তে তোমরা অনেকেই অপছন্দ করেছিলে– তার পূর্বেকার দিনগুলোকেও একবার স্মরণ করো এবং দেখো, কেমন করে সেই প্রাণসঞ্চারী দাওয়াত গ্রহণ করার কারণে তোমরা সম্মানিত হয়েছিলে। আল্লাহর অপূর্ব সাহায্য পেয়েছিলে, পেয়েছিলে তাঁর প্রভূত প্রতিদান ও বহু জীবন সামগ্রী। আল্লাহ তায়ালা এমনভাবে তোমাদেরকে তাঁর নেয়ামত দান করলেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার যোগ্যতা লাভ করো এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণে তোমরা আল্লাহর মেহেরবানী যথার্থ প্রতিদান পাও।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদের সংখ্যার স্বল্পতা, দুর্বলতা, পেরেশানী ও ভীতির কারণে তাদের সামনে এই প্রাণ-স্পর্শী কথাগুলোকে ছবির মত তুলে ধরছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা ভয় করছিলে যে, তোমাদেরকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে।'

ওপরের আয়াতাংশটি বদর প্রান্তরে অবস্থানকারী মুসলমানদের এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছে।

মুষ্টিমেয় নিরস্ত্রপ্রায় কিছু দুর্বল মুসলমান চরম ভয়-ভীতি নিয়ে অপেক্ষা করছিলো কখন বিপক্ষীয় সুসজ্জিত শত্রু বাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা, অস্ত্র ও রসদের অপ্রতুলতা এবং প্রতিপক্ষের দাপট এমনভাবে তাদেরকে পেরেশান করে রেখেছিলো যে, প্রতি মুহূর্তেই তাদের মনে হচ্ছিলো মুরগীর বাচ্চাদেরকে যেমন করে চিল বা বাজপাখীতে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, তেমনি করে শত্রুবাহিনী, তাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। ওই ভীষণ শত্রুর মুখে

টিকে থাকার যোগ্যতা তাদের কোথায়! ভয়ে তারা চোখে সব অন্ধকার দেখছিলো। যেদিকে তাকাচ্ছিলো সেই দিক থেকেই শুধু ভয় আর হতাশা এসে তাদেরকে যেন অবশ করে ফেলছিলো। তাদের হাতগুলো আড়ষ্ট হয়ে আসছিলো। তাদের হৃদয় কম্পিত হচ্ছিলো। চলার শক্তি রহিত হয়ে যাচ্ছিলো। এই অবস্থায় তারা সারাটা রাত্রি বিনিদ্রভাবে কাটিয়ে দিলো!

মহান ও করুণাময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই কঠিন দুঃসময়ে এবং চরম ভয়ের মধ্যে তাদেরকে সান্ত্বনার অনুভূতি দিলেন, দিলেন সাহায্যের আশ্বাস। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদের বাহুতে তিনি অভাবনীয় শক্তি সাহস জোগালেন। তারপর তাদেরকে বিজয়ী বানিয়ে ফিরিয়ে আনলেন নিরাপদ আশ্রয়ে। কেটে গেলো দুর্যোগের ঘনঘটা, চরম ভীতিপূর্ণ অবস্থা রূপান্তরিত হলো নিরাপত্তা ও নির্ভীকতার পরিবেশে। আল্লাহর শক্তি, সাহায্য ও পবিত্র নেয়ামত তাদের কাছে অভূতপূর্ব এক গৌরব বয়ে আনলো, যার নযীর পৃথিবীর বুকে অতি বিরল। মহান পরওয়ারদেগার এই অসহায় সম্বলহীন ছোটো জামায়াতকে সম্মানজনক আশ্রয় ও মর্যাদাপূর্ণ নিরাপত্তা দিলেন, তুচ্ছ এই দলটাকে এক গণ্যমান্য জাতি হিসাবে দুনিয়ার বুকে উন্নীত করলেন। এরশাদ হচ্ছে,

'তারপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দান করলেন, তোমাদেরকে তাঁর নিজ সাহায্য দ্বারা মযবুত বানালেন এবং পাক পবিত্র দ্রব্যাদি দ্বারা তোমাদের রেযেক দিলেন (যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করে দিলেন)।

আল্লাহর এসব নেয়ামতের বিবরণ দেয়া হলে যেন তারা মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতাভরে নুয়ে পড়ে এবং পাক পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে সম্মানজনক প্রতিদান গ্রহণ করে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর যাতে করে তোমরা শোকর করো।'

এরপর কে এমন আছে যে, এসব সুদূরপ্রসারী কথার ওপর চিন্তা করবে, অথচ সেই শক্তিশালী জীবন দানকারী ও নিরাপত্তা সম্বলিত মহামূল্যবান বাণী গ্রহণ করবে না। এ ডাক, এ মহামূল্যবান কথা তো ছিলো আল্লাহর বিশ্বস্ত ও সম্মানিত রসূলের .... এরপরও কে আছে এমন যে আল্লাহর নেয়ামতসমূহের শোকর করবে না। তাঁর সাহায্য ও অবদানসমূহ স্বীকার করে তাঁর হুকুম পালন করবে না। আল্লাহর কাছ থেকে আসা যাবতীয় বিপদ ও তার মধ্যে বিরাজমান যাবতীয় সাহায্য-এর প্রত্যেকটির মধ্যেই রয়েছে তাঁর মহিমার নিদর্শন ও প্রাণসঞ্চারী প্রেরণা! সাহাবায়ে কেরামের সেই পবিত্র দলটা তো তাদের সামনে সংঘটিত এসব অবস্থার দৃশ্য নিজেদের চোখেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা ওই দৃশ্যের বাস্তব সাক্ষী। তারা তাদের অতীত ও তাদের বর্তমান অবস্থার জানা কথাগুলো বর্ণনা করতেন..... আর এসব উপলক্ষে অবতীর্ণ কোরআনের কথাগুলো তাদের মধ্যে এক অবর্ণনীয় স্বাদ এনে দিতো এবং তাদের অনুভূতিতে এক মধুময় আবেগ এনে দিতো।

অপরদিকে, আজকের যে মুসলিম জনতা আল্লাহ তায়ালার এই দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বাস্তবে জেহাদ করে চলেছে এবং মানব জীবনে এ জীবন ব্যবস্থাকে চালু করার জন্য যে চেষ্টা করে যাচ্ছে, তারা এখনো অতীতের ওই দুটো অবস্থার কোনোটারই মুখোমুখি হয়নি এবং ওই সময়কার ওই কঠিন মজা(?)ও তারা পায়নি। কিন্তু আমাদের সামনে এ মহান কেতাব আল কোরআন এই সত্যের প্রতি এক শক্তিশালী আহ্বান জানাচ্ছে। আজকের আমাদের এই ব্যস্ত জীবনে আমাদেরকে আমাদের কর্তব্য স্মরণ করাতে গিয়ে বলছে,

'স্মরণ করে দেখো সেই সময়ের কথা, যখন তোমরা সংখ্যায় খুবই কম ছিলে, পৃথিবীতে নানা প্রকার দুর্বলতার মধ্যে ঘেরাও হয়ে ছিলে, প্রতি মুহূর্তে তোমরা ভয় করছিলে যে, তোমাদেরকে মানুষ ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।'

তোমরা ভাববে, হয়তো তাদের জন্যে জীবন দানকারী ওই দাওয়াতে সাড়া দেয়াটাই উত্তম ছিলো, যা আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে আসছিলো এবং নিশ্চিত ও বিশ্বস্ত আশ্বাসের অপেক্ষা করা শ্রেয় ছিলো। তখনকার মুসলমানদেরকে সাহায্য করা ছিলো আল্লাহর ওয়াদা, যে ওয়াদাকে আল্লাহ তায়ালা প্রথম মুসলিম জামায়াতটির জন্যে কবুল করেছিলেন। কিন্তু এটা তো শুধু সে সময়কার লোকের জন্যেই খাস ছিলো না, বরং আল্লাহর এ ওয়াদা চিরদিনের জন্যে সত্য এবং ভবিষ্যতেও যে কোনো মুসলিম দল যখন আল্লাহর পথে মযবুত হয়ে দাঁড়াবে এবং এ পথে আসা দুঃখ কষ্ট ও সংকট সমস্যার মধ্যে অবিচল থাকবে এবং আল্লাহর নিম্নলিখিত আশ্বাসবাণীর অপেক্ষায় থাকবে, তাদের জন্যেও একই প্রকার বিজয় ও সফলতার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

'সুতরাং তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন এবং মযবুত বানালেন তাঁর সাহায্য ও বিজয় দ্বারা। আর পবিত্র জিনিসগুলো থেকে তোমাদেরকে রেযেক দান করলেন, যেন তোমরা শোকর করো।'

এই আয়াতটি আল্লাহর ওয়াদার প্রতিনিধিত্ব করছে, বাহ্যিক ধোকাপূর্ণ অবস্থার ওপর এ কথা প্রযোজ্য নয়। আর আল্লাহর ওয়াদা প্রতিটি ক্ষেত্রে বরাবরই মুসলমানদের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে!

এরপর পুনরায় মোমেনদের জন্য বলিষ্ঠভাবে আহ্বান আসছে..... (বলা হচ্ছে) নিশ্চয়ই সম্পদ ও সন্তানাদি অনেক সময় ভয় ও কৃপণতার কারণে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে মানুষকে বাধা দেয়, বাধা দেয় সেই সম্মানিত জীবন গ্রহণ করতে, যার দিকে রসূল (স.) তাদের ডাকছেন। অবশ্যই এ পথে আছে অনেক কষ্ট, আছে শুভ অভিনন্দন ও মানুষের অগণিত শুভেচ্ছা .... এ জন্যে আল কোরআন একদিকে যেমন মানুষকে নেয়ামতের আশ্বাস দিয়ে অনুপ্রাণিত করছে, সাথে সাথে সম্পদ ও সন্তান সন্ততির ফেতনার ব্যাপারেও সাবধান করছে। এটা অবশ্যই বিপদের সামনে ঈমানের পরীক্ষা নেয়া, বিভিন্নভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা, যাতে তাকে কখনো দুর্বলতায় পেয়ে না বসে এবং কোনো ব্যর্থতা না আসে তার জন্যে বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলে তাদের ঈমানের শক্তিকে আল্লাহ তায়ালা যাচাই করতে চান। তিনি দেখতে চান এ জেহাদের ডাকে কে সাড়া দেয়, আর কে বিরোধিতা করে অথবা কে পিছিয়ে থাকে এবং এভাবে আল্লাহ ও রসূলের আমানতের কে খেয়ানাত করে এবং খেয়ানত করে সেই সকল আমানতের যা তাদেরকে পৃথিবীতে উম্মতে মুসলিমা হিসেবে দেয়া হয়েছে আর তা হচ্ছে (সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের জন্যে) পৃথিবীতে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা তাঁর রাজ্যে তাঁরই আইন কানুন চালু করার মাধ্যমে তাঁর প্রভুত্ব কায়েম করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কথাকে সমুন্নত করার সাথে সাথে একমাত্র তাঁরই প্রভুত্ব সার্বভৌমত্বকে বান্দাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা, মানুষকে সত্য সঠিক জিনিস বুঝিয়ে সে অনুযায়ী সুবিচার করা। এসব কিছুর সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে যে এর মহা প্রতিদান রয়েছে, সে বিষয়েও স্মরণ করানো হচ্ছে। এটা দুনিয়ার সেই সম্পদ ও সন্তানাদি থেকে অনেক মূল্যবান, যা মানুষকে ত্যাগ স্বীকার ও জেহাদ থেকে দূরে রাখে।

মুসলিম জাতির ওপর অর্পিত আমানত

'হে ঈমানদাররা, আল্লাহ ও রসূলের সাথে খেয়ানত করো না .... আর আল্লাহরই কাছে রয়েছে মহা প্রতিদান।' (২৮-আয়াত)

পৃথিবীতে উম্মতে মুসলিমার যে দায়িত্ব আছে, তার থেকে তাদেরকে সরিয়ে নেয়াই হচ্ছে আল্লাহ ও রসূলের সাথে খেয়ানত করা। সুতরাং এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে তাদেরকে প্রথম যে বিষয়টার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' গ্রহণ করার জন্যে মানুষকে তারা উদ্বুদ্ধ করবে। .... এর প্রধান কথা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসাবে জানা মানা ও তাঁর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠার জন্যে

আপ্রাণ চেষ্টা করা। এ ব্যাপারে মোহাম্মদ (স.) যেভাবে ও যে পদ্ধতিতে চেষ্টা করেছিলেন সেই ভাবেই চেষ্টা করা। যে পদ্ধতিতে তিনি এ দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেই এই কলেমা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো যুগ এমন যায়নি, যখন সামগ্রিকভাবে সকল মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, বরং হয়েছে এই যে, আল্লাহকে স্বীকার করার সাথে সাথে তারা তাঁর (ক্ষমতার) সাথে অন্য কোনো কোনো ব্যক্তিকে শরীক করেছে। কোনো সময়ে বিশ্বাস ও এবাদাতের ক্ষেত্রে তারা একটু কম শরীক করেছে আর কখনো বেশী করেছে, আর এ শরীক বানানো হয়েছে শাসন-ক্ষমতা ও শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে। আর এটাই হচ্ছে সব চাইতে বড় ও কঠিন শেরক। আর সব যামানায় 'আল্লাহ তায়ালাই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক' একথার বিশ্বাসের মধ্যেই গোলমাল থেকেছে, যেটাকে দ্বীন ইসলামের প্রথম বিষয় বলে আমরা জানি। অবশ্য এটাই এখানে মূল সমস্যা নয়, মূল সমস্যা হচ্ছে, আমাদের জীবনে 'একমাত্র তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক'- এ কথা স্বীকার করা এবং এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, পৃথিবীর জীবনে একমাত্র তাঁকেই সেইভাবে শাসন ক্ষমতার মালিক বলে মানা, যেমন করে প্রকৃতির সমুদয় জিনিস তাঁর কর্তৃত্ব মানে ও তাঁর বিধান মতো চলে। আল্লাহর নিম্নলিখিত বাণীতে উল্লেখিত কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'তিনিই সেই সত্ত্বা, যাঁর সর্বব্যাপী ক্ষমতা আকাশ ও পৃথিবীতে সমভাবে বিরাজমান।'

এভাবে তাদেরকে এ দায়িত্বও দেয়া হয়েছে যেন তারা মানুষকে জানিয়ে দেয় যে, একমাত্র আল্লাহর রসূলই মানুষের কাছে আল্লাহর 'দ্বীন'-কে পৌঁছে দেয়ার জন্যে দায়িত্বশীল। এ জন্যে তিনি যা কিছু পৌঁছাবেন তা নিজেও মেনে চলবেন।

এটাই হচ্ছে দ্বীন ইসলামের মূল বিষয়– অর্থাৎ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্যে মনের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার এক দুর্বার আন্দোলন চলতে থাকবে। আর এ কারণেই প্রয়োজন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সকল প্রকার খেয়ানত পরিহার করা, এর থেকে বেঁচে থাকার জন্যে আল্লাহ তায়ালা সেই মুসলিম সমাজকে সতর্ক করছেন, যারা ঈমান এনেছে বলে দাবী করে এবং তার ঘোষণা দেয়। আর এ কারণেই ধরে নিতে হবে যে, বাস্তব জীবনে এ জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রাণান্ত চেষ্টা করার জন্যে তারা মোতায়েন হয়ে গেছে। আর এ আন্দোলন হতে হবে ব্যক্তি চরিত্র গড়ে তোলার জন্যে। এর জন্যে মাল ও জানের কোরবানীর প্রয়োজন হলে তার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে। এমনকি সন্তানের মহব্বত ত্যাগ করার প্রয়োজন হলে তাও করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা উম্মতে মোহাম্মদীকে সেই আমানাতের খেয়ানত করার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন, যা পূরণ করার দায়িত্ব সেই দিন থেকে তারা নিয়েছে যেদিন তারা রসূল (স.)-এর হাতে বায়াত করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং জানা গেলো, মুখে শুধু কিছু কথা উচ্চারণ করার নামই ইসলাম গ্রহণ করা নয়, এটা শুধু কোরআনের কিছু অধ্যায় তেলাওয়াত ও দোয়া দুরূদের নামও নয়। ইসলাম হচ্ছে মানুষের সমগ্র যিন্দেগীর জন্যে একমাত্র পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা, যার মধ্যে রয়েছে শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান। এ দ্বীন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা একটি (জীবন)প্রাসাদ, আর এ প্রাসাদ গড়ে ওঠে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বন্দেগীর দিকে মানুষকে এগিয়ে দেয়ার মাধ্যমেই। সমাজকে আল্লাহর শাসন কর্তত্বের অধীনে নিয়ে আসা ও তাঁর আইনের আওতায় নিয়ে এসে শান্তি দান করা দিয়েও এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়। অহংকারী ও সেইসব বিদ্রোহীকে উৎখাত করতে হবে, যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর শাসন ক্ষমতাকে অস্বীকার করে। গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে সত্য ও সুবিচারপূর্ণ এক জীবন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে

হবে এবং নিজেদের মধ্যে পরিপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে ও স্থায়ী এ মূল্যবোধ, খেলাফতের দায়িত্বপালনের মাধ্যমে গোটা জীবনে আল্লাহর আইন চালু করতে হবে এবং এভাবে সমগ্র বিশ্বের সার্বিক উন্নতিকে নিশ্চিত করতে হবে।

ঈমানী দায়িত্ব পালনে ত্যাগ ও তাকওয়ার অপরিহার্য্যতা

ওপরে বর্ণিত সকল কাজই হচ্ছে আমানত। এসব আমানতের হক যে আদায় না করবে প্রকৃতপক্ষে তার খেয়ানত করা হবে, সে আল্লাহর সাথে করা ওয়াদাকে ভংগ করবে এবং রসূল (স.)-এর হাতে হাত দিয়ে যে বায়াত করেছিলো, তা সে নাকচ করে দেবে।

এসব কাজ করতে গেলে প্রয়োজন ত্যাগ অবিচলতা এবং ধৈর্যের। ধন সম্পদ ও সন্তানাদির যে ফেতনা অর্থাৎ এসব দুনিয়ার আকর্ষণ মানুষকে অনেক সময় স্বার্থপর ও কর্তব্যহীন বানায়, এগুলোর উর্ধে উঠতে হবে এবং আল্লাহর নিকটই মহা প্রতিদান পাওয়ার আশা করতে হবে, তাঁর বান্দাদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী হতে হবে। এসব বিশ্বস্ত বান্দারাই হচ্ছে আমানতদার, অবিচল ও ধৈর্যশীল, প্রভাবশীল ও ত্যাগী। এরশাদ হচ্ছে,

'আর জেনে নাও যে, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তানাদি এক পরীক্ষার বস্তু এবং আল্লাহর কাছেই রয়েছে বড় প্রতিদান।'

নিশ্চয় এ মহাগ্রন্থ আল কোরআন গোটা মানবমন্ডলীকে সম্বোধন করছে। তাদের সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিপ্রণালীর যে সব গোপন খবর জানেন, সেই সব বিষয় তাদেরকে এখানে অবগত করাচ্ছেন। প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বহু তথ্যই তিনি তাদেরকে জানাচ্ছেন। জানাচ্ছেন তাদের চলার উপযোগী সত্য ও সুন্দর পথ, যাতে তারা এই পথে সকল প্রকার উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে পারে!

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালাই জানেন মানুষের বিভিন্ন দুর্বলতার কথা। তিনি জানেন, তার সব থেকে বড় দুর্বলতা হচ্ছে সম্পদ ও সন্তানের লোভ, আর এজন্যে তিনি এই দুই আকর্ষণীয় বস্তু দান করার তাৎপর্য জানিয়ে দিচ্ছেন..... আল্লাহ তায়ালা এগুলো তাদেরকে দিয়েছেন তাদের পরীক্ষার জন্যে এবং তিনি দেখতে চান যে, এগুলো তারা কিভাবে ব্যবহার করে। এগুলো দুনিয়ার সৌন্দর্য। এর মধ্যে রেখে তিনি বান্দাদের পরীক্ষা করতে চান যে, সে এগুলো ব্যবহারের ব্যাপারে বান্দার সঠিক আচরণ করে কিনা। এগুলো যিনি দিয়েছেন, তাঁর শোকর করে কিনা ও এসব নেয়ামতের হক আদায় করে কিনা না এগুলো নিয়ে কি এত বেশী মেতে থাকে যে, কর্তব্যও ভুলে যায়, ভুলে যায় বান্দার হক এবং ভুলে যায় আল্লাহর হক। তাই তিনি বলছেন,

'আমি অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো মন্দ ও ভালো জিনিসের মধ্য দিয়ে' অর্থাৎ মন্দ ও ভালো উভয় অবস্থা দান করে পরীক্ষা করবো যে, তোমরা মন্দ অবস্থায় সবর করো কিনা এবং ভালো অবস্থায় শোকর করো, না আমার কথা ভুলে গিয়ে আনন্দ-স্ফূর্তিতে মেতে থাকো। তাহলে বুঝা গেলো, শুধু কঠিন অবস্থা দিয়ে এবং কোনো কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বঞ্চিত করেই যে পরীক্ষা করবো– তা নয়, বরং তোমাদের সচ্ছল দিনগুলোতে এবং সম্পদ, সন্তানাদি ইত্যাদি নানা প্রকার নেয়ামত দান করে সেখানেও পরীক্ষা করবো যে, আমাকে, আমার কথাকে, নিজের অন্যান্য কর্তব্যকে তোমরা ভুলে যাও কিনা।

এটা হচ্ছে আল্লাহর হুঁশিয়ারী। এরশাদ হচ্ছে,

'এবং জেনে রাখো যে, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তানাদি 'ফেতনা' – পরীক্ষার বস্তু।'

এমতাবস্থায় যখন পরীক্ষার বস্তুগুলোর ব্যবহারের ব্যাপারে তারা সাবধান হয়ে যায়, তখন সেগুলো তাদের জন্যে সাহায্যকারী হয়ে যায়। ওগুলো তাদেরকে কর্তব্য কাজের ব্যাপারে সজাগ করে দেয় এবং সতর্ক হয়ে চলার কাজে সহায়তা করে। সাবধান করে দেয় যেন সে নিজ কর্তব্য ভুলে পরীক্ষায় ব্যর্থ না হয়ে যায়।

এরপর আল্লাহ তায়ালা তাকে বন্ধু বান্ধবহীন অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেন না। হাঁ, কোনো কোনো সময়ে সাবধান করা সত্ত্বেও কর্তব্য পালনে সে দুর্বলতা অনুভব করে বটে, কোনো কোনো সময়ে কর্তব্য পালন তার জন্যে কঠিন হয়ে যায়। এর জন্যে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করা দুর্বিষহ হয়ে পড়ে এবং দায়িত্বের বোঝা বহন করাটা ক্লান্তিকর হয়ে যায়। বিশেষ করে সম্পদ ও সন্তনাদির ব্যাপারেই এসব দুর্বলতা বেশী আসে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে এভাবে সাহায্য করেন যে, তার জন্যে যেটা অধিক কল্যাণকর এবং যেটা বেশী দীর্ঘস্থায়ী, সেটাকেই তার সামনে উজ্জ্বল করে তোলেন, যেন সে অধিকতর কল্যাণকর জিনিস ও আচরণকে সহজে ও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং ওই কাজগুলো করার যথাযথ শক্তি লাভ করতে পারে। এর বিনিময়ে আল্লাহ পাকের আশ্বাসবাণী উচ্চারিত হয়েছে,

'এবং আল্লাহর কাছেই রয়েছে তাদের জন্যে মহা-প্রতিদান।'

অবশ্যই পাক পরওয়ারদেগার, তিনিই তো দিয়েছেন সম্পদ ও সন্তানাদি ...... এবং এগুলোর সঠিক ব্যবহার করায়, এগুলোর মধ্যে নিহিত তার জন্যে কল্যাণ-সহ রয়েছে মহা প্রতিদান যে, এগুলোর আকর্ষণে কর্তব্যচ্যুত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং যারা এসব উত্তম নেয়ামত লাভ করে, তারা যেন আমানতের হক আদায় করতে ভুলে না যায়। ভুলে যেন না যায় জেহাদের জন্য প্রয়োজনীয় ত্যাগ তিতিক্ষা বরদাশত করার কথা । যদি এভাবে সতর্ক হয়ে চলার মনোবৃত্তি আল্লাহ তায়ালা নিজ মেহেরবানী দ্বারা দিয়ে দেন এবং এই অনুভূতি দুর্বল ওই মানুষটার জন্য তার সঠিক পথ গ্রহণ করায় সহায়ক হয়ে যায় যে, ব্যক্তি যে কোনো দুর্বলতার সময় তার মালিককে জানতে বুঝতে পারে– স্মরণ করতে পারে। 'আর মানুষকে তো দুর্বল বানিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে।'

অবশ্যই বিশ্বাস ও চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে এটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই তার প্রশিক্ষণ হয়, এভাবেই সে অজ্ঞানতার ঘোর অমানিশায় শুভ্র সমুজ্জ্বল পথ খুঁজে পায়, জানতে-বুঝতে পারে তার কর্তব্যসমূহকে অনুভব করে এটাই মহান আল্লাহর পথ, যিনি (প্রকৃতপক্ষে) সবকিছু জানেন। কারণ তিনি সৃষ্টি করেছেন। 'তিনি কি জানেন না, যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সবকিছুর গূঢ় রহস্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা জানেন?'

অবশেষে সূরাটির এই শেষ অধ্যায়ে মোমেনদেরকে তাকাওয়া অর্জনের আহবান জানানো হয়েছে। জীবনের কঠিন পথসমূহে তাকওয়া ছাড়া অন্য কোনো জিনিসে মন স্থির থাকতে পারে না। নানা প্রকার লোভ লালসা ও আকর্ষণ থেকে বাঁচার জন্যে তাকওয়া– আল্লাহভীতি তাকে সঠিক পথ বেছে নিতে সহায়তা করে। সন্দেহপূর্ণ বিষয়গুলোতে এই আল্লাহ ভীতি এক উজ্জ্বল বাতি হিসাবে তাকে পথ দেখায়। তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সংকট সমস্যা দূর করে। মনের মধ্যে আগত নানা প্রকার ওয়াসওয়াসা দূর করে এবং দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তাকে সঠিক সিদ্ধান্তের পথে তাকে মযবূত করে দেয়। আর এই তাকওয়াই আলো হিসাবে সত্য ও মিথ্যা, হক ও না হকের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দেয়। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো মুছে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ তায়ালা বড় মেহেরবান, বড়ই দয়াময়।'

এটিই সেই পাথেয়, এটিই সেই সম্বল, যা বড় দুঃসময়ে কাজে লাগবে ...... তাকওয়ার পাথেয়, যা কলবকে যিন্দা করে, তাকে সদা-সর্বদা জাগ্রত রাখে এবং সতর্ক রাখে এবং তাকে বাছ বিচার করার ক্ষমতা দেয়। এই তাকওয়াই হচ্ছে সঠিক পথ প্রদর্শনকারী এমন এক নূর, যা পথের সব জটিলতা খুলে দেয়। সুন্দরতম পথটি দেখিয়ে দেয়। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সকল প্রকার সন্দেহ দূরীভূত

হয়ে সত্য সঠিক পথটি ভাস্বর হয়ে ওঠে। তারপর সর্ব প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতিকে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার জন্য এটি এক মযবুত উপায় হিসাবে কাজ করবে। এ হবে এমন সুনিশ্চিত ও তৃপ্তিকর পাথেয়, যার অধিকারী হলে মানুষের অন্তরের মধ্যে ধীরস্থির ভাব বিরাজ করতে থাকবে। সেই কঠিন দিনে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রহমত পাওয়ার ব্যাপারে আশান্বিত করে তুলবে, যে দিন অন্য কোনো পাথেয় বা অন্য কোনো কিছু কোনো কাজে লাগবে না।

তাকওয়া মনের মধ্যে সত্য মিথ্যার পার্থক্য বোঝার শক্তি যোগায়, পথের যে কোনো জটিলতার জট খুলে দেয়। কিন্তু আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে অন্যান্য যে সব তাৎপর্য আছে, সেগুলোর মতোই বাস্তবে তাকে এর স্বাদ গ্রহণ করায়, যে ব্যক্তি এর প্রকৃত স্বাদ পেতে চায়। যে এর স্বাদ পেতে চায় না, তাকে এ মহান গুণটি জোর করে স্বাদ গ্রহণ করাতে চায় না। অর্থাৎ এর জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেকে হিসাব করতে হবে, সে আল্লাহর ভয়ে লোভ লালসাপূর্ণ এ পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যে বাছ-বিচার করে চলতে প্রস্তুত কিনা। অনুভূতি ও বুদ্ধির মধ্যে সকল জট পাকিয়ে থাকে, অর্থাৎ প্যাঁচ লেগে থাকে, চিন্তা ভাবনার মধ্যে অনেক সময়ে এমনভাবে জট বেধে যায় যে, পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে পড়ে। সঠিক চিন্তার মধ্যে ভুল চিন্তা মিশে থাকে এবং জীবন পথের বাঁকে বাঁকে জটিলতা সৃষ্টি হয়। যুক্তি অনেক সময় ঢাকা পড়ে যায়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বুদ্ধি-বিবেক যেখানে চুপ হয়ে যায়, সঠিকভাবে তা কাজ করে না। নানা প্রকার কূটযুক্তি ও তর্ক বিতর্ক করার মনোভাব পয়দা হয়ে যায়। এসব জটিলতার মূল কারণ হচ্ছে তাকওয়ার অভাব। বুদ্ধি যখন উদ্দীপিত হয়, সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে, পথের জট খুলে যায়, অন্তর প্রশান্ত হয়ে বিবেক খুশী হয়ে যায় মনের মধ্যে কোমলতার পরশ পায়, পা মযবুত হয়ে যায় ও পথের ওপর দৃঢ়ভাবে এগুলো স্থাপিত হয়।

স্বাভাবিকভাবেই সত্য কথা গোপন থাকে না। এটা প্রচলিত কথা। আসল প্রকৃতি হচ্ছে তাই, যার ওপর স্বাভাবিকভাবে সব কিছু গড়ে উঠেছে...... কুপ্রবৃত্তি হচ্ছে তাই, যা সব সময় অস্পষ্টতা ছড়ায়, সুস্পষ্ট জিনিসকে ঢেকে দেয় এবং সরল সঠিক পথগুলোকে মানুষের চোখের আড়াল করে দেয়। অন্ধরা যেমন দেখতে পায় না, তেমনি এগুলো তাদের নযরে পড়ে না, বরং এগুলো সম্মুখ থেকে গোপন হয়ে যায়। গিরিপথসমূহ ..... এগুলোর মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন। একমাত্র আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) এর সব কিছুকে দমন ও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে ...... এই আল্লাহভীতিই গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থায় কোনো ব্যক্তির খবরদারি করতে পারে, আর এইভাবে সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে দিয়ে সত্যকে জানার জন্যে চোখকে খুলে দেয়। অন্ধকারের পর্দা অপসারিত করে– সত্য সঠিক পথকে উন্মুক্ত করে।

তাকওয়া এমন একটা বিষয়, কোনো মূল্য বা টাকা পয়সা দিয়ে যার মূল্যায়ন এবং পরিমাপ করা যায় না। একমাত্র আল্লাহর মহান মেহেরবানীই হচ্ছে এর বিনিময়। আল্লাহর এই মেহেরবানী অন্যান্য জিনিসের সাথে তাকওয়ার যে পুরস্কার দান করে তা হচ্ছে তাকওয়া সম্পর্কিত ত্রুটি বিচ্যুতি ও ছোটখাটো গোনাহ খাতাসমূহকে মুছে দিতে থাকে এবং বড় বড় গোনাহের জন্যেও ক্ষমার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। সর্বোপরি তাকওয়ার পুরস্কার আসে স্বয়ং আল্লাহর বিরাট সুপ্রশস্ত একটি মেহেরবানী হিসাবে।

একবার চিন্তা করুন, সবার উপকারে লাগার মতো যে রহমত, বরকত ও নেয়ামত– তা একমাত্র সবার মহান প্রতিপালক, সারা বিশ্বের মালিক, পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে থেকেই আসতে পারে যিনি সকল মর্যাদার অধিকারী!

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا
حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا
يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ
إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ
عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

৩০. (স্মরণ করো,) যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো, তারা তোমাকে বন্দী করবে অথবা তোমাকে হত্যা করবে কিংবা তোমাকে (আপন ভূমি থেকে) নির্বাসিত করে দেবে; (এ সময় একদিকে) তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো, (আরেক দিকে) আল্লাহ তায়ালাও (তোমার পক্ষে) কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিলেন; আর আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট কুশলী। ৩১. যখন তাদের সামনে আমার কোনো আয়াত পড়ে শোনানো হতো, তখন তারা বলতো, (হাঁ) আমরা একথা (আগেও) শুনেছি, আমরা চাইলে এ ধরনের কথা তো নিজেরাও বলতে পারি, এগুলো তো আগের লোকদের উপকথা ছাড়া আর কিছু নয়। ৩২. তারা যখন বলেছিলো, হে আল্লাহ তায়ালা, (মোহাম্মদের আনীত) কেতাব যদি তোমার কাছ থেকে পাঠানো সত্য হয়, তাহলে (একে অমান্য করার কারণে) তুমি আমাদের ওপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করো, কিংবা তুমি আমাদের ওপর কোনো কঠিন শাস্তি পাঠিয়ে দাও। ৩৩. আল্লাহ তায়ালা এমন নন যে, তিনি তাদের কোনো আযাব দেবেন, অথচ তুমি (সশরীরে) তাদের মধ্যে (বর্তমান) রয়েছো; আর আল্লাহ তায়ালা এমনও নন যে, কোনো (জাতির) মানুষদের তিনি শাস্তি দেবেন, অথচ তারা (কিছু লোক) তখনও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। ৩৪. কেনইবা আল্লাহ তায়ালা (-যারা কাফের) তাদের আযাব দেবেন না– যখন তারা আল্লাহর বান্দাদের মাসজিদুল হারামে আসার পথ থেকে নিবৃত্ত করে, অথচ তারা তো (এ ঘরের) অভিভাবকও নয়; এ ঘরের (আসল) অভিভাবক হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মানুষই (এ কথাটা) জানে না। ৩৫. (এ ঘরের পাশে) তাদের (জাহেলী যুগের) নামায তো কিছু শিস দেয়া ও তালি বাজানো ছাড়া আর কিছুই ছিলো না; (এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদের বলবেন,) এখন তোমরা তোমাদের কুফরী কার্যকলাপের জন্যে শাস্তি ভোগ করো।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ
فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ
جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ
بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ
وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ
فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾
وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

৩৬. যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে এবং যারা নিজেদের ধন-সম্পদ (এ খাতেই) ব্যয় করেছে যে, (এর দ্বারা) মানুষদের আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে; (এদের জন্যে তুমি ভেবো না,) এরা (এ পথে) ধন-সম্পদ আরো ব্যয় করতে থাকবে, অতপর একদিন সে (ব্যয় করা)-টাই তাদের জন্যে মনস্তাপের কারণ হবে, অতপর (দুনিয়ার জীবনেও) তারা পরাভূত হবে, আর যারা কুফরী করেছে আখেরাতে তাদের সবাইকে জাহান্নামের পাশে একত্রিত করা হবে। ৩৭. (এভাবেই) আল্লাহ তায়ালা ভালোকে খারাপ থেকে পৃথক করে দেবেন এবং খারাপগুলোর একটাকে আরেকটার ওপর রেখে সবগুলো এক জায়গায় স্তূপীকৃত করবেন, অতপর (গোটা স্তূপ) জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন; (মূলত) এ লোকগুলো সেদিন (ভীষণ) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রুকু ৫

৩৮. (হে মোহাম্মদ,) যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে তাদের তুমি বলো, তারা যদি এ থেকে (এখনো) ফিরে আসে, তাহলে তাদের অতীতের সব কিছুই ক্ষমা করে দেয়া হবে, তবে যদি তারা (তাদের আগের কার্যকলাপের দিকে) ফিরে যায়, তাহলে তাদের (সামনে) আগের (জাতিসমূহের ভয়াবহ) পরিণামের দৃষ্টান্ত তো (মজুদ) রয়েছেই। ৩৯. (হে ঈমানদার লোকেরা,) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকো, যতোক্ষণ না (আল্লাহর যমীনে কুফরীর) ফেতনা বাকী থাকবে এবং দ্বীন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যেই (নির্দিষ্ট) হয়ে যাবে, (হাঁ,) তারা যদি (কুফুর থেকে) নিবৃত্ত হয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালাই হবেন তাদের কার্যকলাপের পর্যবেক্ষণকারী। ৪০. (এসব কিছু সত্ত্বেও) যদি তারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের অভিভাবক, কতো উত্তম অভিভাবক আল্লাহ তায়ালা; কতো উত্তম সাহায্যকারী (তিনি)!

তাফসীর

আয়াত-৩০-৪০

সূরার এ অংশটাতে বর্তমান পরিস্থিতি প্রসংগে অতীতের পর্যালোচনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। মোমেনদের যে দলটা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং অতুলনীয় বিজয় অর্জন করেছে, তাদের সামনে সেই বিস্ময়কর পরিবর্তনটার ছবি তুলে ধরা হয়েছে, যা অতীত ও বর্তমানের মাঝে সংঘটিত হয়েছে। দেখানো হয়েছে মহান আল্লাহ তাদের প্রতি কতো অনুগ্রহ করেছেন এবং তাদের জন্যে কেমন পরিকল্পনা ও কৌশল অবলম্বন করেছেন। সেই অনুগ্রহের সামনে তাদের অর্জিত যুদ্ধলব্ধ গনীমত এবং যুদ্ধের দুঃখকষ্ট ও কোরবানী যে নিতান্তই তুচ্ছ, সে কথাও এই প্রসংগে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী পর্বটিতে বর্তমান যুদ্ধের আগে মক্কায় থাকাকালে মুসলমানদের কী শোচনীয় অবস্থা ছিলো, তা তুলে ধরা হয়েছে। সংখ্যা-স্বল্পতা, সার্বিক দুর্বলতা ও নিরাপত্তার অভাব হেতু তাদের এমন অসহায় অবস্থা ছিলো যে, যে কোনো সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ কাফেররা তাদেরকে যেন ছোবল দিয়ে সাবাড় করে দেবে– এরূপ আশংকার মধ্যে তারা দিন কাটাতো। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে ও কৌশলে তারা সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে মদীনায় নিরাপদ আশ্রয়, মর্যাদা ও সহায় সম্পদ লাভ করেছে।

হিজরতের অব্যবহিত পূর্বে মোশরেকরা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে ভয়ংকর ষড়যন্ত্র এঁটেছিলো। রসূল (স.) ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত যে বাণীগুলো শোনাতেন তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দাবী করতো যে, তারাও ইচ্ছে করলে ওই ধরনের বাণী রচনা করতে পারে। আর তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে ও তাঁর হেদায়াত গ্রহণের পরিবর্তে সদম্ভে চ্যালেঞ্জ দিতো যে, মোহাম্মদ (স.)-এর আনীত বিধান যদি সত্য হয় তাহলে তাদের ওপর প্রতিশ্রুত আযাব তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হোক। এখানে তাদের এই সব অপকর্মের বিবরণের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

তারপর উল্লেখ করা হচ্ছে যে, এখনও তারা সেই একই ভূমিকা ভিন্নভাবে অব্যাহত রেখেছে। এখনও তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার লক্ষ্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে চলেছে এবং রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দুনিয়ায় ব্যর্থ ও আখেরাতে জাহান্নামে সমবেত করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। তাদের সকল ষড়যন্ত্র, অপকৌশল ও দুরভিসন্ধির পরিণামে তারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনেই চরম ব্যর্থতা ও ক্ষয়ক্ষতি ভোগ করবে।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন কাফেরদেরকে দুটো জিনিসের মধ্য থেকে যে কোনো একটা গ্রহণ করার জন্যে চরমপত্র দিয়ে দেন, হয় তারা কুফরী, হঠকারিতা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে এবং এর মাধ্যমে জাহেলিয়াত যুগে করা তাদের সমস্ত পাপের জন্যে ক্ষমা লাভ করবে নচেত তাদের অতীত ও বর্তমানের অপকর্ম ও অপচেষ্টাগুলো চালিয়ে যাবে এবং আল্লাহর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করবে।

অতপর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন কাফেরদের বিরুদ্ধে সেই সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়, যখন মুসলমানদেরকে নির্যাতন করা ও বাধা দেয়ার আর কোনো শক্তি কাফেরদের থাকবে না, পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর নিরংকুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং সমস্ত আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এ যুদ্ধের ফলে তারা

যদি আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেয়, তবে রসূল (স.) তা গ্রহণ করবেন। কিন্তু তাদের নিয়ত তথা উদ্দেশ্য ও মনোভাব কি, সেটা বিচার বিবেচনা করার দায়িত্ব আল্লাহর। আল্লাহই তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ দর্শক। আর যদি তা না করে এবং তাদের যুদ্ধ, হঠকারিতা, আল্লাহর নিরংকুশ প্রভুত্বের প্রতি স্বীকৃতি না দেয়া ও পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার সামনে আত্মসমর্পণ না করার গোয়ার্তুমি অব্যাহত রাখে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা যে মুসলমানদের অভিভাবক এবং তিনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী ও অভিভাবক, সে ব্যাপারে অটল বিশ্বাস রেখে তাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জেহাদ চালিয়ে যেতে হবে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার আমি একে একে আয়াতগুলোর তাফসীর শুরু করছি।

মোহাম্মদ (স.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র

'স্মরণ করো, যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো।' (আয়াত ৩০)

এ আয়াতে হিজরতের মাধ্যমে মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তনের পূর্বে মক্কায় থাকাকালীন অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। একই সাথে এ আয়াতে ভবিষ্যতের ব্যাপারে দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস পোষণের ইংগিত দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর প্রত্যেক আদেশ ও সিদ্ধান্তে যে গভীর কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতা নিহিত থাকে, সে ব্যাপারেও সচেতন থাকতে বলা হয়েছে। যারা কোরআনের প্রথম শ্রোতা ছিলেন, সেই মুসলমানরা হিজরতের আগের ও পরের উভয় অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবেই অবহিত ছিলেন। হিজরতের আগে তারা যে ভীতি, সন্ত্রাস, দুর্ভোগ ও যাতনা ভোগ করেছেন, আর হিজরতের পরে যে সুখ শান্তি ও নিরাপত্তার নতুন জীবন লাভ করেছেন, হিজরতের আগে মোশরেকরা যেভাবে রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলো, আর হিজরতের মাধ্যমে যেভাবে তিনি শুধু তাদের নির্যাতন থেকে মুক্ত নয়, বরং তাদের ওপর বিজয়ী হয়েছেন, সেই উভয় অবস্থা তাদের জানা ছিলো। নিকট অতীতের সেই তিক্ত অবস্থার কথা তাদেরকে শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিলো, বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন ছিলো না।

হিজরতের আগে মোশরেকদের ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য ছিলো হয় রসূল (স.)-কে বন্দী করে তিলে তিলে মৃত্যু ঘটানো, অথবা সরাসরি হত্যা করে তার হাত থেকে একেবারে অব্যাহতি লাভ করা, অথবা মক্কা থেকে নির্বাসিত ও বিতাড়িত করা। এই সব ক'টি বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে সলাপরামর্শ করার পর তারা তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। তাদের সর্বসম্মত রায় ছিলো এই যে, আরবের সকল গোত্রের যুবকদের একটি দল একযোগে হামলা করে তাঁকে হত্যা করবে। এতে হত্যার যে দিয়াত বা রক্তপণ দিতে হবে, সেটা সকল গোত্রের ঘাড়ে সমবেতভাবে পড়বে। বনু হাশেম একা সমগ্র আরব জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নিতে পারবে না। ফলে দিয়াত নিয়েই সন্তুষ্ট হবে এবং ব্যাপারটা ওই পর্যন্তই শেষ হবে।

আয়াতে বর্ণিত মোশরেকদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর প্রদত্ত বিবরণ ইমাম আহমদ নিম্নরূপ উদ্ধৃত করেছেন,

'একদিন রাত্রে কোরায়শ গোত্র পরামর্শে বসলো। কেউ কেউ মত প্রকাশ করলো যে, সকালে ঘুম থেকে উঠলেই মোহাম্মদ (স.)-কে বেঁধে ফেলতে হবে। অন্য একজন বললো, তার চেয়ে বরঞ্চ হত্যা করে ফেলাটাই ভালো। আরেকজন বললো, ওকে মক্কা থেকে বের করে দিলেই চলে। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই সলাপরামর্শের বিষয়টা রসূল (স.)-কে জানিয়ে দিলেন। এরপর রসূল (স.)-এর বিছানায় আলী (রা.) ঘুমিয়ে রইলেন। আর রসূল (স.) বাড়ী থেকে বেরিয়ে সোজা পর্বত গুহায় চলে গেলেন। মোশরেকরা আলী (রা.)-কে রসূল (স.) ভেবে সারা রাত পাহারা দিতে

লাগলো। সকাল বেলা সবাই তার দিকে ধেয়ে গেলো। সবাই দেখলো যে, শায়িত ব্যক্তি হচ্ছেন আলী (রা.)। আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিলেন। তারা বললো, তোমার সাথী কোথায়? আলী (রা.) বললেন, জানি না। অগত্যা সবাই পায়ের চিহ্ন ধরে রসূল (স.)-কে সন্ধান করতে লাগলো। পাহাড়ের কাছে পৌঁছে পায়ের চিহ্নটায় তারা তালগোল পাকিয়ে ফেললো। তখন তারা পাহাড়ের ওপর চড়তে লাগলো। পাহাড়ের গর্তের কাছে গেলে দেখলো, গর্তের মুখে মাকড়সার জাল। তারা বললো, মোহাম্মদ (স.) যদি এই গর্তে ঢুকতো, তাহলে এর মুখে মাকড়সার জাল থাকতো না। অতপর তিনি ওই গর্তে তিন দিন কাটালেন।'

'তারা ষড়যন্ত্র করে, আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেন। আল্লাহ সবচেয়ে উত্তম কৌশল অবলম্বনকারী।'

'তারা ষড়যন্ত্র করে, আর আল্লাহ ও তার মোকাবেলায় কৌশল চালান এই কথাটা গভীর তাৎপর্যবহ। একদিকে কোরায়শদের সলাপরামর্শ, ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল চলছে, অপরদিকে তাদের অজান্তে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিচ্ছেন– এই দৃশ্যটা কল্পনা করলেই কথাটার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। এটা একদিকে যেমন একটা ভয়ংকর দৃশ্য, অপরদিকে তেমনি একটা পরিহাসের দৃশ্যও বটে। যে আল্লাহর ক্ষমতা সীমাহীন, যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের ওপর পরাক্রান্ত, যে মহা প্রতাপশালী আল্লাহ তায়ালা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে আপন ক্ষমতা দ্বারা ঘেরাও করে রেখেছেন, তাঁর সামনে এই সব দুর্বল ও ক্ষুদ্র মানুষ কী ক্ষমতা রাখে এবং কিসের এতো স্পর্ধা তার?

কোরআন এ দৃশ্যটাকে নিজস্ব ভংগিতে এমনভাবে তুলে ধরে যে, শ্রোতা ও পাঠকের হৃদয় কেঁপে ওঠে এবং চেতনার গভীরতম প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

কোরআনের প্রাণবন্ত ঘোষণা ও বিপর্যস্ত কুফরী সমাজ

কাফেরদের নানা অপকর্ম, গালভরা দাবী ও আস্ফালনের বর্ণনা দান প্রসংগে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারা এই কোরআনের মতো কোরআন ইচ্ছে করলেই রচনা করতে পারে বলে দাবী করে থাকে এবং সেই সাথে কোরআনকে প্রাচীন উপাখ্যানের সমষ্টি বলে উল্লেখ করে।

'যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে ....' (আয়াত ৩১)

তাফসীরে ইবনে কাসীরে সাঈদ ইবনে জোবায়র থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কথাটা নাযর ইবনুল হারেস বলেছিলো। এই অভিশপ্ত কোরায়শ নেতা পারস্য ভ্রমণ করে রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটদের কাহিনী সংগ্রহ করে। দেশে ফিরে সে দেখতে পায় যে, রসূল (স.) নবুওত লাভ করে মানুষকে কোরআন পাঠ করে শোনাচ্ছেন। নাযর বিন হারেসের উপস্থিতিতে কোনো সমাবেশে যখনই রসূল (স.) প্রাচীন ক্ষমতাধরদের কেসসাকাহিনী বর্ণনা করতেন, তখন সে বলতো, আল্লাহর কসম, তোমরা বলোতো, কে ভালো কাহিনী বলতে পারে, আমি, না মোহাম্মদ? এজন্যে বদর যুদ্ধে যখন সে বন্দী হলো, তখন রসূল (স.) তাকে তাঁর সামনে বেঁধে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেটাই করা হয়েছিলো। হযরত মেকদাদ বিন আসওয়াদ তাকে বন্দী করেছিলেন। ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত সাঈদ বিন জোবায়র বলেন, বদরের দিন বন্দী অবস্থায় যাদেরকে রসূল (স.) হত্যা করিয়েছিলেন তারা হলো, ওকবা ইবনে আবি মুয়ীহত, তুয়াইমা ইবনে আদী এবং নাযর বিন হারেস। নাযরকে বন্দী করেছিলেন মেকদাদ। নাযরকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে মিকদাদ বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, সে তো আমার

বন্দী। তখন রসূল (স.) বললেন, সে আল্লাহর কেতাব সম্পর্কে আজে বাজে কথা বলতো। অতপর রসূল (স.) তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। মেকদাদ আবার বললেন, হে আল্লাহর রসূল, সেতো আমার বন্দী। তখন রসূল (স.) বললেন, হে আল্লাহ, তোমার অনুগ্রহ দ্বারা মেকদাদকে সমৃদ্ধ করো।' মেকদাদ বললেন, এটাই আমি চেয়েছিলাম। (অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যে রসূলুল্লাহ দোয়া) এ সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়।

কোরআনে বহুবার বলা হয়েছে যে, মোশরেকরা কোরআনকে প্রাচীন লোকদের কেসসা কাহিনীর সমাহার বলে অভিহিত করতো। যেমন সূরা ফোরকানে বলা হয়েছে,

'তারা বলতো, এতো প্রাচীন লোকদের কেচ্ছা-কাহিনী। আর এগুলো মোহাম্মদকে রাত দিন লিখিয়ে দেয়া হয়।'

কাফেরদের এ উক্তির উদ্দেশ্য কোরআনের সামনে একটা অন্তরায় সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু ছিলো না। মানুষের স্বভাবের গভীরে লুকিয়ে থাকা তার সুপরিচিত মহা সত্যকে সচেতনভাবে গ্রহণ করার জন্যে কোরআন যখন আহ্বান জানায়, তখন সে আহ্বানে মানুষ সাগ্রহে সাড়া দিতে পারে। তাই কোরআনের এই আহ্বানকে প্রভাবহীন করে দেয়ার জন্যেই কাফেররা ওই কথা বলতো। মানুষের মনের ওপর কোরআনের যে জোরদার প্রভাব পড়ে, সেটাকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে কোরায়শ নেতৃবৃন্দ ও এ ধরনের কৃত্রিম প্রচারণার আশ্রয় নিতো। এ প্রচারণা যে কৃত্রিম, তা জেনে শুনেই তারা এর আশ্রয় নিতো। কিন্তু আসলে তারা কোরআনে এমন একটা জিনিস খুঁজতো আরবদের প্রতিবেশী বিভিন্ন জাতির জনশ্রুত উপখ্যানসমুহের সাথে যার সাদৃশ্য রয়েছে। এ ধরনের কেসসা কাহিনী দিয়ে তারা আরবের সাধারণ মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতে চাইতো, যাতে তাদেরকে তাদের পৌত্তলিক ধর্মের ওপর বহাল রাখা যায়।

কোরায়শ নেতারা ইসলামের দাওয়াতের প্রকৃতি কি, তা জানতো। কেননা তারা তাদের ভাষার সঠিক মর্মার্থ বুঝতো। তারা জানতো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল-এই সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ হলো, মানুষের কর্তৃত্ব ও আধিপাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, মানুষের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের গোলামী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করা এবং আল্লাহর একক প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের কাছে আশ্রয় গ্রহণ। তারা এও জানতো যে, আল্লাহর এই সর্বাত্মক আনুগত্য ও গোলামীর ব্যাপারে যা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার, তা তাঁর রসূল মোহাম্মদ (স.)-এর কাছ থেকেই গ্রহণ করতে হবে, অন্যান্য দেবদেবীর মুখপাত্রদের কাছ থেকে নয় এবং মোহাম্মদ (স.) ছাড়া অন্য কেউ যদি আল্লাহ মুখপাত্র হবার দাবীদার হয়, তবু তাঁর কাছ থেকেও নয়। কোরায়শ নেতারা দেখতে পাচ্ছিলো যে, যারাই ওই কলেমার সাক্ষ্য দেয়, তারা সংগে সংগেই কোরায়শদের ক্ষমতা, আধিপত্য, নেতৃত্ব ও শাসক সুলভ কর্তৃত্বের আওতার বাইরে চলে যায়। তারা আর তাদের অনুগত থাকে না, বরং মোহাম্মদ (স.)-এর পরিচালিত সংগঠনের আওতাভুক্ত হয়ে তাঁরই নেতৃত্বের অনুসারী হয়ে যায়। তারা শংকিতভাবে দেখলো যে, কলেমার সাক্ষ্য দেয়ার পর কেউ আর নিজ পরিবার, গোত্র, আত্মীয়স্বজন, গুরুজন ও জাহেলী নেতৃত্বের সাথে সম্পর্ক রাখে না, বরং তাদের সর্বাত্মক সম্পর্ক গড়ে ওঠে নতুন নেতৃত্বের সাথে এবং এই নতুন নেতৃত্বের অনুসারী মুসলিম জামায়াত ও সংগঠনের সাথে।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কলেমার সাক্ষ্যদানের এটাই যে তাৎপর্য এবং এটাই যে বাস্তব ফল, তা কোরায়শ নেতারা নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছিলো। আর এটা দেখেই তারা অনুভব করছিলো যে, তাদের সামষ্টিক অস্তিত্ব এবং যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক

ও আদর্শিক ভিত্তির ওপর তাদের সামষ্টিক অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তা হুমকির সম্মুখীন। আজকাল এক শ্রেণীর লোকেরা কলেমার সাক্ষ্যকে কেবল মুখ দিয়ে উচ্চারণ এবং কতিপয় আনুষ্ঠানিক এবাদাত সম্পন্ন করেই নিজেদেরকে পাক্কা মুসলমান বলে দাবী করে, অথচ তাদের চার পাশের পৃথিবীতে ও সমাজ জীবনের কোথাও তার কোনো অস্তিত্ব ও ছাপ নেই, বরং সর্বত্রই জাহেলী নেতৃত্ব ও জাহেলী আইন সমাজকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করছে। এ সব লোক কলেমার যে মর্ম বোঝে, মক্কার কাফেররা কলেমার সেই মর্ম ও তাৎপর্য বুঝতো না।

একথা সত্য যে, মক্কায় ইসলামের আইনও চালু ছিলো না এবং ইসলামের কোনো রাষ্ট্র সেখানে ছিলো না। কিন্তু যারা কলেমা শাহাদাত উচ্চারণ করতো, তারা সেই মুহূর্তে থেকেই মোহাম্মাদের নেতৃত্বের অনুসারী হয়ে যেতো, মুসলিম দলের সদস্য হয়ে যেতো, জাহেলী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো এবং তাদের পরিবার, গোত্র, আত্মীয়স্বজন ও সমগ্র জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতো। কাজেই কলেমায়ে শাহাদাত নিছক একটা ফাঁকা বুলি ও অসার দাবী ছিলো না, বরং তা ছিলো একটা বাস্তব সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান ও সক্রিয় প্রচেষ্টার নামান্তর।

কোরায়শ নেতৃত্বের কাছে এটাই ছিলো বিরক্তিকর। ইসলাম ও কোরআনের এই বাস্তব ও বিপ্লবী প্রচেষ্টাই ছিলো তাদের কাছে অসহনীয়। ইতিপূর্বে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু তাওহীদবাদী বা একেশ্বরবাদী লোক যে আরবের জাহেলী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের পূজা উপাসনা ও আকীদা বিশ্বাস থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে রেখেছিলো, তাতে তারা কোনো বিরক্তি বোধ করেনি। আসলে জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার এ পর্যায়ে কোনো অসুবিধা হয় না। কেননা নেতিবাচক আকীদা বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক এবাদাত-উপাসনায় জাহেলী সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো বিপদাশংকা ও ঝুঁকি থাকে না। নিছক আকীদা বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক এবাদাত ইসলাম নয়– যদিও আন্তরিকভাবে মুসলিম হবার দাবীদার পুণ্যবান ও সৎ লোকদের একটা শ্রেণী এরূপ মনে করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কী তা তারা জানে না। প্রকৃত ইসলাম হলো, কলেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণের সাথে সাথে জাহেলী সমাজ আইন, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, মূল্যবোধ ও মতাদর্শকে সমূলে উৎপাটনের আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার নাম এবং যে ইসলামী দল ও নেতৃত্ব পরিপূর্ণ ইসলামের বাস্তবায়ন কামনা করে ও সেজন্যে চেষ্টা চালায়, সেই দল ও নেতৃত্বের অনুসারী হওয়ার নাম। এ জিনিসটা দেখেই কোরায়শদের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিলো এবং নানাভাবে এর প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলো। এই প্রতিরোধেরই একটা চেষ্টা ছিলো পবিত্র কোরআনকে প্রাচীনকালের উপাখ্যান ও রূপকথার সংকলন বলে আখ্যায়িত করা এবং অমন কেসসাকাহিনী তারাও বানাতে পারে বলে দাবী করা। অথচ তাদেরকে কোরআনের অনুরূপ একটি আয়াতও যদি পারে রচনা করে আনতে বহুবার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে এবং প্রতিবারই তারা ব্যর্থ হয়েছে ও পিছু হটেছে।

মূল শব্দটা হলো 'আসাতী। এটা 'উসতূরা' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো, দেবদেবী সংক্রান্ত কাল্পনিক ধ্যান ধারণা ভিত্তিক গল্প, প্রাচীন নায়কদের অলৌকিক ও রহস্যময় কাহিনী এবং প্রধানত কল্পনাপ্রসূত ঘটনাবলী।

কোরআনে অতীত জাতিগুলোর অবস্থা অলৌকিক ঘটনাবলী, কাফেরদের শাস্তি ও মোমেনদের নিষ্কৃতি ইত্যাদি সংক্রান্ত যেসব কাহিনী রয়েছে, সেগুলো নিয়ে কোরায়শ নেতারা বিশেষ বিব্রত বোধ করতো। তাই তারা সরলমতি জনসাধারণকে বলতো যে, এগুলো আদিম যুগের কেসসাকাহিনী, মোহাম্মদ (স.) ওগুলো অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে লিখিয়ে এনে

তোমাদেরকে শোনায় এবং আল্লাহর কাছ থেকে ওহী-যোগে পেয়েছে বলে দাবী করে। নাযর ইবনুল হারেসও রসূল (স.)-এর মাজলিসে বসতো এবং মাজলিসের পরে অথবা এক পাশে আরেকটা মাজলিস বসিয়ে তার পারস্য ভ্রমণ থেকে যোগাড় করে আনা কাহিনীগুলো শোনাতো। সে বলতো, 'মোহাম্মদ যে সব কাহিনী তোমাদেরকে শোনায় আমিও সেই ধরনের কাহিনীই শুনাচ্ছি। তবে আমি ওর মত নবুওত বা ওহীর দাবী করি না। এতে ওহী বা নবুওতের কী আছে? ওসব কেসসা কাহিনী তো আমরাও জানি।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ কথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে, জাহেলী যুগে সাধারণ মানুষের মনে এই অপপ্রচারের একটা প্রভাব পড়তো, বিশেষত প্রথম দিকে, কোরআনের সাথে জাহেলী সমাজে প্রচলিত কেসসা কাহিনীর পার্থক্য স্পষ্ট হওয়ার আগে। বদরের ময়দানে যুদ্ধ শুরু হবার আগেই যে রসূল (স.)-এর ঘোষক নাযর ইবনুল হারেসকে হত্যা করার আদেশ প্রচার করেছিলো, তার কারণ এটাই। পরে যখন তাকে বন্দী হিসাবে আটক করা হয়, তখন সে ছিলো সেই ক'জন যুদ্ধবন্দীর অন্যতম, যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো এবং তাদের কাছ থেকে অন্যদের মতো কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হয়নি।

অবশেষে মক্কায় এই অপকৌশল বেশীদিন টেকসই হয়নি। এই অপপ্রচারের জারিজুরি অচিরেই ফাঁস হয়ে গেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত দুর্দম শক্তির বলে এবং মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির গভীরে দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী সত্যের স্বতস্ফূর্ত প্রভাবে কোরআন এই সব অপকৌশল ও অপপ্রচারের বাধা অতিক্রম করতে পেরেছে। এর ফলে কোরায়শ নেতারা এতোটা ভীত সন্ত্রস্ত ও বেসামাল হয়ে পড়ে যে, তারা তাদের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারী করে! 'এই কোরআন তোমরা শুনো না, বরং এর আবৃত্তির সময়ে হৈচৈ করো। আশা করা যায়, এতে তোমরা বিজয়ী হবে।' এমনকি আবু সুফিয়ান, আবু জেহেল ও আখনা বিন শুরায়কের ন্যায় বড় মাপের কোরায়শ নেতারা পর্যন্ত একে অপরের চোখে ধুলো দিয়ে গভীর রাতে গোপনে কোরআন শুনতো। রাতের পর রাত দাঁড়িয়ে রসূল (স.)-এর কোরআন তেলাওয়াত শুনতে এক অদম্য আকর্ষণ তাদেরকে টেনে নিয়ে যেতো। শেষ পর্যন্ত পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে তারা এরূপ আর করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়, যাতে করে কোরআন ও ইসলামের প্রতি আকর্ষণ বোধের কারণে কোরায়শ যুবকদের কাছে লাঞ্ছিত না হয়। এসবই ছিলো কোরআনের অন্তর্নিহিত সম্মোহনী শক্তির অলৌকিক প্রভাব।

ভিন্ন একটা জিনিসের দিকে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে প্রতারণামূলকভাবে কোরআন থেকে মানুষকে দূরে সারানোর যে চেষ্টা নাযর ইবনুল হারেস করেছিলো, সে ধরনের চেষ্টা অতীতেও অনেকবার হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও আরো হবে। ইসলামের শত্রুরা মানুষকে কোরআন থেকে দূরে সরানোর কোনো চেষ্টাই বাদ রাখেনি। কিন্তু সব চেষ্টা যখন বৃথা গেছে, তখন কোরআনকে ক্বারীদের দ্বারা সুমধুর কণ্ঠে তেলাওয়াত করিয়ে শ্রোতাদের বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, অথবা বুকে, গলায়, পকেটে বা বালিশে তাবিজ করে রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভাবেই তারা ভেবেছে যে, কোরআনের ও ইসলামের হক আদায় করা হয়েছে এবং তারা পাকা মুসলমান হয়ে গেছে।

কোরআনকে মানব জীবনের জন্যে আইন কানুনের ও আদেশ নিষেধের উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের জন্যে কোরআনের বহু বিকল্প তৈরী করে দিয়েছে, যা থেকে জীবনের সকল বিধি বিধান পাওয়া যায়। সে সব বিকল্প উৎস থেকে তারা

তাদের যাবতীয় ধ্যান ধারণা, মতাদর্শ, মূল্যবোধ, মানদন্ড ও আইন পেতে পারে। এরূপ বিকল্প বিধিব্যবস্থা তাদেরকে বলে যে, ধর্ম তো পবিত্র জিনিস, কোরআন তো সুরক্ষিত জিনিস, ওটা তোমাদের সামনে সকালে বিকালে এবং দুপুরে সুমধুর কণ্ঠে পড়া হবে। এরপর কোরআন দিয়ে তোমাদের আর কী দরকার? আর কী চাও কোরআন থেকে? আইন কানুন ? মতবাদ মতাদর্শ? মূল্যবোধ ও মানদন্ড? ও সবের জন্যে তোমাদের অন্য কোরআন আছে। সব কিছু সেখান থেকেই নাও।

এটা আসলে একটু ভিন্ন আকারে ও একটু আধুনিক মোড়কে নাযর ইবনুল হারেসদেরই অপকৌশল। ইসলামের বিরুদ্ধে যুগ যুগ কাল যে চক্রান্ত হয়ে আসছে, এটা তারই ধারাবাহিকতা।

কিন্তু কোরআনের বিস্ময় এই যে, এত দীর্ঘ ও জটিল চক্রান্ত সত্তেও সে বিজয়ী হয়েই চলেছে। কোরআনের এমন কিছু বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য এবং মানব প্রকৃতির ওপর তার এমন কিছু দুর্দমনীয় ক্ষমতা ও কার্যকারিতা রয়েছে, যা তাকে সারা পৃথিবীর সব ধরনের জাহেলিয়তি এবং সকল দেশে ও সর্বকালে ইহুদী ও খৃষ্টানদের তৈরী সকল বাধা বিপত্তির ওপর বিজয়ী করে থাকে।

এ কোরআন সারা পৃথিবীতে বিরাজমান তার শত্রুদেরকেও তাদের সকল সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে প্রচার করার একটা বিষয় হিসাবে তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। ইহুদী, খৃষ্টান ও তাদের মুসলিম নামধারী ক্রীড়নকরাও কোরআনকে প্রচার করতে বাধ্য হচ্ছে।

এ কথা সত্য যে, মুসলিম নামধারীদের মনে কোরআনকে নিছক সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তিযোগ্য অথবা তাবিজ হিসাবে ধারণযোগ্য, কেতাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পর এবং জীবন বিধানের উৎস হিসাবে কোরআনের পরিবর্তে অন্য বিকল্প প্রতিষ্ঠিত করার পরই তার প্রচার ও সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এ গ্রন্থ এই ষড়যন্ত্রের আড়ালে বসেও নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। পৃথিবীর দিকে দিকে, কোণে কোণে ও দেশে দেশে বহু মুসলিম সংগঠন কোরআনকে আইন ও বিধানের উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আন্দোলন করে যাচ্ছে। তারা হাজারো যুলুম নিপীড়ন, হত্যা ও ষড়যন্ত্র সহ্য করেও কেবল আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্যের অপেক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

সত্যের মোকাবেলায় কাফেররা যে বিস্ময়কর হঠকারিতা দেখায়, পরবর্তী আয়াতে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অথচ এই সত্যের তারা যতোই বিরোধিতা করুক, তা তাদের ওপর বিজয়ীই হয়ে থাকে। কিন্তু হঠকারিতা ও অহংকার তাদেরকে সত্যের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং তার ক্ষমতা ও অধিপত্যের স্বীকৃতি দিতে দেয় না। উপরন্তু তারা আল্লাহর কাছে আবেদন জানায় যে, এই দাওয়াত যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সত্য হয়, তাহলে তিনি যেন তাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করেন অথবা কোনো কঠিন শাস্তি দেন। আল্লাহর কাছে সত্যের অনুকরণ ও তার পক্ষে অবস্থান গ্রহণের প্রেরণা চাওয়ার পরিবর্তে তারা আযাব কামনা করে। ৩২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন!

'(স্মরণ করো,) যখন তারা বলেছিলো যে, হে আল্লাহ, এটা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো, অথবা কোনো কঠিন শাস্তি নিয়ে এসো।'

এ একটা অদ্ভুত দোয়া। সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের চাইতে ধ্বংস হয়ে যেতেও সম্মত এমনি এক চরম হঠকারিতার দৃশ্য এতে প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের বিবেক ও স্বভাব যখন সুস্থ থাকে, তখন সে কোনো ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে আল্লাহর কাছে ওই সন্দেহ দূর করে সত্যকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়া ও সত্যের পথে পরিচালিত করার আবেদন জানায়। এতে সে আদৌ

কোনো কুণ্ঠা অনুভব করে না। কিন্তু যখন তা অহংকার ও হঠকারিতার দোষে দুষ্ট হয়, তখন তা পাপকেই সম্মান ও আভিজাত্যের প্রতীক মনে করে এবং আযাব ও ধ্বংসের শিকার হওয়াকেই অগ্রাধিকার দেয়। এমনকি সত্য তাদের সামনে সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশিত হলেও তার সামনে নতি স্বীকার করতে চায় না। এ ধরনের অহংকার ও হঠকারী মনোভাব নিয়েই মক্কার মোশরেকরা রসূল (স.)-এর দাওয়াতের মুখোমুখিই হতো। কিন্তু এই দুর্ভেদ্য হঠকারিতা সত্তেও ইসলামী আন্দোলন ও দাওয়াত শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিলো।

পরবর্তী (৩৩ ও ৩৪) আয়াতে আল্লাহ এই হঠকারিতা ও এই দোয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, তারা তাদের প্রত্যাশা মোতাবেক আকাশ থেকে পাথর নিক্ষেপ ও আসমানী আযাবের যোগ্য হয়েছিলো। কেননা তারা বলেছিলো, এই দাওয়াত যদি সত্য হয়, তবে তাদের ওপর পাথর বৃষ্টি অথবা অন্য কোনো আযাব আসুক। আর ওই দাওয়াত যথার্থই সত্য ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সেই নিপাতকারী আযাব নাযিল করেননি, যা তাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের ওপর নাযিল হয়ে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো। কারণ রসূল (স.) তাদের মধ্যে এখনো অবস্থান করে তাদেরকে সত্যের পথে আসার দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন। রসূল (স.)-এর উপস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা একটা জাতিকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেন না। অনুরূপভাবে তারা ক্ষমাপ্রার্থী হলেও আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেন না। তবে আযাব বিলম্বিত করার কারণ এটা নয় যে, তারা কাবা শরীফের অভিভাবক, কা'বা শরীফের অভিভাবক হলো খোদাভীরু মোমেনরা।

'তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান না.........(আয়াত ৩৩, ৩৪ ও ৩৫)

এ হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তাদের আযাবকে বিলম্বিত করেছিলো। তাদের হঠকারিতা ও মাসজিদুল হারামে যেতে মুসলমানদেরকে বাধা দেয়া সত্তেও আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেননি। অথচ তারা বাধা দিলেও মুসলমানরা কখনো কাউকে বাধা দেয়নি এবং কাউকে উস্কানিও দেয়নি।

আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি দয়াপরশ হয়ে তাদেরকে অবকাশ দিয়েছিলেন এজন্যে যে, রসূল (স.) তাদের মধ্যে বিদ্যমান থেকে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই দাওয়াতে বিলম্বে হলেও কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করতে পারে বলে আশা করা যাচ্ছিলো। সুতরাং তাদের ভেতরে রসূল (স.)-এর উপস্থিতির সম্মানার্থেই তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছিলো। আর এ দ্বারা এ কথাও বুঝানো হচ্ছিলো যে, তারা ইসলামের দাওয়াতকে গ্রহণ করলে, ক্ষমা চাইলে ও সত্যের সামনে নতি স্বীকার করলে আল্লাহর সর্বনাশা আযাব থেকে তাদের নিষ্কৃতি লাভের পথ সব সময়ই খোলা আছে। (আয়াত ৩৩)

তবে আল্লাহ তায়ালা যদি তাদের কর্মফলই দিতেন, তবে তারা আযাবের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছিলো। (আয়াত ৩৪)

তারা হযরত ইবরাহীমের উত্তরাধিকারী এবং আল্লাহর ঘরের রক্ষক ও সেবক হবার দাবীদার বলেই যে তাদের আযাব বিলম্বিত হয়েছিলো, তা নয়। কেননা তাদের এ দাবীর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। তারা প্রকৃতপক্ষে কাবা শরীফের সেবক রক্ষকও নয়, তার মালিকও নয়। বরঞ্চ তারা ওই ঘরের শত্রু ও জবরদখলকারী। আল্লাহর ঘর উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরিত হয় না। আল্লাহর ঘরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তাঁর বন্ধুরা ও খোদাভীরু বান্দারা। তাদের হযরত ইবরাহীমের উত্তরাধিকারী হবার দাবীও অনুরূপ ভিত্তিহীন। কেননা ইবরাহীম (আ.)-এর উত্তরাধিকার কোনো বংশীয় উত্তরাধিকার নয়। এটা একটা আকীদা আদর্শ ও জীবন বিধানের উত্তরাধিকার। যারা

খোদাভীরু মোমেন, তারাই হযরত ইবরাহীম ও তাঁর নির্মিত ঘরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। অথচ ইবরাহীমের আনীত জীবন বিধানের অনুসারী কা'বা শরীফের প্রকৃত সেবকদেরকে তারা তার কাছেও ঘেঁষতে দেয় না।

মোশরেকরা যদিও কাবা শরীফের চত্বরে তাদের নিজস্ব নিয়মে নামায পড়ে থাকে, কিন্তু তবু তারা এ ঘরের সেবক রক্ষক নয়। কেননা ওটা আসলে নামায ছিলো না। তারা কেবল মুখ দিয়ে ধ্বনি দিতো ও হাত দিয়ে তালি দিতো। আর হৈ চৈ করতো। তাতে কাবা শরীফের প্রতি সম্মানও রক্ষিত হতো না এবং আল্লাহর ভক্তিও প্রকাশ পেতো না।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, মোশরেকরা মাটির সাথে মুখমন্ডল মেশাতো, হাতে তালি দিতো এবং মুখে ধ্বনি দিতো।

আজকাল 'মুসলিম দেশ' নামে পরিচিত বহু দেশে বিভিন্ন মাযারে ও পবিত্র স্থানে এক ধরনের লোকেরা তালে তালে বাদ্য বাজায়, হাতে তালি দেয়, ধ্বনি দেয় ও বেদীতে মুখমন্ডল ঘষে। এগুলোও জাহেলিয়াতেরই বিভিন্ন রূপ ও আচার অনুষ্ঠান। তবে জাহেলিয়াতের সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক রূপ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর এক বান্দা কর্তৃক আরেক বান্দার গোলামী করা ও মানব জীবনের ওপর আল্লাহর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে তাঁর বান্দাদের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই সর্ববৃহত রূপটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন অন্য সকল রূপ তারই শাখা-প্রশাখা মাত্র।

'অতএব তোমাদের কুফরীর ফল স্বরূপ আযাব ভোগ করো।'

এখানে আযাব দ্বারা বদরের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে মোশরেকরা যে শাস্তি পেয়েছিলো, সেটাকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু যে আযাব দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সাধারণত কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যে আযাব মক্কার কাফেররা চেয়েছিলো, সেটা আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি দয়াবশত তাঁর নবীর সম্মানার্থে ও তাদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির কারণে মুলতবী করেছেন, হয়তো একদিন তারা তওবা করে ও ক্ষমা চেয়ে তা থেকে ফিরে আসবে।

হক ও বাতিলের চিরন্তন সংঘাত

এরপর ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, কাফেররা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে অর্থ ব্যয় করে থাকে, বদরের যুদ্ধের দিনও তারা এরূপ করেছে। আমি ইতিপূর্বে সীরাত সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে এ সম্পর্কে উদ্ধৃতিও দিয়েছি। বদরের পরও তারা এভাবে পরবর্তী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু এই ব্যয় তাদের জন্যে ব্যর্থতা ও অনুশোচনাই ডেকে এনেছিলো এবং দুনিয়ার পরাজয় ও আখেরাতে জাহান্নামের শাস্তিকে অবধারিত করে তুলেছিলো। (আয়াত ৩৫, ৩৬ ও ৩৭)

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, কোরায়শ গোত্র বদরে শোচনীয় পরাজয় বরণ করার পর মক্কায় ফিরে গেলো এবং আবু সুফিয়ান ও তার কাফেলা নিয়ে ফিরে গেলো। তখন বদর যুদ্ধে পিতা-পুত্র ও ভাইকে হারিয়েছে এমন কিছু লোক আবু সুফিয়ানের কাছে গেলো। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো রবীয়ার ছেলে আবদুল্লাহ, আবু জেহেলের ছেলে ইকরামা ও উমাইয়ার ছেলে উমাইয়া। তারা আবু সুফিয়ান ও তার বাণিজ্যিক কাফেলার অন্যান্য সদস্যকে বললো, মোহাম্মদ তো আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে হত্যা করে আমাদের অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করেছে। কাজেই এই সহায় সম্পদগুলো দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করো, যেন আমরা তার সাথে যুদ্ধ করে আমাদের নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ নিতে পারি। এতে আবু সুফিয়ান ও তার সাথীরা সম্মত হয়ে গেলো। ইবনে আব্বাসের মতানুসারে, এদের সম্পর্কেই এই আয়াতগুলো নাযিল হয়।

বদর যুদ্ধের আগে ও পরে সংঘটিত এ ঘটনা ইসলামের শত্রুদের কর্মকান্ডের একটা চিরন্তন দৃষ্টান্ত। তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফেরানো, ইসলামের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা ও মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে পৃথিবীর সকল দেশে সর্বকালেই চেষ্টা করে থাকে।

এ যুদ্ধ কোনো দিন থামবে না। ইসলামের শত্রুরা ইসলামকে ও মুসলমানদেরকে কখনো শান্তিতে থাকতে দেবে না। ইসলামের চিরন্তন পথ হলো জাহেলিয়তের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে থাকা। আর মুসলমানদের কতর্ব্য হলো, জাহেলিয়তের আগ্রাসনের ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়া ও আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা, যাতে খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তি তাদের ওপর আক্রমণ করার স্পর্ধা না দেখায়। মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফেরানোর জন্যে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে চেষ্টারত কাফেরদেরকে আল্লাহ তায়ালা এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, একদিন তাদেরকে পস্তাতে হবে। তাদের সমস্ত অর্থ ব্যয় বিফলে যাবে। পৃথিবীতে তারা পরাজিত ও সত্য জয়ী হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে জাহান্নামে গিয়ে সবচেয়ে বড় অনুতাপের সম্মুখীন হতে হবে।

এভাবেই 'যাতে আল্লাহ তায়ালা ভালো থেকে মন্দকে বাছাই করেন........'

এই বাছাই কিভাবে সংঘটিত হবে?

কাফেররা যে অর্থ ব্যয় করে থাকে, তা বাতিলের শক্তি বৃদ্ধি করবে এবং আগ্রাসন বৃদ্ধি করবে। আর সত্য সর্বশক্তি নিয়ে জেহাদ ও আন্দোলনের মাধ্যমে বাতিলের শক্তি চূর্ণ করার লক্ষ্যে মোকাবেলা করবে। এই তিক্ত সংঘর্ষে হক ও বাতিল এবং হকের সমর্থক ও বাতিলের সমর্থকরা চিহ্নিত হয়ে যাবে। এমনকি যারা কঠিন অগ্নিপরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের আগে ইসলামের কাতারে শামিল হয়েছে, তাদের মধ্যেও বাছাই সম্পন্ন হবে। যারা পরীক্ষায় ধৈর্যশীল ও কষ্ট সহিষ্ণু প্রমাণিত হবে এবং আল্লাহর সাহায্য লাভের যোগ্য হবে, তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে। কেননা তারা আল্লাহর দায়িত্ব বহন ও পালনের যোগ্য বলে এবং কঠিন বিপদ ও নির্যাতনের মুখেও তাতে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী নয় বলে প্রমাণিত হবে। তখনই আল্লাহ তায়ালা মন্দদেরকে আলাদাভাবে একত্রিত করে জাহান্নামে পাঠাবেন। এটাই তাদের চরম ক্ষতি।

কোরআনের ব্যতিক্রমধর্মী বাচনভংগি এখানে 'খবীস' বা মন্দ লোককে একটা আবর্জনা হিসেবে গণ্য করেছে, যা স্তূপীকৃত করা হবে ও কোনো বাছ-বিচার না করে ও গুরুত্ব না দিয়েই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটা কোরআনের অত্যন্ত প্রভাবশালী বাচনভংগি।

পারস্পরিক সহযোগিতায় লিপ্ত কুফরী শক্তি ও স্তূপীকৃত 'খবীস' তথা মন্দ লোকদের পরিণতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পর পরবর্তী আয়াতে রসূল (স.)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তিনি কাফেরদেরকে সর্বশেষ হুশিয়ারী ও চূড়ান্ত ও চরমপত্র দিয়ে দেন। সেই সাথে মুসলমানদেরকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে ফেতনা অর্থাৎ বাতিলের আধিপত্য ও যুলুম নির্যাতন যতোদিন থাকবে এবং সকল মানুষের বশ্যতা ও আনুগত্য আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট না হয়ে যাবে, ততোদিন যেন তারা লড়াই চালিয়ে যায়। সংগে সংগে জেহাদরত মুসলমানদেরকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অভিভাবক ও সহায়। কাজেই কোনো যুদ্ধ বা চক্রান্ত দ্বারা কেউ তাদেরকে পরাভূত করে দিতে পারবে না।

'তুমি কাফেরদেরকে বলে দাও, তারা যদি কুফরী থেকে ফিরে আসে, তাহলে তাদের অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। .... (আয়াত ৩৮, ৩৯ ও ৪০)

ইতিপূর্বে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেরদের সকল ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নস্যাৎ হবে, তাদের অর্থ ব্যয়ের ওপর অনুশোচনা করতে হবে এবং দুনিয়ার জীবনে চরম লাঞ্ছনা ও অনুশোচনার পর ওই সব মন্দ লোককে স্তূপীকৃত করে জাহান্নামে পাঠাবেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে যে, তুমি তাদেরকে বলে দাও, তারা যদি কুফরী থেকে ফিরে আসে, তাহলে তাদের অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে। আর যদি তারা কুফরীর পুনরাবৃত্তি করতেই থাকে, তাহলে পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে।

অর্থাৎ তাদের সামনে এখনো সুযোগ রয়েছে যে, তারা তাদের কুফরী থেকে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জনবল সংগঠিত করা থেকে এবং আল্লাহর পথ হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করা থেকে বিরত হতে পারে। এসব কিছু থেকে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার পথ তাদের সামনে এখনো উন্মুক্ত। যদি ফিরে আসে, তাহলে তাদের অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। কেননা ইসলাম অতীতের সব কিছু ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। মানুষ যখন ইসলামে প্রবেশ করে, তখন সদ্য প্রসূত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়েই প্রবেশ করে। কিন্তু এ সব সত্তেও তারা যদি তাদের কুফরীতেই অবিচল থাকে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনী নীতি অব্যাহত রাখে, তাহলে অতীতের কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহর যে নীতি ছিলো, তাতে কোনো পরিবর্তন হবে না। আল্লাহর চিরাচরিত নীতি এই যে, তিনি প্রথমে তাঁর দ্বীনকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ ও প্রচার করেন। অতপর যারা তা প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে শাস্তি দেন, আর যারা তা গ্রহণ ও সমর্থন করে, তাদেরকে সাহায্য, বিজয় ও আধিপত্য দান করেন। এই নীতি অপরিবর্তনীয়। যারা কাফের, তাদের জন্যে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ অবারিত রয়েছে।

ইসলামে জেহাদের তাৎপর্য

এ পর্যন্ত কাফেরদের সাথে কথা শেষ হয়েছে। পরবর্তী দুটি আয়াতে মোমনদেরকে বলা হয়েছে,

'তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকো, যতোক্ষণ সকল ফেতনা নির্মূল হয়ে যায় .... (আয়াত ৩৯ ও ৪০)

এটা শুধু সে যুগের নয়, বরং সকল যুগেই আল্লাহর পথে জেহাদের সীমারেখা। এ সূরার যুদ্ধ ও শান্তির আইন সংক্রান্ত আয়াতগুলো সর্বশেষ আয়াত নয়, বরং এ বিষয়ে সর্বশেষ আয়াত রয়েছে সূরা তাওবায়, যা নবম হিজরীতে নাযিল হয়েছে। বর্তমান সূরার ভূমিকায় আমি বলেছি যে, ইসলাম এমন একটা ইতিবাচক আন্দোলন, যা মানুষের বাস্তব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দেয়। ইসলাম এমন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পর্যায়ক্রমিক আন্দোলন, যার প্রতিটি পর্যায়ে তার সকল বাস্তব চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা তাতে রয়েছে। কিন্তু 'কাফেরদের সাথে ততোক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাও, যখন আর কোনো ফেতনা অবশিষ্ট থাকবে না এবং সকল আনুগত্য আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে'– আল্লাহর এই উক্তি থেকে জানা যায় যে, জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামী আন্দোলনের সংঘাত একটা স্থায়ী ও চিরন্তন ব্যাপার। সূরার ভূমিকায় আমি আরো বলেছি যে, ইসলাম পৃথিবীতে এসেছেই আল্লাহর বান্দাদের গোলামী থেকে ও প্রবৃত্তির গোলামী থেকে মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার সার্বজনীন ঘোষণা হিসাবে। বস্তুত প্রবৃত্তির দাসত্বও বান্দার দাসত্বের পর্যায়ভুক্ত। এ জন্যে সে বিশ্বজগতে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ও রব হিসাবে ঘোষণা করে। এই ঘোষণার অর্থ হলো, মানুষের সর্ব প্রকারের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিপ্লব এবং মানুষের সর্বময় কর্তৃত্ব সম্বলিত যে কোনো বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিদ্রোহ।

এই গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে দুটো মৌলিক জিনিস একান্ত জরুরী। প্রথমত, যারা ইসলামকে গ্রহণ করার মাধ্যমে মানুষের সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান, আল্লাহর দাসত্বকে গ্রহণ এবং আল্লাহর বান্দাদের গোলামী যতো রকমের হতে পারে, তার সবগুলো থেকে মুক্ত হবার ঘোষণা দেয়, তাদেরকে যুলুম নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু এই সার্বজনীন ঘোষণায় বিশ্বাসী একটা আন্দোলনরত ইসলামী সংঘঠন গঠিত না হলে তাদেরকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। এই সংগঠনকে ইসলামের জন্যে আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে ইসলামকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। উপরন্তু ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর অত্যাচার চালায় কিংবা ইসলাম গ্রহণেচ্ছুদেরকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাধা দেয়- এমন তাগূতী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইও করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীতে মানুষের গোলামীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সকল শক্তিকে ধ্বংস করতে হবে, তা সে যে কোনো আকারেই বিরাজ করুক না কেন। উপরোক্ত প্রথম উদ্দেশ্যটাকে নিশ্চিত করার জন্যেই এটার প্রয়োজন। তা ছাড়া পৃথিবীতে আল্লাহর একক ও সর্বময় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর 'দ্বীন' ছাড়া আর কোনো দ্বীন অবশিষ্ট না থাকে তার ব্যবস্থা করার জন্যেও সকল খোদাদ্রোহী শক্তিকে নির্মূল করা জরুরী। কেননা এখানে 'দ্বীন' শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও আধিপত্যের আনুগত্য, শুধু বিশ্বাস করা নয়।

তবে এই বক্তব্যের ব্যাপারে একটা খটকা কারো কারো মনে থাকতে পারে। সেই খটকা দূর করা আবশ্যক বলে মনে হচ্ছে। সেই খটকাটা এই যে, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। সত্য-অসত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে।' আল্লাহর এই উক্তির সাথে দ্বীন কায়েমের জন্যে লড়াই করার আদেশ কতোখানি মানান সই?

যদিও ইতিপূর্বে আমি ইসলামে জেহাদের তাৎপর্য সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, বিশেষত উস্তাদ আবুল আ'লা মওদূদীর পুস্তক 'আল্লাহর পথে জেহাদ' থেকে যে উদ্ধৃতি পেশ করেছি, তা এ খটকা দূর করার জন্যে যথেষ্ট। তথাপি এ বিষয়টা আমি আরো পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করতে চাই। কেননা ইসলামের কুচক্রী শত্রুরা এ বিষয়টা নিয়ে প্রচুর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

'সকল আনুগত্য আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে'- এই কথাটার অর্থ হলো, স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থায় যে সব বস্তুগত বাধা বিদ্যমান থাকে এবং যে সব বাধার কারণে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা শৃংখলিত হয়ে পড়ে, সেই বাধাগুলো দূর হওয়া চাই। দূর হওয়ার পর পৃথিবীতে আল্লাহর আধিপত্য ও পরাক্রম ছাড়া আর কারো আধিপত্য ও পরাক্রম থাকবে না এবং আল্লাহর বান্দারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকবে না। এ সব বাস্তব বাধা দূর হয়ে গেলে মানুষ পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং সব রকমের চাপ ও বলপ্রয়োগের উর্ধে উঠে যাবে। সেখানে ইসলাম বিরোধী আকীদা বিশ্বাস এতোটা শক্তিধর হবে না যে, বস্তুগত শক্তির জোরে কারো ওপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে এবং ইসলাম গ্রহণেচ্ছুদেরকে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস গ্রহণে বাধা দিতে পারে। যারা আল্লাহর প্রভুত্ব ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব মানে না এবং কার্যত পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায়, তাদের ওপর কোনো যুলুম নির্যাতন হবে না। এরূপ পরিবেশে মানুষ যে কোনো আকীদা বিশ্বাস গ্রহণে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তেমন মর্যাদা সে কেবল তখনই লাভ করে এবং পৃথিবীতে মানুষ কেবল তখনই পূর্ণ স্বাধীন হয়, যখন সমস্ত আনুগত্য ও দাসত্ব কেবল আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয় এবং আল্লাহর প্রভুত্ব ছাড়া আর কারো প্রভুত্বের আনুগত্য তাকে করতে হয় না।

এই মহৎ উদ্দেশ্যেই মোমেনরা লড়াই করে থাকেঃ

'যতোক্ষণ আর কোনো ফেতনা অবশিষ্ট না থাকে এবং সমস্ত আনুগত্য শুধু আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়'।

যে ব্যক্তি এই আদর্শকে গ্রহণ করে ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে, মুসলমানরা তার কাছ থেকে তার ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণের ঘোষণাকে মেনে নেবে এবং তার উদ্দেশ্য কী এবং আন্তরিকতা আছে কিনা, তা অনুসন্ধান করবে না। এ বিষয়টা তারা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করবে।

'যদি তারা কুফরী থেকে নিবৃত্ত হয়, তাহলে তাদের তৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকেফহাল।'

আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহর প্রভুত্বকে প্রতিরোধ করার ওপর যেদ ধরে, তার সাথে মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্যের ওপর নির্ভর করে লড়াই করবে।

'যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রেখো, তোমাদের অভিভাবক আল্লাহ। তিনি চমৎকার অভিভাবক এবং চমৎকার সাহায্যকরী।'

এ হচ্ছে ইসলামের দায়-দায়িত্ব ও বাস্তবতা। ইসলাম চায় মানুষের বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে এবং আল্লাহর একক প্রভুত্ব কায়েম করতে।

ইসলাম কেবল একটা মতবাদ নয় যে, তারা একখানা বই পড়ে তা শিখবে, মানসিক তৃপ্তি ও জ্ঞানের প্রাচুর্য দ্বারা সমৃদ্ধ হবে। অনুরূপভাবে তা কোনো নেতিবাচক আদর্শও নয় যে, কেবল আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন সৃষ্টির মধ্যেই তা সীমিত থাকবে। এটা নিছক আনুষ্ঠানিক এবাদাত উপাসনার সমষ্টিও নয় যে, এগুলো আদায় করলেই বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক অটুট হয়ে যাবে।

ইসলাম হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র। সেই সাথে তা একটা বাস্তব আন্দোলনের কর্মসূচীও। যথাযোগ্য উপায়-উপকরণে সজ্জিত হয়ে সে মানুষের জীবনে সংস্কার ও সংশোধন করে। প্রচারের মাধ্যমে সে মানুষের বুঝা ও জানার বাধা দূর করে। আর খোদাদ্রোহী স্বৈরাচারী শাসনের বাধা দূর করে আল্লাহর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সে জেহাদ করে।

ইসলামী আন্দোলন মানুষের সংস্কার ও সংশোধনের আন্দোলন। ইসলামের সাথে জাহেলিয়াতের সংঘাত নিছক তাত্ত্বিক সংঘাত নয়। জাহেলিয়াতের নিজস্ব একটা সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা রয়েছে। সেই জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামকে উপযুক্ত উপায়-উপকরণ দ্বারা সংগ্রাম চালাতে হবে এবং সে জন্যে ইসলামেরও সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা থাকা দরকার। অতপর সমস্ত আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্যে রূপান্তরিত করার জন্যে ইসলামকে সর্বাত্মক জেহাদ চালাতে হবে।

এই হচ্ছে ইসলামের বাস্তব ও ইতিবাচক আন্দোলনের কর্মপন্থা। প্রতারিত ও পরাজিত ব্যক্তিরা যতোই সৎ ও আন্তরিক মুসলমান হোক না কেন, তাদের বিবেক ও মনে ইসলামের সঠিক রূপটি অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তাই তাদের বক্তব্য ধর্তব্য নয়।

সূরা আনফালের দশম পারাভুক্ত অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বর্তমান পারাটি শুরু হচ্ছে সূরায়ে আনফালের অবশিষ্ট বিষয়সমূহ নিয়ে। সূরার শুরুর দিকে নবম পারায় তার আলোচনা এসেছে। এই পারার এই বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে সূরায়ে তাওবার আলোচনা। আমি প্রথমে সূরা আনফালের সেই অবশিষ্ট অংশটি আলোচনা করবো। পরে সূরা তাওবার আলোচনা তার যথাস্থানে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আগের পারায় সূরার যে অংশটির আলোচনা শেষ হয়েছে, তাকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে আমরা প্রথম স্তর বলতে পারি। আর বর্তমানের আলোচনাকে বলা যেতে পারে দ্বিতীয় স্তর। উভয় স্তর ও এর বিষয়াবলীর মাঝে গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, বর্তমানের আলোচনায় আগের আলোচনার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে উভয় স্থানের আলোচনা ও তার বিষয়াবলী একই ধরনের। বড়ো জোর একথা বলা যেতে পারে যে, সময়ের দিক থেকে প্রথম অংশটি ছিলো প্রথম সময়ের কথা আর দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে দ্বিতীয় সময়ের কথা। বিষয়বস্তুসমূহের বর্ণনাধারা বজায় রাখার জন্যে আগের স্তরের আলোচনার প্রতি একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। এই উভয় আলোচনার মাঝে একটি বিস্ময়কর মিল লক্ষ্য করা যাবে।

প্রথম অংশের আলোচনা শুরু হয়েছে 'আনফাল' সম্পর্কিত প্রশ্ন ও তার কিছু মত বৈষম্য দিয়ে(১)। আল্লাহ তায়ালা এই মতবিরোধে তাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে মনোনিবেশ করতে বললেন। তাদেরকে তিনি তাকওয়ার দিকে ডাকলেন। বললেন, এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিষয়। তোমাদের এ ব্যাপারে কোনো মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তাদের সামনে ঈমানের তাৎপর্য পরিষ্কার করে বলে দেয়া হলো– তারা কিভাবে ঈমানের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারে তাও তাদের বলা হলো। অতপর তাদের সামনে এই কথাটা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হলো যে, যে বিজয়েলব্ধ গনীমতের মাল সম্পর্কে তোমরা মতবিরোধিতা করো তা মূলত সম্পূর্ণত আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর কৌশলেই সাধিত হয়েছে। এ ব্যাপারে তোমাদের ভূমিকা নিতান্ত তুচ্ছ। বদরের চিত্র ও ঘটনাবলী আরেক বার স্মরণ করো, সে সময়ের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করো। দেখতে পাবে সব কিছু ছিলো একমাত্র আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ, তাঁর শক্তি ক্ষমতা ও কৌশলেরই পরিণতি– জ্ঞান কৌশল ছিলো তাঁর, সাহায্য ছিলো তাঁর, ইচ্ছা ছিলো তাঁর। মুসলমানরা তো সেদিন ছিলো আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়নের একটি বাহ্যিক উপকরণ মাত্র। আল্লাহর সরাসরি সাহায্যেই তোমাদের এই বিশাল বিজয় সাধিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ময়দানে তোমাদের সুদৃঢ় করে রেখেছেন, তোমাদের দুশমনদের তিনি অপমানিত করেছেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের এই বলে সাবধান করেছেন যেন তারা আল্লাহ ও তাঁর দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে এবং কখনো যেন অর্থ ও সন্তানের ধোকায় তারা পতিত না হয়। রসূলকে আদেশ দেয়া হয়েছে তিনি যেন পরিণাম সম্পর্কে কাফেরদের সাবধান করে দেন। যদি তারা এখনো ঈমান আনে, তাহলে তাদের ঈমান গ্রহণ করা হবে। তাদের অভ্যন্তরীণ নোংরামির বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়া হবে। অপরদিকে মোমেনদের আদেশ দেয়া হয়েছে যদি কাফেররা ঈমান না আনে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের মোকাবেলা করবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর যমীন থেকে কুফর ও শেরেকের ফেতনা নির্মূল হয়ে দ্বীন সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্যেই প্রতিষ্ঠিত না হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচিত বিষয়সমূহের ধরনও প্রায় একই গতিতে চলছে। এই অংশ শুরু হচ্ছে গনীমতের মালের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান বর্ণনা করার মাধ্যমে। প্রথম পর্যায়ে এই সিদ্ধান্তকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। এখানে তাদের আল্লাহর ওপর

(১) মত-পার্থক্য একারণে দেখা দিয়েছিলো যে, বদরের যুদ্ধই ছিলো প্রথম সময়– যখন মুসলমানরা গনীমতের মাল সম্পর্কে জানতে পারলো। এর আগে তাদের এ বিষয় সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না। –সম্পাদক

ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে হক ও বাতিলের মাঝে চূড়ান্ত পার্থক্য নির্ণয়কারী (বদরের) দিন– যেদিন উভয় দল মোকাবেলার জন্যে এক জায়গায় মিলিত হয়েছিলো– এ ব্যাপারে যে বিধান নাযিল হয়েছে তার শিক্ষার ওপর ঈমান আনার কথা। অতপর যে যুদ্ধে আল্লাহর কতিপয় অমোঘ সিদ্ধান্ত ও কিছু কৌশলের কথা বলা হয়েছে– যার পরিণতিতেই গনীমতের মালের বিষয়টি মুসলমানদের হাতে এসেছে। যুদ্ধের কিছু চিত্রও এখানে পেশ করা হয়েছে– যাতে আল্লাহর ফয়সালা ও কৌশলসমূহ পরিষ্কার করে সামনে এসেছে। এটাও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, যুদ্ধের ময়দানে মোমেনরা ছিলো শুধু আল্লাহর কৌশল বাস্তবায়নের হাতিয়ার ও বাইরের আবরণ মাত্র। সমগ্র বিষয়টি তো ছিলো মূলত আল্লাহর হাতে এবং তিনিই যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন– অতপর তাদের আদেশ দিয়েছেন– যখন তারা সত্যি সত্যিই কাফেরদের মোকাবেলা করবে, তখন যেন তারা এই বিষয়গুলো মেনে চলে- ময়দানে অটল হয়ে দাঁড়ানো, বেশী বেশী আল্লাহর যেকের করা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা, অনৈক্য ও বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকা– কারণ একবারের অনৈক্য বিজয়ের যাবতীয় সম্ভাবনাকে শেষ করে দেয় এবং যোদ্ধাদের কাপুরুষ বানিয়ে দেয়। অতপর তাদের ধৈর্য ধারণ করা, জেহাদের ময়দানে লম্ফ ঝম্প করে অহংকার করা থেকে বেঁচে থাকা, কাফেরদের পরিণাম থেকে সতর্ক হওয়া– যারা গর্ব ও অহংকার সহকারে নিজেদের ঘর বাড়ি থেকে বেরিয়েছে– সর্বোপরি যারা মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখছে, তারা প্রকারান্তরে শয়তানের ধোকায় পড়ে গেছে। মোমেন সর্বাবস্থায় শুধু একমাত্র আল্লাহর ওপর তায়াক্কুল করবে, যে আল্লাহ তায়ালা নিজের ফয়সালায় সাহায্য প্রেরণে সর্বশক্তিমান, নিজের কৌশল বাস্তবায়নে যিনি বিজ্ঞ কুশলী। অতপর ঈমানদারদের সামনে এটা দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কাফের ও মিথ্যুকদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি কি– যেভাবে আগের অংশে দেখানো হয়েছে ফেরেশতারা মোমেনদের অটল রাখার জন্যে সাহায্য করছেন, তারা কাফেরদের গর্দানে ও হাতে আঘাত করছেন। ঠিক একই ভাবে এখানে দেখানো হয়েছে, ফেরেশতারা নিতান্ত অপমানজনক ভাবে তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। আগের অংশে কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা হচ্ছে নিকৃষ্টতম জন্তু। এখানে তাদের জন্তুসম গুণের পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। অতপর তাদের বিশ্বাসঘাতকতা বর্ণনা করে যুদ্ধ ও সন্ধির সময়ে তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে তা বলা হয়েছে। এগুলো ইসলামী ফৌজ ও অনৈসলামী ফৌজের মাঝে সম্পর্কের বিস্তারিত নীতিমালা পেশ করেছে। যুদ্ধ ও শান্তি সম্পর্কিত এই বিধানগুলোর অনেকগুলোই হচ্ছে প্রথম দিকের বিষয়। আবার কিছু বিধান যা শেষ হয়েছে সূরা তাওবাতে। কিছু কিছু আবার শেষের দিকের বিধানও রয়েছে। প্রথম পর্যায়ের আলোচনা ও দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা ও তার বিষয়সমূহের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় একই ধরনের ইসলামী সেনাবাহিনী ও কাফের বাহিনীর মাঝে সম্পর্কের ব্যাপারে বিধি-বিধানের বিস্তারিত বিবরণও পেশ করা হয়েছে।

সূরার শেষের দিকে এসে আরো অন্য ধরনের কিছু বিষয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, যেগুলো প্রথম বিধানের সাথে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত এবং তাকে মনে হয় বর্তমান বিধান দ্বারা পূর্ণতা প্রদান করা হয়েছে। রসূল স্বয়ং নিজে এবং তাঁর সাথে যেসব ঈমানদার বান্দা শামিল রয়েছেন তারাও আল্লাহকে স্মরণ করেন। আল্লাহর প্রভূত রহমত ও তার ফলে তাদের অন্তকরণের পরিবর্তন আসা যা কোনো অবস্থায় আল্লাহর রহমত ও তাঁর দয়া ছাড়া সম্ভবপর ছিলো না। মোমেনদের আরো বলে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালাই তাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি যথার্থই তাদের সাহায্য করবেন। রসূল (স.)-কে এখান থেকে আদেশ দেয়া হচ্ছে যেন তিনি মোমেনদের

যুদ্ধের জন্যে উৎসাহ দেন। মোমেন যদি যথার্থই পূর্ণাংগ ঈমানদার হয় এবং আল্লাহর ফয়সালায় কঠোর ধৈর্যধারণ করে, তাহলে তারা দশ গুণ দুশমনের ওপরও বিজয়ী হবে। কারণ দুশমনরা হচ্ছে বে-ঈমান, অজ্ঞ ও নির্বোধ। মোমেনদের ঈমানের অবস্থা যদি এতো মযবুত না হয়, তাহলে তাদের কমপক্ষে দিগুণ শত্রুর ওপর তো জয়লাভ করা উচিত। অবশ্য যদি তারা ধৈর্যধারণ করে। কারণ আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

অতপর আল্লাহ তায়ালা এই যুদ্ধে বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নেয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের ধমক দিয়েছেন। কারণ তখন পর্যন্ত মুসলমানরা কাফেরদের চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করতে পারেনি। শত্রুদের শক্তি পুরোপুরি খর্ব করা হয়নি। নিজেদের ক্ষমতা তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ বিধান বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও কর্মপদ্ধতির সীমা পরিসীমাও এখানে নিধারণ করে দিয়েছে। এতে একথাও বুঝা যায় যে, ইসলামী বিধানগুলো অবস্থার সব কয়টি পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। এ পর্যায়ে বন্দীদের সাথে আচরণ বিধিও বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে তাদের অন্তরে ঈমানকে আকর্ষণীয় করে তোলার বিশেষ পদ্ধতি ও কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং কি ভাবে তাদের অন্তরকে ইসলামের জন্যে প্রস্তুত করতে হবে। সাথে সাথে বন্দীদেরও কঠোরভাবে সাবধান করে বলা হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ ও তাঁর নবীর সাথে দ্বিতীয়বার বিশ্বাসঘাতকতা না করে। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে একবার তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে অপমানজনক শাস্তি দিয়েছেন তারা যদি পুনরায় সে কাজ করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তাদের আবার শাস্তি দেবেন।

শেষের দিকে এসে ইসলামী জামায়াতের বাইরের এবং ভেতরের কিছু বিধান দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি ও দল ইসলামে দাখিল হয় তার কিংবা তাদের সাথে ইসলামী সংগঠনের সম্পর্ক কেমন হবে, বিশেষ করে যখন তারা দারুল ইসলামের সাথে এখনো যুক্ত হয়নি। আবার সুনির্দিষ্ট অবস্থা ও পরিস্থিতিতে কাফেরদের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে, নিছক একটি আকীদা ও একটি আইন ব্যবস্থা হিসাবে এর বিধান কি হবে, ইসলামী জামায়াতের বিধান কি, মুসলিম উম্মতের ভেতরের-বাইরের বিষয়গুলো কি ভাবে ঠিক করা হবে– এসব কিছুও এখানে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামী ভিত্তিমূলের নিয়ম এর সামষ্টিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত। এই দ্বীনে আকীদা, শরীয়তের ব্যবহারিক ও বাস্তব অস্তিত্ব একটার চাইতে আরেকটা আলাদা কিছু নয়।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা পেশ করার পর আমরা কোরআনের আয়াতের বিস্তারিত আলোচনা করবো। (আয়াত ৪১-৫৪)

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ ۙ اِنْ کُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۴۱﴾ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْیَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰی وَالرَّکْبُ اَسْفَلَ مِنْکُمْ ؕ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِی الْمِیْعٰدِ ۙ وَلٰکِنْ لِّیَقْضِیَ اللّٰهُ اَمْرًا کَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَیِّنَةٍ وَّیَحْیٰی مَنْ حَیَّ عَنْۢ بَیِّنَةٍ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۴۲﴾ اِذْ یُرِیْکَهُمُ اللّٰهُ فِیْ مَنَامِكَ قَلِیْلًا ؕ وَلَوْ اَرٰىکَهُمْ کَثِیْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِی الْاَمْرِ وَلٰکِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ؕ اِنَّهٗ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۴۳﴾ وَاِذْ یُرِیْکُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَیْتُمْ فِیْٓ

৪১. (হে মোমেনরা,) তোমরা জেনে রেখো, যুদ্ধে যে সম্পদ তোমরা অর্জন করেছো, তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তায়ালার জন্যে, রসূলের জন্যে, (তাঁর) স্বজনদের জন্যে, এতীমদের জন্যে, মেসকীনদের জন্যে ও পথচারী মোসাফেরদের জন্যে, তোমরা যদি আল্লাহতে বিশ্বাস করো, (আরো) বিশ্বাস করো সে (বিজয়ঘটিত) বিষয়টির প্রতি, যা আমি হক ও বাতিলের চূড়ান্ত মীমাংসার দিন এবং একে অপরের মুখোমুখি হবার দিন আমার বান্দার ওপর নাযিল করেছিলাম; আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্ববিষয়ের ওপর একক ক্ষমতাবান। ৪২. (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকট প্রান্তে, তারা ছিলো দূর প্রান্তে, আর (কোরায়শ) কাফেলা ছিলো তোমাদের তুলনায় নিম্নভূমিতে; যদি তোমরা আগেই (এ ব্যাপারে) তাদের সাথে কোনো (অগ্রিম চুক্তির) সিদ্ধান্ত করতে চাইতে, তাহলে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তোমরা অবশ্যই মতবিরোধ করতে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাই ঘটাতে চেয়েছিলেন যা ঘটানো আল্লাহ তায়ালার মনযুর ছিলো (এ জন্যেই তিনি উভয় দলকে রণক্ষেত্রে সামনাসামনি করালেন, যাতে করে), যে দলটি ধ্বংস হবে সে যেন সত্য (মিথ্যা) স্পষ্ট হওয়ার পরই ধ্বংস হয়, আবার যে দলটি বেঁচে থাকবে সেও যেন সত্যাসত্য প্রমাণের ভিত্তিতেই বেঁচে থাকে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। ৪৩. (আরো স্মরণ করো,) আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যখন স্বপ্নে তাদের সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন, (তখন) যদি তিনি তোমাকে তাদের সংখ্যা বেশী দেখাতেন তাহলে অবশ্যই তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং এ বিষয়ে তোমরা একে অপরের সাথে বিতর্ক শুরু করে দিতে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা (এটা না করে তোমাদের) নিরাপদ করে দিয়েছেন; কেননা তিনি মানুষের অন্তরে যা কিছু (লুকিয়ে) থাকে সে সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِىٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ
وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٤٤﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً
فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ
ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ
ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ
زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ
وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى

৪৪. (সে সময়ের কথাও স্মরণ করো,) যখন তোমরা (যুদ্ধের ময়দানে) তাদের সামনাসামনি হলে, তখন তোমাদের চোখে তাদের (সংখ্যা) আল্লাহ তায়ালা (নিতান্ত) কম (করে) দেখালেন এবং তাদের চোখেও তিনি তোমাদের (সংখ্যা) দেখালেন কম (এর উদ্দেশ্য ছিলো), যেন আল্লাহ তায়ালা তাই ঘটিয়ে দেখান যা কিছু তিনি (এ ঘটনার মাধ্যমে) ঘটাতে চান; (কেননা) আল্লাহ তায়ালার দিকেই সব কিছুকে ফিরে যেতে হবে।

রুকু ৬

৪৫. হে ঈমানদার লোকেরা, কোনো বাহিনীর সাথে যখন তোমরা সামনাসামনি হও, তখন ময়দানে অবিচল থাকবে এবং (বিজয়ের আসল উৎস) আল্লাহ তায়ালাকে বেশী বেশী করে স্মরণ করতে থাকবে, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে। ৪৬. তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। ৪৭. তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ো না, যারা অহংকার ও লোকদের (নিজেদের শান-শওকত) দেখানোর জন্যে নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং সাধারণ মানুষদের যারা আল্লাহ তায়ালার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে; (মূলত) তাদের সমুদয় কার্যকলাপই আল্লাহ তায়ালা পরিবেষ্টন করে আছেন। ৪৮. যখন শয়তান তাদের কাজগুলোকে তাদের সামনে খুব চাকচিক্যময় করে পেশ করেছিলো এবং সে তাদের বলেছিলো, আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না এবং আমি তো তোমাদের পাশেই আছি, অতপর যখন উভয় দল সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তখন

بَرِيٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ
ٱلْعِقَابِ ﴿٤٨﴾ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ
هَٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَلَوْ
تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ
وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ
بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۙ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا۟
بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٥٢﴾
ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا
بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

সে কেটে পড়লো এবং বললো, তোমাদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই, আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাও না, আমি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করি এবং (আমি জানি) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন কঠোর শাস্তিদাতা।

রুকু ৭

৪৯. মোনাফেক ও তাদের দলবল– যাদের দিলে (গোমরাহীর) ব্যাধি রয়েছে, যখন তারা বললো, এ লোকদের (মূলত) তাদের (নতুন) দ্বীন (মারাত্মকভাবে) প্রতারিত করে রেখেছে; (সত্য কথা হচ্ছে,) যে কোনো ব্যক্তিই (বিপদে-আপদে) আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করে (সে বুঝতে পারবে), আল্লাহ তায়ালা প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়। ৫০. তুমি যদি (সত্যিই) সেই (করুণ) অবস্থা দেখতে পেতে, যখন আল্লাহর ফেরেশতারা কাফেরদের রূহ বের করে নিয়ে যাচ্ছিলো, ফেরেশতারা (তখন) তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে (ক্রমাগত) আঘাত করে যাচ্ছিলো (এবং তারা বলছিলো), তোমরা আগুনের আযাব উপভোগ করো। ৫১. (মূলত) এটা হচ্ছে তোমাদের নিজেদেরই উভয় হাতের কামাই, যা তোমরা (আগেই এখানে) পাঠিয়েছিলো, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর বান্দার ওপর যুলুম করেন না, ৫২. (এদের পরিণতি হবে,) ফেরাউনের আপনজন ও তাদের পূর্ববর্তী কাফেরদের মতোই; তারা সবাই আল্লাহ তায়ালার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের গুনাহের দরুন আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করলেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শক্তিশালী ও কঠোর শাস্তিদানকারী। ৫৩. এটা এ কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো জাতিকে কোনো নেয়ামত দান করেন, তিনি ততোক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সে নেয়ামত (তাদের জন্যে) বদলে দেন না, যতোক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) জানেন,

كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٥٤﴾

৫৪. (এরাও হচ্ছে) ফেরাউন, তার স্বজন ও তাদের আগের লোকদের মতো; আল্লাহর আয়াতকে তারা (সরাসরি) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, ফলে আমি তাদের (কুফরীর) অপরাধের জন্যে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি এবং ফেরাউনের স্বজনদের আমি ডুবিয়ে দিয়েছি, (মূলত) তারা সবাই ছিলো যালেম।

তাফসীর

আয়াত-৪১-৫৪

নবম পারার শেষের দিকে যুদ্ধ সম্পর্কিত যে বিধান শুরু হয়েছে, এই আয়াতগুলো তারই সাথে সম্পৃক্ত। সেখানে যুদ্ধ সম্পর্কে সব কিছু বলা হয়েছিলো।

সেখানে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত যমীন থেকে কাফের মোশরেকের ফেৎনা চূড়ান্তভাবে নির্মুল না হবে, জীবন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় বিধিবিধান রচনার অধিকার পুরোপুরি আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত না হবে ততোদিন অব্যহতভাবে এ লাড়ই চলবে। এই যুদ্ধে মুসলমানদের আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করেছেন এবং করবেন। তাদের বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং হবে। তারা গনীমতের মাল লাভ করেছে এবং করবে। তাই এই আয়াত শুরু করা হয়েছে গনীমতের মাল সম্পর্কিত বিধানের বর্ণনা দ্বারা। এই বিধান বলার প্রয়োজন কেন এলো? অথচ জেহাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য আল্লাহর কোরআন বলে দিয়েছে যে, তা হবে একমাত্র আল্লাহর পথে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা। সে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে লড়াই করা, যার লক্ষ্য হবে একমাত্র আল্লাহর দাওয়াত, তাঁর দ্বীন ও তাঁর জীবন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। এরপরও এই জেহাদে যে মালে গনীমত অর্জিত হয় তার ব্যাপারে ইতিপূর্বে চূড়ান্ত ফয়সালা বলে দেয়া হয়েছে যে, তা হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের, তাতে তোমাদের কারো কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির কোনো অধিকার নেই।

ইসলামের গনীমত প্রসংগ

আল্লাহর পথে যারা জেহাদ করে, তাদের নিয়ত ও এখলাসকে আরো পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করার জন্যে এই বৈষয়িক মাল সম্পদ তাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিয়ে নেয়া হয়েছে যাতে করে তারা যা কিছু করবে তা সম্পূর্ণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করতে পারে। এই বুনিয়াদী সত্য বিষয়টা সত্তেও যুদ্ধ পরবর্তীকালীন ব্যবহারিক ও বাস্তবতা ছিলো এই যে, এর ফলেই গনীমতের মাল অর্জিত হয়েছে। এখানে দেখা গেলো গনীমতের মাল-সামানও আছে, যারা এটা অর্জন করেছে সেই মোজাহেদরাও এখানে আছে। তাই এখানে এটা অপরিহার্য হয়ে দেখা দিলো যে, এই সব সম্পদের ব্যাপারে একটি সুসংগঠিত স্থায়ী বিধান প্রণীত হবে। যারা লড়াই করেছে, তারা করেছে নিজেদের জান মাল দিয়ে। তারা নিজেরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এই জেহাদে অংশগ্রহণ করেছে। নিজেরাও লড়াইতে অর্থ ব্যয় করেছে আবার যাদের পর্যাপ্ত অর্থ ছিলো না তাদের জন্যেও এরা অর্থ ব্যয় করেছে। এটা ছিলো তাদের একান্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রমাণ– যার ফলে তারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত না হয়েও আল্লাহর পথে নেমে এসেছে।

অতপর তারা সম্পূর্ণ এখলাস ও একনিষ্ঠ নিয়ত নিয়ে কঠোর ধৈর্য সহকারে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে। জেহাদে বিজয় লাভের পর তাতে গনীমতের মাল অর্জিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তো

আগের বর্ণিত আয়াতে তাদের অন্তকরণকে একান্তভাবে আল্লাহর নামে নিবেদিত করার জন্যে এই সম্পদকে একান্তভাবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যে নির্দষ্ট করেছিলেন। তাই বর্তমান আয়াত ও তার বিধান নাযিল হওয়ার পর তাদের মধ্যে এই মালে গনীমত দেখে কোনো বৈষয়িক লোভ জাগার কথা নয়। কারণ তারা তো জানতোই যে, এটা তাদের নয়- এটা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের। আল্লাহ তায়ালা একান্ত দয়াপরবশ হয়ে তাদের একাংশ দিচ্ছেন। এতে তাদের এখলাস ও নিষ্ঠা আরো বৃদ্ধি পেলো। এতে তাদের কিছু বাস্তব প্রয়োজনও মিটলো। আর এসব কিছুই সাধিত হলো একটি পবিত্র ও নিষ্কলুষ পরিবেশে, যাতে করে তাদের মনে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব বাকী রইলো না।

মূলত আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রকৃতি ও মনের অবস্থা সবই জানেন এবং তিনি পরিপূর্ণ ভারসাম্য বজায় রেখেই কোনো বিধান নাযিল করেন যাতে করে মানুষের মন ও তার যাবতীয় মানসিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা যায়। আবার তার বৈষয়িক ও বাস্তব প্রয়োজনসমূহও পূরণ হয়। সাথে সাথে তার অন্তরে কিংবা বৃহত্তর সমাজে গনীমতের মালের বিধান নিয়ে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয়।

দশম পারার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে,

'তোমরা জেনে রেখো আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান'।

এ পর্যায়ে হাদীসের বর্ণনা ও ফকীহদের মতামতে বহু মতপার্থক্য রয়েছে। প্রথমত গনীমত বলতে কী বুঝায়। 'আনফাল' বলতে কী বুঝায়। আনফাল ও গনীমতের ব্যবহৃত অর্থ কি এক, না এগুলো একই বিষয়। দ্বিতীয়ত চার ভাগ মোজাহেদদের দেয়ার পর যে পঞ্চমাংশ বাকী থাকবে, তার বন্টন কি ভাবে হবে। তৃতীয়ত, যে অংশ আল্লাহর তা কি সম্পূর্ণ আলাদা কোনো পঞ্চম অংশ, না তা রসূলের জন্যে নির্দিষ্ট পঞ্চমাংশই? চতুর্থত, যে অংশ আল্লাহর রসূলের জন্যে তা কি তাঁর পবিত্র সত্ত্বার জন্যেই নিদিষ্ট, না তাঁর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমাম কিংবা খলীফা তা পাবে। যে অংশ নিকটাত্মীয়ের জন্যে তা কি রসূলের যমানার মতো তার আপন জন বনী হাশেম ও বনী আবদে মান্নাফের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে, না যুগের ইমামের হাতে থাকবে, তিনিই তা নির্বাচন করবেন। এই যে পঞ্চমাংশের নির্ধারণ ও বন্টন এটা কি নির্দিষ্ট, না এর সম্পূর্ণ বন্টনের দায়িত্ব আল্লাহর রসূল, তার খলীফাদের ওপর ছেড়ে দেয়া হবে? এছাড়াও রয়েছে আরো কিছু ছোটখাটো মত পার্থক্য।

ইসলামী রাষ্ট্রছাড়া বিধি বিধানের চর্চা মূল্যহীন

আমরা এই তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এ যে নীতি অবলম্বন করি, সে অনুযায়ী আমরা এখানে ফেকহী মাসয়ালার বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে চাই না। সেটা বিশেষ আলোচনার স্থলে আলোচনা করাই হবে উত্তম। এটা হচ্ছে একটি সাধারণ আলোচনা। আসল কথা হচ্ছে, 'গনীমতের গোটা মাসয়ালাটি এখন আমাদের সামনে নেই। কেননা এখন এই বিষয়টি আলোচনা ও বিচার্য বিষয় নয়। এখন আমাদের সামনে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র ব্যবস্থা, কোনো মুসলিম নেতৃত্ব, কোনো মুসলিম উম্মতের অস্তিত্বই নেই- যারা আল্লাহর পথে জেহাদের ফরয আদায় করবে, পরিণামে গনীমতের মাল তাদের হাতে আসবে- যা তাদের আল্লাহর নির্ধারিত খাতে খরচ করার দরকার হবে। সময় আজ এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে, যেখানে এ দ্বীন তার প্রাথমিক অবস্থায় ছিলো, মানুষরা আজ সেই জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে গেছে, দ্বীন আসার সময় তারা জাহেলিয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো, আজও সেই একই জাহেলিয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা আল্লাহর সাথে এমন অনেক মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, যারা তাদের জীবনের জন্যে আইন ও বিধান প্রণয়ন করছে এবং সে অনুযায়ীই তাদের জীবন চলছে।

আজ পুনরায় এ দ্বীন সেই সিঁড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে এসে মানুষ আবার মানবতাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর দিকে আহ্বান করবে। আবার নতুন করে তাদের একথা বলবে যে, যাবতীয় সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে দাও। এ পর্যায়ে আইন ও বিধান যা কিছুই নিতে হয়, তা শুধু তাঁর নবীর কাছ থেকেই গ্রহণ করো। একটি মুসলিম নেতৃত্বের পতাকার নীচে সবাই এসে জমায়েত হও, যা মানুষের জীবনকে পুনরায় এই দ্বীনের গন্ডির ভেতর নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। নিজেদের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ এই মুসলিম নেতৃত্ব ও মুসলিম জামায়াতের জন্যে নির্দিষ্ট করে দাও এবং যাবতীয় শক্তি-ক্ষমতাকে জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারী নেতৃত্ব ও শাসকদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইসলামী নেতৃত্বের কাছে ফেরত দাও। এটাই হচ্ছে আজকের বিষয়। দ্বীন আজ এমনি একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন। তাই আজ অন্য কোনো কিছুই এখানে আলোচ্য নয়। গনীমতের বিষয়টি আজ এখানে আলোচনা পর্যালোচনার বিষয় হতে পারে না। কেননা আজ কোথাও 'জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র অস্তিত্ব নেই আর জেহাদ ছাড়া গনীমতের প্রশ্নই আসে না, বরং সে জন্যে কোনো সংগঠনের কোনো সাংগঠনিক ও সামষ্টিক প্রস্তুতিও নেই। ভেতরের সম্পর্কের ব্যাপারে যেমন নিয়ম নেই, তেমনি বাইরের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এমন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এর কারণ একেবারেই স্পষ্ট। মূলত এখানে এমন কোনো ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই, যার একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে, যার এটা জানা প্রয়োজন যে, দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক আইন কানুন কেমন হবে।

আসল কথা হচ্ছে দ্বীন ইসলাম একটি বাস্তব ও ব্যবহারিক দ্বীন। এই ব্যবস্থা কাল্পনিক কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতে চায় না। সমাজে-রাষ্ট্রে যার কোনো অস্তিত্বই বর্তমান নেই। যেখানে কোনো ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা নেই, ইসলামী জেহাদ নেই, সেখানে গনীমতের বিষয়টি মোটেই আলোচনার বিষয় নয়। এই কাল্পনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে কী লাভ? দ্বীন কখনো অবাস্তব কাল্পনিক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। তাতে এর মূল্যবান সময় নষ্ট হবে, তার সামনে আরো অনেক জরুরী সমস্যা রয়েছে। যেমন তাকে আজ দুনিয়ার সামনে, দুনিয়ার মানুষদের জীবনে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে– সে মহান কাজটি আগে ভাবতে হবে! বিশেষ করে যারা নিজেদের আজ মুসলমান বলে দাবী করে, তাদের জীবনে কিভাবে সঠিক দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। কাল্পনিক চিন্তা দর্শন, ফেকহী গবেষণা ও মত-পার্থক্যের পেছনে সময় ব্যয় করা তাদেরই সাজে– যাদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় আছে। আজ সময় তো ব্যয় করা দরকার মৌলিক কাজের পেছনে এবং তা হচ্ছে মানুষের জীবনকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর দিকে আহ্বান জানানো। প্রথমত নিজেরা এই দাওয়াতে দাখিল হবে, তারপর দুনিয়ার অন্যান্য মানুষদের এই দাওয়াতে দাখিল হবার দাওয়াত দেবে। ঠিক যেমনিভাবে দ্বীনের প্রথম দিকে মানুষদের দ্বীনের পথে দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো। এরই ফলে একটি কর্ম-তৎপর জামায়াত, একটি যোগ্য নেতৃত্ব, একটি শাসন ক্ষমতার অস্তিত্ব লাভ করবে। এই জামায়াত জাহেলী জামায়াত, জাহেলী সমাজ, জাহেলী আইন-কানুন থেকে হবে সম্পূর্ণ আলাদা। তার থাকবে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। এরপর আল্লাহ তায়ালা এমন জামায়াত ও এমন জাতির ওপর সাহায্য প্রেরণ করবেন। তাদের তিনি বিজয় দেবেন। তাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। সে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক আইন কানুনের জন্যে তাদের নীতিমালার প্রয়োজন হবে। আর তেমন কোনো অবস্থা প্রতিষ্ঠার আগে বাস্তবতার প্রয়োজনেই আমরা বর্তমান বিষয়টির ফেকহী মতপার্থক্য ও তার বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে চাই। প্রথমত চাই একটি সুসংহত ইসলামী আন্দোলন ও

সংগঠন, যা একটি ইসলামী নেতৃত্বের মাধ্যমে 'জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র দায়িত্ব আঞ্জাম দেবে। তারপরই আসবে গনীমতের মাসয়ালা। যুদ্ধলব্ধ গনীমত কিভাবে বিলি বন্টন করতে হবে সে মাসয়ালা। সে সময় এলে তা আলোচনা করা যাবে। ফী যিলালিল কোরআনে আমরা এই মৌলিক ঈমানী নীতিমালার আলোচনাই যথেষ্ট মনে করি।

গনীমতের মালের ব্যাপারে সাধারণ নিয়মটি আল্লাহ তায়ালা কোরআনের এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন– 'তোমরা জেনে রেখো।' মোসাফেরদের জন্যে ....

গনীমতের মালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ যোদ্ধাদের জন্যে, বাকী পঞ্চমাংশ রসূলুল্লাহর দায়িত্বে, তারপর তা মুসলিম শাসকদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে– যারা আল্লাহর শরীয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করে। এটাই হচ্ছে মূল বিধান। এই বায়তুল মালের হিসসাতে রয়েছে ৫টি খাত। আল্লাহ ও রসূলের অংশ, আত্মীয়স্বজনের অংশ, ইয়াতীমদের অংশ, মেসকীনদের অংশ ও মোসাফেরদের অংশ। এই বিধান কার্যকর হবে যখন কোথাও গনীমতের মাল পাওয়া যাবে এবং এখানে এতোটুকুই যথেষ্ট। আয়াতের শেষের দিকে বর্ণিত বিধানটি হচ্ছে একটি স্থায়ী বিধান। সেখানে বলা হয়েছে,

ফেরকাবাজি ও দ্বীন থেকে বিচ্যুতির পরিণাম

'যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো......... আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।

এখানে ঈমানের কতিপয় নিদর্শন বলা হয়েছে– যাতে একথাটি প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বদরে অংশ গ্রহণকারীদের ঈমানের দাবীকেও এর সাথে শর্তাধীন করে দিয়েছেন। বদরের যোদ্ধারা ঈমান এনেছিলেন আল্লাহর ওপর। বদরের দিনে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু তাদের ওপর নাযিল করেছিলেন তার ওপর ঈমান এনেছিলেন। এটাকে তাদের আল্লাহর ওপর ঈমান আনার শর্ত হিসাবে বর্ণনা হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতের শুরুতে গনীমত সম্পর্কে যা কিছু নাযিল হয়েছে, তার ওপর তাদের ঈমান আনতে হবে। আল্লাহর নির্ধারিত হুকুম আহকাম তাদের মানতে হবে। তাহলেই তাদের বলা হবে সঠিক অর্থে আল্লাহর ওপর তারা ঈমান এনেছে, অপর কথায় তাদের ঈমান আনার দাবী সম্পূর্ণত একথার ওপর নির্ভর করে যে, তারা সর্বতোভাবে আল্লাহর বিধানের সামনে অনুগত হয়ে তাকে মেনে নেবে।

মুসলমানদের মাঝে যখন ফের্কা, মাযহাব ও নিরর্থক ব্যাখ্যা করার প্রবণতা দেখা দিলো, তখন ঈমানের এই বুনিয়াদী শর্তকেও যা ইচ্ছে তা করে বদলে দেয়া হলো। অথচ কোরআনের দৃষ্টিতে ঈমানের শর্ত একেবারেই সুস্পষ্ট, যার মধ্যে কোনো রকম ব্যাখ্যা ও মত পার্থক্যের অবকাশ নেই। ফেকার মাযহাবসমূহের মত-পার্থক্য, বিভিন্ন ফের্কাবন্দী হওয়ার বিভিন্নতা মানুষকে ঝগড়া তর্কে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে মানসিক কল্পনা প্রসূত চিন্তাধারার ফল। এসব অর্থহীন ঝগড়া ও ফের্কাবাদিতার কারণে মুসলমান একে অপরের ঘাড়ে অপবাদ চাপানো ও তাদের পক্ষ থেকে আবার এর প্রতি উত্তর দানের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। একে অপরকে কাফের হওয়ার অপবাদ দিলো। ছোটোখাটো মত বিরোধের কারণে একে অপরের ঘাড়ে কুফরীর ফতোয়া ঠিক মতোই দিয়ে দিলো। অথচ যে সব জঘন্য পাপ ও আল্লাহ বিরোধী কার্যকলাপের ফলে কোরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে একজন মানুষের সত্যিই কাফের হয়ে যাওয়ার কথা, তাকে দিব্যি মেনে নেয়া হলো। কাউকে কাফের আখ্যা দেয়া এখন আর দ্বীনের সহজ সরল সেই মৌলিক নিয়ম নীতির ওপর আর প্রতিষ্ঠিত থাকলো না– যাকে ঈমানের শর্ত হিসাবে আল্লাহর কোরআন পেশ করেছে। বরং নিছক স্বার্থপরতা, প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং ব্যক্তিগত ও দলগত বিরোধিতা এসে তার স্থান দখল

করলো। ছোট খাটো বিষয়গুলোকে আসল মনে করার কারণেই একে অপরের ওপর কাফের হওয়ার ফতোয়া এঁটে দেয়। আস্তে আস্তে মুসলমানদের মাঝে গোঁড়ামি, মারাত্মক বাড়াবাড়ি ও পারস্পরিক কোন্দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারেও এটা ছিলো এক মারাত্মক বাড়াবাড়ি। আর এসব কিছুর পেছনে অবশ্য কিছু ঐতিহাসিক কারণও ছিলো।

আল্লাহর দ্বীন ছিলো মূলত অত্যন্ত স্বচ্ছ বিষয়। তাতে কোনো দিনই এ ঢিলেমি ছিলো না যে, আসল যা তাকে ছেড়ে দিতে হবে, তাতে অহেতুক বাড়াবাড়ি করতে হবে অথবা অযথা তাকে বাড়িয়ে পেশ করতে হবে।

হাদীসের ভাষায়– ঈমান নিছক কোনো আশাবাদিতার নাম নয়, বরং তা হচ্ছে একটি অমোঘ সত্য যা মনে বদ্ধমূল থাকে এবং মানুষের বাহ্যিক কার্যকলাপ তার সত্যতা প্রমাণ করে। কিন্তু একে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে জরুরী হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে আগে গ্রহণ করতে হবে এবং তার ব্যবহারিক জীবন হবে এর বহিপ্রকাশ।

অপরদিকে কুফর কি? তা হচ্ছে আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করা। আল্লাহর নাযিল করা বিধি বিধানের বিরুদ্ধে বিচার ফয়সালা করা। আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কোনো আইনের কাছে ফয়সালা কামনা করা– চাই সেটা যতো ছোটো ব্যাপার হোক কিংবা বড়ো ব্যাপার হোক। এ বিষয়টি হচ্ছে অত্যন্ত পরিষ্কার, সহজ সরল ও অমোঘ বিষয়। এর বাইরে যা কিছু আছে তা সবই হচ্ছে ফের্কাবাজী কথাবার্তা ও মাযহাবী ঝগড়া ও বিতর্কের পরিণতি। আল্লাহর অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও অমোঘ সিদ্ধান্তের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই আয়াত–

'তোমরা জেনে রাখো..........সামনা সামনি হয়েছিলো এবং ঈমানের সত্যতা ও তার সীমা পরিসীমাকে সে বিষয়গুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেয়– যা আল্লাহর কেতাবে মজুদ রয়েছে।'

একনিষ্ঠ ঈমান ও বৈষয়িক লোভমুক্ত জেহাদ

আল্লাহ তায়ালা তো প্রথমেই সূরা আনফালের শুরুর দিকে গনীমতের মালকে ময়দানের যোদ্ধাদের মালিকানা থেকে বাইরে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের বলেই দেয়া হয়েছে এতে তাদের কোনোই অধিকার নেই, এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপার। যাতে করে জেহাদ-যুদ্ধ সম্পূর্ণত আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত হয়ে যায় এবং মোজাহেদরা বৈষয়িক উপায় উপসর্গ, মাল ও স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিষ্কলুষ হয়ে যেতে পারে। নিজেদের মালে গনীমতসহ সব কিছু আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করে দিতে পারে। আল্লাহর জন্যে– যিনি তাদের মালিক, তাঁর রসূলের জন্যে– যিনি তাদের নেতা এবং এভাবেই বৈষয়িক সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ নিস্বার্থ হয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতে পারে। প্রতিটি লোভ, প্রতিটি লালসা, প্রতিটি বৈষয়িক স্বার্থ থেকে নিজেদের অন্তরকে খালি করে এই ময়দানে নামতে পারে। এই জেহাদ হচ্ছে জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। এই ঝান্ডা হচ্ছে আল্লাহর ঝান্ডা। এতে আল্লাহর আনুগত্যই একমাত্র কাম্য। তারা আল্লাহকে নিজেদের ওপর, নিজেদের মাল সম্পদের ওপর, নিজেদের অন্য সব কিছুর ওপর শর্তহীনভাবে ক্ষমতাবান মনে করবে এই হচ্ছে ঈমানের সঠিক দাবী। একথাই সূরা আনফালের শুরুতে মোজাহেদদের কাছ থেকে এই গনীমতের মালের মালিকানা সরিয়ে নেয়ার সময় আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন,

'তোমাকে তারা আনফাল সম্পর্কে.......... যদি তোমরা ঈমানদার হও'।

এভাবেই যখন তারা আল্লাহর ইচ্ছার সামনে সম্পূর্ণ অবনত হয়ে গেলো, তার ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলো, ঈমানের শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, তখন আল্লাহ তায়ালা এবার তাদের দিকে দয়ার দৃষ্টি দিয়ে তাকালেন এবং তাদের তিনি গনীমতের মালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ ফেরত দিয়ে দিলেন, মাত্র পঞ্চমাংশ বাকায়দা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের দায়িত্বে রেখে

দিলেন যাতে করে আল্লাহর নবী সমাজে যাদের একান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম মেসকীন, মোসাফের, তাদের জন্যে এই অংশ ব্যয় করতে পারেন।

অপরদিকে ঈমানদাদের অন্তর থেকে এই চিন্তাধারা আগেই বিদূরিত করে দিলেন যে, জেহাদে অংশগ্রহণ করে আল্লাহর পথে জান মাল বিনিয়োগের কারণে তারা গনীমতের অংশ পাবে এটা ঠিক নয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা তাদের সামনে পরিষ্কার করে দেয়া যে, তাদের জেহাদ, তাদের সংগ্রাম, তাদের অর্থ ব্যয় ছিলো সম্পূর্ণ আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এতে তাদের কোনো বৈষয়িক স্বার্থ ক্রিয়াশীল ছিলো না। আজ যখন আল্লাহ তায়ালা তাদের গনীমতের মালে কোনো অংশ দিচ্ছেন তা শুধু তাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী। এটা তাদের কোনো পাওনা দাবী নয়। যুদ্ধের ময়দানের মতো আল্লাহর আয়াতে বর্ণিত শর্তের সামনে শর্তহীনভাবে নত হওয়াটাই হচ্ছে আসলে ঈমান। এই হচ্ছে ঈমানের শর্ত– এই হচ্ছে ঈমানের দাবী।

এখানে এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর ক্ষেত্রে বিশেষ করে 'আমার বান্দার ওপর' কথা দ্বারা যে বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইংগিত করেছেন– যেখান থেকে গোটা গনীমতের বিষয়টি শুরু হয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান............ যেদিন সামনা সামনি হয়েছে।'

এখানে একটি বিশেষ গুণের দিকে ইশারা করা হচ্ছে। মূলত ঈমানের প্রকৃতিই হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব করা। তার ওপর ভিত্তি করেই মানুষ এই চূড়ান্ত উন্নতির সোপানে উপনীত হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা এই 'দাসত্বের' সম্পর্কের মাধ্যমেই আসলে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। এই হচ্ছে সে স্তর, যেখানে আল্লাহ তায়ালা রসূলকে স্থাপন করেছেন– যেন তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে তাঁর বিধি বিধানকে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারেন। সত্যিকার অর্থে এটাই মানবতার চূড়ান্ত পর্যায়, মানবতার সম্মানজনক স্থান। এমন এক সম্মানজনক স্থান– যেখানে মানুষ সদা উন্নীত হতে চায়। আল্লাহর দাসত্বটাই হচ্ছে মূলত সেই স্থান– যা মানুষকে যেমন তার নফসের দাসত্ব থেকে বাচায়, অন্য বান্দাহর দাসত্ব থেকেও তাকে নাজাত দেয়। বান্দাহ তখনি তার ঈপ্সিত উন্নত মর্যাদায় উপনীত হতে সক্ষম হয়, যখন সে তার নফসের গোলামী ও অন্য মানুষদের গোলামীকে অস্বীকার করে। যারা আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব করে, তারা নিকৃষ্ট জাতের অন্যান্য কিছুর গোলামীর শিকারে পরিণত হয়ে যায়। নিজের নফস, প্রকৃতির গোলামী, নিজেদের অন্ধ ধ্যান-ধারণার দাসানুদাসে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহর গোটা সৃষ্টির মাঝে তিনি মানুষদের যে জ্ঞান ও বোধশক্তি দান করেছেন, ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা, চিন্তা ও চিন্তা-পদ্ধতির যে স্বাধীনতা তাকে আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন, সে তাকে অকেজো করে নিজেকে সম্পূর্ণ এক ধরনের নিকৃষ্ট জন্তু জানোয়ারে পরিণত করে দেয়। চতুষ্পদ জানোয়ারের চাইতেও সে তখন নীচে নেমে যায়। আল্লাহ তায়ালা যেখানে তাকে সৃষ্টির সর্বোচ্চ স্তরে পয়দা করেছিলেন, সে তাকে সৃষ্টির সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দেয়। এই মানুষরা যখন আল্লাহর গোলামী করতে দ্বিধা করে, তখন তারা তাদেরই মতো অন্য মানুষদের গোলামীর জালে আটকে পড়ে নিজের জীবনকে তাদের ইচ্ছা মোতাবেক পরিচালিত করে। তাদের নিজেদের জীবনে তখন এমন সব চিন্তা দর্শন ক্রিয়াশীল হতে থাকে, যা একান্ত জাহেলিয়াত, অপূর্ণতা ও প্রবৃত্তির দাসত্বের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। তখন তারা যুগের নানা নামের জাহেলিয়াতের গোলামে পরিণত হয়ে যায়। ইতিহাসের জাহেলিয়াত, অর্থনৈতিক জাহেলিয়াত, রাজনৈতিক জাহেলিয়াত– ছাড়াও আরো অনেক ধরনের জাহেলিয়াত রয়েছে, যেগুলোকে বানানোই হয়েছে মানুষের সাহসী নাককে যেন মাটির সাথে রগড়ে দেয়া যায়। তাদের যেহেতু নিজেদের কোনো লক্ষ্য থাকে না, তাই নানা ধরনের লেবাস পরে আসা বহুমুখী জাহেলিয়াত তাদের আঁকড়ে ধরে।

বদর যুদ্ধের তাৎপর্য বিশ্লেষণ

এবার আমরা দাঁড়াবো আল্লাহর এই বর্ণনার সামনে। এখানে আল্লাহ তায়ালাই বলছেন,

'তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান আনো........... যেদিন দুটি পক্ষ সামনা সামনি হয়েছিলো।'

বদরের যুদ্ধ ছিলো একটি পার্থক্যকারী যুদ্ধ- যেটা শুরু হয়েছিলো আল্লাহর হেদায়াত দ্বারা, শেষ হয়েছিলো তাঁর পরিকল্পনা, তাঁর কৌশল ও তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য দ্বারা। এটা ছিলো হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী- তাফসীরকারকরা সংক্ষেপে একথাই বলেছেন। অবশ্য বৃহত্তর অর্থে এটা ছিলো অনেক ব্যাপক, অনেক প্রশস্ত এবং অনেক গভীর। বদরের যুদ্ধ ছিলো হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য সূচক একটি বাস্তব ঘটনা। তবে এখানে 'হক' বলতে সংক্ষেপে কোনো ছোটো খাটো হককে বুঝানো হয়নি। হক বলতে আল্লাহর আসল ও পুরো হকই বুঝানো হয়- যার ওপর গোটা সৃষ্টিজগত দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটি বস্তু ও জীবনের প্রকৃতি যার ওপর কায়েম আছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কিত হক। আল্লাহর ক্ষমতা, পরিকল্পনা ও কৌশলের হক এ সব কিছুকে একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট করে দেয়া। সমগ্র সৃষ্টিকুলে তাঁরই গোলামী ক্রিয়াশীল থাকবে, সব কিছুর মধ্যে তিনি হচ্ছেন ব্যতিক্রম। তাঁর কোনো শরীক সমকক্ষ নেই। এই 'হক' সেই বাতিলের ওপর বিজয়ী হয়েছে, যা অচল ও অপদার্থ হওয়া সত্তেও দুনিয়ার সর্বত্র বিজয়ী ছিলো- কিছু সময়ের জন্যে তা আসল 'হক'কে ঢেকে রেখেছিলো। এই বাতিল যমীনের সর্বত্র তার অসংখ্য মিথ্যা খোদা বানিয়ে রেখেছিলো- যারা মানুষের জীবনকে তাদের নিজেদের নফসের খাহেশ মতো চালাতে চাইতো আর এই ছিলো সেই আসল 'হক', যা বদরের দিন যাবতীয় বাতিল কিছুর ওপর জয়লাভ করেছে। এই হক বিজয়ী হয়েই যমীনে আল্লাহর দাসত্ব, তাঁর ক্ষমতা সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একদিকে যেমন ছিলো এই মহান 'হক', অপরদিকে ছিলো অচল মুদ্রাসম বাতিল- বদরের দিন এটা ফয়সালা হয়েছে যে, কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা- এই হক মানুষের চিন্তাধারা ও জীবন দর্শনে ব্যাপকভাবে ছেয়ে গেলো। তা যমীনে নিজের গোলামীকে প্রতিষ্ঠা করেছে, মানুষের জীবনের সব কয়টি বিভাগের ওপর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বাতিলের হাত থেকে তাকে মুক্ত করেছে।

বদরের যুদ্ধ ছিলো ইসলামী আন্দোলনের দুটি পর্যায়ের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্যকারী। একটা পর্যায় হচ্ছে কঠোর ধৈর্য অধীর অপেক্ষা ও কঠিন কষ্ট সহিষ্ণুতার। দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শনের। ইসলাম সমাজে জীবনের জন্যে সম্পূর্ণ এক নতুন ধ্যান ধারণা পেশ করেছে। মানবীয় অস্তিত্বের জন্যে এ হচ্ছে একটি নতুন পথ। মানুষকে একই গ্রন্থিতে আবদ্ধ করার একটি নতুন নিয়ম, রাষ্ট্র ও সরকারের একটি নতুন কাঠামো- যা এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই আগে থেকে চলে আসা জাহেলিয়াতের তরিকা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের। এটা আল্লাহর যমীনে মানুষের কাংখিত আযাদীর এক বলিষ্ঠ ঘোষণা- যার ভিত্তি হবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও দাসত্ব মেনে নেয়ার ওপর। ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে যমীনে সার্বভৌমত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর। এভাবে ইসলাম যমীনের সব কয়টি আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে, এদের প্রতিটি শক্তিকে নির্মূল করে তাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। এই আলোকে ইসলাম হচ্ছে একটি জীবন্ত আন্দোলন, একটি বলিষ্ঠ শক্তি, একটি শক্ত পদক্ষেপ। এই চিন্তাধারা কখনো মানুষের সমাজে নীরব থাকতে পারে না। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে তার বহিপ্রকাশ ও উন্নতি প্রয়োজন। ইসলাম কখনো তার অনুসারীদের মনে নিছক একটি আকীদা বিশ্বাস হিসাবেই বসে থাকতে চায় না, বরং

তাকে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে প্রবেশ করিয়ে দিতে চায়। এটা তার উদ্দেশ্যের জন্যে একান্ত জরুরী ছিলো। ইসলাম দুনিয়ার বুকে একটি নতুন চিন্তা বিশ্বাস, একটি নতুন জীবন বিধান, একটি নতুন শাসন ব্যবস্থা, একটি নতুন অর্থনীতি হিসাবে টিকে থাকতে এসেছে এবং নিজের টিকে থাকার পথে যারাই তার পথ আগলে দাঁড়ায়, তাদের সব কিছুকেই সে নির্মূল করে দিতে চায়। এবং এভাবেই ইসলাম প্রথমে নিজের অনুসারীদের মনে অতপর গোটা মানুষ জাতির জীবনে একটি ব্যাপক বিপ্লব আনয়ন করতে চায়।

বদরের যুদ্ধ গোটা মানবতার ইতিহাসেও একটি বড়ো ধরনের পার্থক্য সূচনাকারী ঘটনা ছিলো। বদরের যুদ্ধের আগের মানব জাতি আর পরের মানুষের মানবতা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আকীদা বিশ্বাস ও ক্রিয়া কর্মের দিক থেকে এ ছিলো তাদের জন্যে নবজন্মের মতো। ব্যক্তির জীবনে যেমন, সমষ্টির জীবনেও এ ছিলো ব্যাপক পরিবর্তন সূচক ঘটনা। দুনিয়ার আইন কানুন বদলে গেলো। বস্তুর মূল্যবোধ ও প্রকৃতি বদলে গেলো। চিন্তার ধরন বদলে গেলো, জীবনের বোধ ও ভাবধারা পরিবর্তন হয়ে গেলো। এই ব্যাপক ও বিশাল পরিবর্তন যে শুধু মুসলমানদের জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকলো, তা নয়। মুসলমানদের সীমা-সরহদ পার হয়ে গোটা মানবতাকে তা প্রভাবিত করে দিলো। ইহুদী ও খৃষ্টানরা একথা স্বীকার করুক আর না করুক এটা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, বদরের যুদ্ধ মানব জাতির জীবনে একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনয়ন করেছে। ইসলামের দুশমনরা নিজেরা ইসলামের কাছ থেকে বহু কিছু শিখেছে। পশ্চিমী দুনিয়া থেকে এই খৃষ্টানরা ইসলামের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে মুসলমানদের সান্নিধ্যে এসে নিত্য নতুন জ্ঞান বিজ্ঞান শিখে নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে তার বাস্তবতা পরীক্ষা করেছে। কারণ সে সময় পশ্চিমী জগত তথা ইউরোপে এসব জ্ঞান ছিলো অনুপস্থিত। অপরদিকে ছিলো তাতারীরা– যারা প্রাচ্য দেশ থেকে ইসলামের সাথে লড়াই করার জন্যে এসে পরে তাদের একাংশও ইসলামের জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে বিপুল পরিমাণে উপকৃত হয়েছে। তাদের এক বিরাট অংশ ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। বলতে গেলে ইসলামের কাছ থেকে শিখে নেয়া জ্ঞান, চিন্তা দর্শন, কৃষ্টিসভ্যতার ওপর ভিত্তি করেই ১৫শ শতক থেকে শুরু করে বিংশ শতক পর্যন্ত বদরের যুদ্ধের প্রভাব পৃথিবীর বুকে একটি ব্যাপক পরিবর্তনের গোড়া পত্তন করেছে।

বদরের যুদ্ধ– যুদ্ধের ময়দানে জয় পরাজয়ের কারণ ও উপায় উপকরণের ধারণাটাই পালটে দিয়েছে। কি কি কারণে কোনো বাহিনী ময়দানে জয়লাভ করে, আবার কি কি কারণে যুদ্ধের ময়দানে একটি বাহিনী পরাজিত হয়, তার ধারণার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করেছে। সেদিনের জয়লাভ করার যাবতীয় লক্ষণ ছিলো মোশরেকদের শিবিরে। অপরদিকে পরাজিত হওয়ার সব কয়টি লক্ষণ ছিলো মুসলমান বাহিনীর কাছে। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল যা হলো– তা ছিলো মানুষের আন্দাজ অনুমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থা এতো খারাপ ছিলো যে, কিছু সংখ্যক মোনাফেক যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিলো, তারা বলতে লাগলো, এসব লোককে তাদের দ্বীন দারুণভাবে প্রতারিত করে রেখেছে। আল্লাহর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ছিলো এমন ভাবেই যুদ্ধের গতি প্রকৃতি এগিয়ে যাক। এটা ছিলো মোশরেকদের আধিক্য ও মোমেনদের সংখ্যা স্বল্পতার যুদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা নিজেই জয় পরাজয়ের উপায় উপকরণকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে চেয়েছেন, যাতে করে চিন্তা ও আদর্শের শক্তি সংখ্যাধিক্যের শক্তির ওপর বিজয়ী হতে পারে। অক্ষমতা ও শক্তিহীনতা যেন বস্তুবাদী শক্তির আধিক্যকে চূর্ণ করে দিতে পারে। খাঁটি চিন্তা বিশ্বাস যেন শক্তি ও অস্ত্রের বড়াইর মোকাবেলা করে তাকে পরাস্ত করে দিতে পারে। তিনি চেয়েছিলেন

খাঁটি চিন্তা দর্শনের অনুসারী মোজাহেদরা লড়াই করুক এবং এই খাঁটি বস্তু নিয়ে যেন যুদ্ধের ময়দানে বাতিলের একান্ত গভীরে ঢুকে যেতে পারে। আর এই ঢুকে যাওয়ার সময় একবারও থমকে দাঁড়িয়ে দেখবে না যে, বাহ্যিক ও বাস্তব শক্তি একই পর্যায়ে এলো কিনা। তাদের কাছে তাদের পক্ষে জয়ের পাল্লাকে ঝুলিয়ে দেয়ার জন্যে আরেকটি বিরাট শক্তি আছে, আর তাও শুধু কথার কথা নয়– বরং অবস্থার বাস্তবতাও তাই। মানুষের চোখ দিব্যি তা দেখেও নিয়েছে। সর্বশেষে বদরের যুদ্ধ ছিলো হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী একটি সত্য ঘটনা। সূরা আনফালের শুরুর দিকে আল্লাহ তায়ালা একথাটি এভাবে বলেছেন,

'যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে ওয়াদা করলেন..........যদিও কাফেররা তা পছন্দ করে না।'

মুসলমানদের মাঝে যারা বদরের দিকে রওনা করেছিলো প্রথম দিকে তারা বের হয়েছিলো আবু সুফিয়ানের কাফেলার দিকে– যাতে করে তারা কাফেলা জয় করতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের পরিকল্পনার বদলে অন্য কিছু চাইলেন। আল্লাহ তায়ালা চাইলেন, আবু সুফিয়ানের কাফেলা (সহজে অর্জিত সাফল্য) যেন সহজেই তাদের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। অপরদিকে আবু জাহলের লশকরের (যার ওপর বিজয় অর্জন করা খুবই কঠিন) যেন তারা মোকাবেলা করে এবং মোকাবেলার ফলে যুদ্ধ সংঘর্ষ হবে, কিছু লোক মারা যাবে, আবার কিছু লোক বন্দীও হবে। আল্লাহ তায়ালা চাননি যে, তারা শুধু কাফেলা জয় করবে কিংবা বিনা যুদ্ধে গনীমত লাভ করবে অথবা সহজ লভ্য ও আরামদায়ক সফর করে ঘরে ফিরে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের যা বললেন তিনি তা করেও দেখালেন।

'যেন হককে হক ও বাতিলকে বাতিল প্রমাণ করতে পারেন।'

আল্লাহর এই বাক্য একটি মহান সত্যের দিকে ইংগিত করে এবং তা হচ্ছে মানব সমাজে কোনো 'হক'কে হক প্রমাণিত করা ও বাতিলকে বাতিল বলে সাব্যস্ত করার কাজটি শুধু কতিপয় আদর্শিক বুলি ও যুক্তি তর্ক দিয়ে অর্জিত হতে পারে না। শুধু কিছু যুক্তি পেশ করে কোনো দিন হককে যেমন হক প্রমাণ করা যায় না, তেমনি আদর্শের শ্লোগান পেশ করে কোনো বাতিলকেও বাতিল সাব্যস্ত করা যায় না। এ কাজ কখনো নিছক আদর্শের ওপর বিশ্বাস দিয়েও হাসিল করা যায় না। অমুক জিনিসটি হক, তাই তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, আবার অমুক জিনিসটি বাতিল সুতরাং তাকে নির্মূল হতে হবে– এই নিছক বিশ্বাস দিয়ে বাস্তব পৃথিবীতে কোনো দিন 'হক'কে পাওয়া যাবে না এবং এভাবে কোনো দিন কোনো বাতিলও সমাজ থেকে মুছে যাবে না। হাঁ, যদি কখনো সম্ভব হয়, তাহলে বাস্তবভাবে বাতিলকে উচ্ছেদ করে হককে তার জায়গায় বসাতে হবে। 'হকের' অনুসারী বাহিনীকে বাতিলের ওপর ময়দানে জয়ী হতে হবে এবং বাতিল প্রত্যক্ষ মোকাবেলায় হকের কাছে পরাজিত ও অপমানিত হবে।

এ থেকে আরেকটি জিনিসও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মূলত একটি সদা তৎপর আন্দোলনের নাম। এটা নিছক কোনো আদর্শের নাম নয়– এটা কোনো বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন আদর্শ ও নীতিকথার নাম নয়।

বদরের যুদ্ধে হক হক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাতিলও বাতিল বলে পরাজিত ও অপমানিত হয়েছে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বাস্তব সাহায্যপ্রাপ্তির একটি বাহ্যিক প্রদর্শনীও ছিলো। সত্যিকার অর্থেই বদর যুদ্ধ ছিলো হক ও বাতিলের পরখকারী একটি মহা ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালা এই মহা ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। ঘটনার পটভূমি বিশেষ করে আল্লাহ তায়ালা নিজ রসূলকে ঘর থেকে বের করে এনেছেন। এনে সহজ কাজের বদলে কঠিন কাজের দিকে ধাবিত করেছেন। তার মূল রহস্যও এখানে লুকিয়ে আছে।

এসব কিছু স্বয়ং দ্বীন ইসলামের নিজস্ব প্রকৃতিতেও ছিলো একটি পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয়। আল্লাহ তায়ালা চাইলেন এর মাধ্যমে যেন জীবন বিধানের নিজস্ব ধরন ও প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলমানদের অনুভূতিতে কথাটা পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠে। এটা এমন এক পার্থক্যসূচক ব্যাপার ছিলো, যার প্রয়োজন আজ আমরা ভালোভাবেই বুঝতে পারি। আজ দ্বীনের সঠিক অনুভূতিতে মৌলিকভাবেই একটা ঢিলেমি সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমাদের সমাজের মানুষ– যাদের মুসলমান বলা হয়, তারা আজ এ সত্য সম্পর্কে চরমভাবে উদাসীন হয়ে পড়েছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে চলে এসেছে, সত্যের পথে আহ্বানকারীদের জীবনেও আজ এ অলসতা ও ঢিলেমি দেখা দিয়েছে।

'সেই পার্থক্যকারী দিন– যেদিন দুটো বাহিনী একে অপরের মোকাবেলায় সামনা সামনি হয়েছে।'

আল্লাহর আয়াতের এই হচ্ছে মূলকথা। বিভিন্ন যুক্তি ও গভীর অনুশীলনের ভিত্তিতে এটা ছিলো সুদূরপ্রসারী পার্থক্যকারী একটা ঘটনা!

'আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'

আল্লাহর এই বিপুল ক্ষমতা বদরের দিন অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষ করে যখন সব কিছু মুসলমানদের প্রতিকূল ছিলো, তার পরও আল্লাহ তায়ালা তাদের বিজয় দান করেছেন। এটা এমন একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য ছিলো, যার ব্যাপারে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ থাকে না। কোনো বিতর্কেরও প্রশ্ন আসে না। এই পুরো ঘটনার এ ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যা নেই যে, এটা ছিলো আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রয়োগ। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

কোরআনের পাতায় বদর যুদ্ধের চিত্র

এখানে বর্ণনাধারা চলছে 'সেই পার্থক্যকারী দিন– যেদিন দুটো বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিলো।' অর্থাৎ বদরের সম্পর্কে। এখানে আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের ময়দানের দিকে আমাদের ফিরিয়ে নিচ্ছেন। যুদ্ধের নকশা ও তার দৃশ্যের ব্যাপারটি এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে পেশ করছেন– যেন যুদ্ধ আমাদের সামনেই সংঘটিত হচ্ছে। এই যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা যে কৌশল অবলম্বন করেছেন, তার বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে। বর্ণনার প্রতি স্তরে যুদ্ধের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষ যেন আল্লাহর অসীম ক্ষমতাই পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। পরিশেষে এই কৌশলের পরিণাম ও তার উদ্দেশ্য ও বর্ণনা করা হয়েছে। (আয়াত-৪১-৪২)

এই আয়াতগুলোতে উভয় বাহিনীর অবস্থান চোখের সামনে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তাতে এও দেখা যাচ্ছে, আল্লাহর গোপন কৌশলগুলো কিভাবে সক্রিয় ছিলো। চারদিকে বুঝি আল্লাহর হাত নযরে আসছে– যখন তিনি এই দলকে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছেন, আরেক দলকে অন্যত্র দাঁড় করিয়েছেন। আর কাফেলা এদের উভয়ের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে স্বপ্নে যে কথা নাযিল করেছেন, মনে হচ্ছে তাই বুঝি তাঁর অনুপম কৌশল প্রয়োগ করে তিনি বাস্তবায়ন করছেন। প্রতিটি দলকে অপর দলের চোখে স্বল্প করে দেখানো হয়েছে, যাতে করে এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মরযী পূরণ করে নিতে পারেন এবং প্রতিটি দল অপর দলের সংখ্যা কম মনে করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এই যে যুদ্ধের নকশা অংকন করা হয়েছে, তা শুধু কোরআনের অবিস্মরণীয় বর্ণনা পদ্ধতির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।এটা কোরআনেরই অভিনব পদ্ধতি– অন্য কোনো কিছুর পক্ষেই এ নকশা অংকন সম্ভবপর ছিলো না। শুধু কোরআনের পক্ষেই এই নিপুণ অংকন সম্ভব। একটি জীবন্ত ছবি, একটি জীবন দৃশ্যের

চিত্রায়ন, জীবন্ত দৃশ্যের জীবন্ত ব্যাখ্যা- তাও আবার ছোট কয়েকটা শব্দে বলে দেয়ার এ কাজ শুধু কোরআনের পক্ষেই সম্ভব।

ইতিপূর্বে বদরের চিত্র আঁকতে গিয়ে আমরা বলেছি যে, মুসলমানরা যখন মদীনা থেকে বের হয়েছিলো, তখন মদীনার পার্শ্ববর্তী উপত্যকার পাশ দিয়ে তারা বের হয়েছিলো। আবু জাহলের নেতৃত্বে আগত কোরায়শদের বাহিনী উপত্যকার আরেক পাশ দিয়ে মদীনা থেকে দূরবর্তী স্থানে অবতরণ করেছে। উভয় বাহিনীর মাঝে ছিলো একটি পাহাড়ের টিলা যা উভয়কে উঁচু জায়গা থেকে আলাদা করে রেখেছিলো। অপরদিকে আবু সুফিয়ান তার বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সমুদ্রের পাশের রাস্তা দিয়ে চলতে থাকলো- যা এই উভয় বাহিনী থেকে ছিলো অনেক দূরে।

উভয় বাহিনীই একে অপরের অবস্থান ও স্থান সম্পর্কে বে-খবর ছিলো। আল্লাহ তায়ালা এই দুটি বাহিনীকে সে উঁচু স্থানের উভয় দিকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এনে দাঁড় করিয়েছেন, যা তিনি পূরণ করতে চেয়েছেন। এখানে তারা উভয়ে একে অপরের সামনা সামনি হয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিলো যে, যদি মনে করা হয় যে, তারা আগে ভাগেই কোনো চুক্তি মোতাবেক এখানে আসতে চাইতো, তবু তারা নিয়ম শৃংখলার সাথে এই প্রস্তুতির সাথে এখানে আসতে পারতো না। এটা ছিলো সত্যিই আল্লাহর এক অপূর্ব কৌশলের অংশ। এই কথাটিকেই আল্লাহ তায়ালা এভাবে বর্ণনা করেছেন,

'যখন তোমরা উপত্যকার পাশ দিয়ে........... আল্লাহ ফয়সালা করতে চাইলেন।'

এইভাবে নিয়ম শৃংখলার সাথে কোনো পূর্ব নির্ধারিত ওয়াদা ব্যতিরেকে এই উভয় বাহিনীর সামনা সামনি হওয়া ছিলো একটি সুনির্ধারিত বিষয়- যাকে আল্লাহ তায়ালা মানুষদের সামনে এভাবে দেখাতে চেয়েছেন। এ জন্যে তিনি গোপন ও সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করছিলেন এবং তাকে বাস্তবভাবে প্রকাশ করার জন্যে তিনি তোমাদের একটি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করলেন এবং এজন্যে সব ধরনের উপায়-উপকরণও তিনি সরবরাহ করলেন। যে মহান উদ্দেশ্যে এ উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছিলো, প্রয়োজনীয় সাজ -সরঞ্জাম পৌঁছানো হয়েছিলো, তার উদ্দেশ্য ছিলো-

'যেন যার ধ্বংস হওয়ার তা.........জীবিত থাকো।'

ধ্বংস মানে শারীরিক মৃত্যুও হতে পারে, আত্মিক মৃত্যুও হতে পারে- অর্থাৎ কুফর ও শেরেকের মৃত্যু। মূলত আসল মৃত্যু তো তাই। এভাবেই জীবন দ্বারা শারীরিক জীবনও হতে পারে আবার আত্মিক জীবনও হতে পারে। মূলত তাই হচ্ছে আসল জীবন আর এই আয়াতে জীবন মৃত্যু দ্বারা দ্বিতীয় অর্থই মনে হয় বুঝানো হয়েছে। এভাবেই আল্লাহ তায়ালা এক জায়গায় বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত ছিলো তাকে কি আমি জীবিত করিনি? এবং তার জন্যে আমি আলো দিয়েছি- যাকে নিয়ে সে লোকদের মাঝে ঘুরে বেড়াতো- তার থেকে বের হতে পারে না।

অতএব এই আয়াতেও কুফরের ব্যাখ্যা মৃত্যু বলা হয়েছে, আর ঈমানকে বলা হয়েছে 'জীবন'। ইসলামের দৃষ্টিতে কুফর ও ঈমানের অর্থ সত্যিকার অর্থে মৃত্যু ও জীবন, অষ্টম পারায় সূরা আনয়ামে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা আগেই একথা বলেছি।

আমরা মৃত্যু ও জীবনের যুক্তিতে এই অর্থকে এখানে প্রাধান্য দিয়েছি যে, এর অর্থ হচ্ছে কুফর ও ঈমান। এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা বদরের যুদ্ধকে পার্থক্যকারী দিন বলেছেন। এর দ্বারা হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকে পরিষ্কার করে একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করা হয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি এরপর কুফরী করবে, সে কোনো সন্দেহ শোবার ভিত্তিতে নয়, বরং খাঁটিভাবে

বিশ্বাস করবে, সে প্রকাশ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কুফর করবে যাতে করে তার ধ্বংস সাধিত হয়। অপরদিকে যে ব্যক্তি এরপর ঈমান আনবে, সেও সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতেই আনবে এবং নিজেকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবে।

আল্লাহ তায়ালা এই যুদ্ধকে মৃত্যু ও জীবন (কুফর ও ঈমান) এ উভয়টার জন্যেই শব্দ 'বাইয়েনাহ' বলেছেন। এর কারণ ছিলো, এর ফলে যুদ্ধের যে পরিণাম সংঘটিত হয়েছিলো, তা ছিলো একটি অনস্বীকার্য দলীলের মতো। এটা একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এই যুদ্ধের কৌশল মানবীয় যুদ্ধ কৌশলের সম্পূর্ণ বাইরের বিষয় ছিলো। এখানে যে শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে, তা ছিলো সম্পূর্ণ মানবীয় শক্তি ক্ষমতার বাইরে। এই ঘটনা একথাও প্রমাণ করেছে যে, এই দ্বীনের একজন মহান মালিক রয়েছেন– যিনি এই দ্বীনের অনুসারীদের সাহায্য করেন। যদি তারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে তাঁর পথে টিকে থাকতে চায়। সেদিন যদি বৈষয়িক শক্তি ক্ষমতার ওপর নির্ভর করা হতো, তাহলে কোনো অবস্থায় মোশরেকেরা পরাস্ত হতো না– যাদের কাছে সেদিন অস্ত্রশস্ত্র সহ সকল রকম যুদ্ধের সরঞ্জামের প্রচন্ড ভান্ডার জমা ছিলো। অপরদিকে মুসলিম দলের সংখ্যা– তাদের সাজ-সরঞ্জাম তথা নাম মাত্র প্রস্তুতি দিয়ে তারা এই মহা বিজয় যে সাধন করতে পারতো না, তা মোশরেকেরাও জানতো। যখন তারা বদরের দিকে যাচ্ছিলো, তখন পথিমধ্যে তাদের এক বন্ধু গোত্র তাদের অর্থ ও জনবল দিয়ে সাহায্য করার প্রস্তাব করলে তারা এর জবাবে বললো, আল্লাহর কসম, আমাদের যুদ্ধ যদি মানুষদের সাথে হয়, তাহলে (মানুষ হিসাবে) আমরা মোটেই দুর্বল নই। কিন্তু সে যুদ্ধের মোকাবেলা যদি আল্লাহর সাথে হয়– যেমনটি মোহাম্মদ মনে করে, তাহলে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করবে কে?' আসলে তারা একথা ভালো করেই জানতো যে, তাদের মোকাবেলা সাধারণ কিছু মানুষদের সাথে নয়– তাদের মোকাবেলা হচ্ছে আল্লাহর সাথে। যেভাবে তাদের একথা তাদের বিশ্বাসী সাথী মোহাম্মদ বলেছেন, স্বয়ং আল্লাহর সাথে মোকাবেলা করার সাহস কার? এসব কথা জানা ও বুঝার পর যখন কাফেররা কুফরের ধ্বংসেই থেকে গেলো, তাহলে অবশ্যই বলতে হবে যে, তারা প্রকাশ্য দলীল প্রমাণের সাথেই ধ্বংস হচ্ছিলো।

'যে ধ্বংস হয়, সে যেন ধ্বংস হয় দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে। যে জীবিত থাকে সেও যেন থাকে পূর্ণ দলীলের মাধ্যমে'–

এই আয়াত থেকে বাহ্যিকভাবে এটাই বুঝা যায়। কিন্তু মূলত এর পেছনে আরেকটি ইংগিত রয়েছে এবং তা হচ্ছে, 'হকের' পক্ষে লড়াই করার বাহিনী ও বাতিলের বাহিনীর মধ্যে সামনা সামনি মোকাবেলা হওয়া– তার পরিণামে বাস্তব ঘটনার আলোকে সত্যিই 'হকে'র মহান বিজয় লাভ বিশেষ করে যেখানে 'হক' আগে থেকেই বহু মানুষের অন্তরের জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেখানে এসব কিছু অবশ্যই 'হক'-কে মানুষের অন্তর ও তার চোখের সামনে সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট সাহায্য করেছে, জ্ঞান ও প্রবৃত্তির যাবতীয় সন্দেহ শোবা চিরতরে দূর করে দিয়েছে। অতপর 'কুফর' আঁকড়ে ধরে যারা ধ্বংস হতে চায়, তাদের সামনে কোনো সন্দেহ ও দ্বিধার ওজুহাত বাকী থাকলো না। কেননা যা কিছু 'হক', তা মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে যমীনেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এভাবেই জীবন তথা ঈমান যারা কামনা করে তাদেরও তা গ্রহণ করতে কিংবা তার ওপর টিকে থাকতে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ বাকী থাকলো না। তারাও ভালোভাবে জেনে নিলো যে, আসলেই এই হচ্ছে সঠিক পথ– যার সাহায্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজে করেন এবং বাতিল ও আল্লাহ বিরোধী শক্তিকে তিনি পরাস্ত করেন।

সূরা আনফালের পরিচিতিতে আমরা আগে এই পারায় বলেছি যে, জেহাদ এ জন্যেই জরুরী ছিলো যে, পাপ এবং আল্লাহ বিরোধী শক্তি ও ক্ষমতাকে ভেংগে ফেলতে হবে এবং যমীনে এই বিদ্রোহীদের ক্ষমতাকে নির্মূল করতে হবে। সর্বত্র আল্লাহর পতাকাকে সমুন্নত করতে হবে। সোজা কথায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে শুধু কথায় নয়, কার্যত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এসব কিছুই 'হক'কে সবার সামনে সুস্পষ্ট করে তোলার ব্যাপারে সাহায্যকারী প্রমাণিত হবে। তাই বলা হয়েছে,

'যে ধ্বংস হতে চায় সে যেন ধ্বংস হয় দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে। আবার যে জীবিত থাকতে চায় সেও যেন তা করে দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে'।

এভাবে এর দ্বারা একথাও বুঝে আসে যে, আল্লাহ তায়ালা এই সূরাতে কেন এ কথা বলেছেন যে,

'এবং তার জন্যে যদ্দুর সম্ভব শক্তি যোগাড় করো, ঘোড়া প্রস্তুত করো, যাতে করে এই প্রস্তুতি দ্বারা তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভয় দেখাতে পারো।'

মূলত শক্তি সঞ্চয় করা, ভয় দেখানো, মানুষের অন্তরে 'হক' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়, যে অন্তর শুধু শক্তি ও ক্ষমতার ভাষণই বুঝে, তারা কখনো সে শক্তি প্রদর্শন ছাড়া অজ্ঞতার ঘুম থেকে জাগ্রত হয় না এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বান্দাকে সম্পূর্ণভাবে 'মুক্ত' করে দেয়ার অর্থও তারা বুঝতে পারে না। ময়দানে যাবতীয় কলাকৌশল তো আল্লাহ তায়ালাই ব্যবহার করেছেন। এর প্রতিটি তৎপরতা প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবভাবে তার ইচ্ছায়ই সফল হয়েছে।

'অবশ্যই তিনি সব শোনেন, সব জানেন।'

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার কাছ থেকে কিছুই গোপন থাকে না, বাতিলের লোক ও হকের লোক এদের সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা জানেন। কথা ও কর্মের বাইরেও যা কিছু তাদের অন্তরে লুক্কায়িত আছে, আল্লাহ তায়ালা তাও জানেন। তাঁর কর্ম কৌশল ও সিদ্ধান্ত তাঁর এই ব্যাপক জানা শোনার সাথে সম্পৃক্ত– যা ভেতর বাইর তার যাবতীয় রহস্যকে ব্যাপ্ত করে আছে। তিনি সব শোনেন সব দেখেন।

দ্বীনকে বিজয়ী করার ব্যাপারে আল্লাহর কৌশল

এরপর আসছে আল্লাহর সেই বিশেষ সূক্ষ্ম কৌশল যে সূক্ষ্ম কৌশলটি গোটা যুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। আল্লাহর সেই সূক্ষ্ম কৌশলটি ছিলো এই যে,

'যখন আল্লাহ তায়ালা তোমাকে স্বপ্নের মাঝে তাদের সংখ্যাকে কম করে দেখাচ্ছিলেন, যদি তোমাদের কাছে তাদের সংখ্যাকে বেশী করে দেখাতেন, তাহলে তোমরা অলস হয়ে পড়তে এবং এ ব্যাপারে তোমরা মত বিরোধ শুরু করে দিতে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। অবশ্যই তিনি অন্তরের গোপন রহস্য জানেন',

অর্থাৎ এই হচ্ছে আল্লাহর একটি সূক্ষ্ম কৌশল। তিনি স্বপ্নে রসূলকে দুশমনদের সংখ্যা কম দেখিয়েছেন যেন তাদের কোনো শক্তিই নেই, তাদের কোনো মূল্যই নেই, যাতে করে তিনি এই স্বপ্নের কথা তার সাথীদের বলেন এবং তাদের এই সুখবরটা দিতে পারেন। যুদ্ধের ময়দানে তারাও যেন খুব বীরত্ব ও বাহাদুরীর সাথে মোকাবেলা করে। কেননা সে সময় মুসলমানদের জনবল ও অর্থবল ছিলো খুবই কম। তারা তো ভালো করে তখনও তৈরীই হতে পারেনি যে, তারা মদীনার বাইরে চলে এসেছে। আল্লাহ তায়ালাই একথা ভালো জানেন যে, যদি তিনি দুশমনদের সংখ্যা তাদের চোখে বেশী করে দেখাতেন, তারা যদি সত্যিই কাফেরদের এই ব্যাপক প্রস্তুতির কথা জানতো, তাহলে হয়তো তাদের মধ্যে কমজোরী দেখা দিতো, যা ছিলো নিতান্ত স্বাভাবিক

ব্যাপার। অতপর এ অবস্থায় এটা মোটেই অসম্ভব ছিলো না যে, হয়তো যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দিতো কারণ আসলে তারা তো বদরের একটি বিশাল বাহিনীর সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়নি। তাদের লক্ষ্য ছিলো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা আর এই বাণিজ্য কাফেলার জন্যে বিশাল কোনো প্রস্তুতির দরকারও ছিলো না। এ অবস্থায় তাদের সামনে কাফের ও মোশরেকদের বিশাল প্রস্তুতিকে নিতান্ত ছোট করে দেখানো ছিলো আল্লাহর বিরাট এক হেকমত। এই অবস্থায় একদল চাইতো যুদ্ধে অংশ নিতে, আরেক দল হয়তো চাইতো ভিন্ন কিছু। পরিণাম এই হতো যে, পুরা সন্তুষ্টি সহকারে ময়দানে প্রাণ বাজি করে তারা যুদ্ধে অংশ নিতে পারতো না। ময়দানে কোনো যুদ্ধরত বাহিনীর জন্যে এটা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে। আল্লাহ তায়ালা বাঁচিয়ে দিলেন, কারণ তিনি জানেন মানুষদের অন্তরে কোন্ কথা লুকিয়ে আছে।

আল্লাহ তায়ালা যেহেতু মানুষদের অন্তরের সব কথা জানেন। তিনি মুসলমানদের অন্তরের এই দুর্বল দিকটিও জানতেন আর এ জানার কারণেই তিনি তাঁর নবীকে স্বপ্নে দুশমনের সংখ্যা কম দেখিয়েছেন। তিনি কখনো এই দুশমন বাহিনীকে বেশী করে দেখাননি।

রসূলের স্বপ্ন বাস্তব ঘটনার আলোকে ছিলো সম্পূর্ণ সত্য। আল্লাহর নবী তাদেরকে তাঁর চোখে দেখলেন কম, কিন্তু আসলে তারা ছিলো বেশী। কিন্তু সংখ্যায় বেশী হলেও তারা ছিলো নেতৃত্বের দিক থেকে দুর্বল, শক্তি ছিলো কম। তাদের অন্তর যাবতীয় অনুভূতির বিশালতা থেকে ছিলো খালি। তাদের মনে শক্তি যোগাতে পারে এমন কোনো 'ঈমান' ছিলো না। তাই সংখ্যার আধিক্য সত্তেও তারা আসলেই ছিলো 'কম'– যেটা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে স্বপ্নে দেখিয়েছিলেন। এটা ছিলো আল্লাহ তায়ালারই হেকমত। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমান বাহিনীর অন্তরে প্রশান্তি ঢালতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালাই মানুষের গোপন ভেদ জানেন। কোন বিষয় তাদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে তাও তিনি ভালো জানেন। মুসলমানদের সংখ্যা ও সাজ সরঞ্জামে ছিলো তাদের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু তা সত্তেও তাদের অন্তরে ঈমানের শক্তি, সাহস ও প্রশান্তি ছিলো অনেক বেশী। তিনি তাদের সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। তাদের প্রতি তাঁর বিশাল দয়া ও করুণার এটিও ছিলো একটি উল্লেখযোগ্য দিক, যুদ্ধের ময়দানে যা প্রমাণিত হয়েছে।

'সব কিছুকেই আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে।'

এটা বলা হয়েছে আল্লাহর কৌশলের কামিয়াবীর ফলে সংঘটিত ঘটনার ব্যাপারে। এটা হচ্ছে সেই সব ঘটনার কিছু। যা একান্তভাবে আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। তিনিই তাঁর চূড়ান্ত ক্ষমতা এখানে ব্যবহার করেন। নিজের ইচ্ছা মতো তাকে সংঘটিত করেন। কোনো কিছুই তাঁর ক্ষমতা ও কৌশলের বাইরে নয়। এ ব্যাপারে অন্য কারোই কোনো দখল চলে না।

মূল কথা যখন এই যে, কৌশল ও হেকমত– তা আল্লাহর। সাহায্য হোক তাও আল্লাহর। সংখ্যার আধিক্যের ওপর আল্লাহর এ সাহায্য নির্ভর করে না এবং বৈষয়িক সাজ সরঞ্জাম যুদ্ধে সিদ্ধান্তকর কোনো বিষয় নয়। তখন মোমেনদের উচিত, ময়দানে কাফের ও মোশরেকদের সাথে লড়াই করার সময় দৃঢ় হয়ে দাঁড়াবে। যুদ্ধের আসল হাতিয়ার আল্লাহর সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করবে, সে সব সাজ সরঞ্জাম তৈরী করছে যা তাকে মূল সাহায্যের মালিকের সাথে সম্পৃক্ত করে। কেননা আসল সাহায্য তো আল্লাহর কাছ থেকেই আসবে। তিনিই হচ্ছেন যাবতীয় ক্ষমতার উৎস। তাছাড়া তাদের পরাজয় ও অপমানের সেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে– যার কারণে মক্কার কাফেররা সংখ্যায় এতো বিপুল পরিমাণ লোক থাকা সত্তেও তাদের এই অপমানকর পরাজয়

হয়েছে। তাদের অবশ্যই গর্ব ও অহংকার থেকে, শয়তানের ধোকা প্রতারণা থেকে বাঁচতে হবে। এক আল্লাহর ওপরই তাদের নির্ভর করতে হবে। কেননা, বিপুল ক্ষমতার উৎস ও মালিক হচ্ছেন তিনি। এরশাদ হচ্ছে, (আয়াত-৪৫-৪৯)

এই কয়েকটি বাক্যের মাঝে অনেক তাৎপর্য, অনেক ইংগিত, অনেক মৌলিক বিধান, অনেক ছবি ও ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। যুদ্ধের দৃশ্যসমূহের এমন এক চিত্রায়ন রয়েছে যেন এটি এক জীবন্ত ঘটনা। অন্তরের হাল, অনুভূতি, গোপন ও অপ্রকাশিত কথাও এ থেকে বেরিয়ে পড়ে। কয়েকটা কথায় এগুলোকে পেশ করা হয়েছে, অথচ এর বক্তব্যের জন্যে এই বাক্যগুলো থেকে কয়গুণ বেশী কথা বলা প্রয়োজন ছিলো। কোনো মানবীয় প্রচেষ্টা এই দৃশ্য অংকন করতে পারতো না। কথাগুলো শুরু হয়েছে, 'হে ঈমানদাররা' এই ডাক দিয়ে। এই সূরায় মুসলিম বাহিনীকে বহুবারই এই নামে ডাকা হয়েছে। তাদের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ময়দানে শত্রুর মোকাবেলার সময় দৃঢ়তা দেখাতে হবে, আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে, শত্রুকে প্রচন্ড ভয় দেখাতে হবে। (আয়াত ৪৫-৪৭)

এখানে সঠিক ভাবে সাহায্য ও বিজয় লাভ করার উপায় বলা হয়েছে দৃঢ়তা, অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য, পারস্পরিক মতবিরোধিতা থেকে বেঁচে থাকা, ধৈর্যধারণ করা, গর্ব ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকা, আল্লাহর সহজ সরল পথে অটল থাকা এবং প্রদর্শনীমূলক কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা।

দৃঢ় হয়ে ময়দানে টিকে থাকা সাহায্য পাওয়ার পথে প্রথম ধাপ। উভয় বাহিনীর মাঝে যেই ময়দানে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, সেই বিজয়ী হবে। ঈমানদারদের কি জানা নেই যে, তারা যে বিপদ মুসীবত কষ্টে ভুগছে, তাদের শত্রুরাও তেমনি কষ্ট মুসীবত পাচ্ছে। দুশমনদের কষ্টও মুসলমানদের মতোই। কিন্তু মোমেনদের অন্তর যে বিনিময় ও পুরস্কার পাওয়ার আশা করে, কাফেররা সে দিক থেকে একান্ত মাহরুম।

এ দিক থেকে অবশ্যই মোমেনদের পাল্লা খুব ভারী। আল্লাহর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করায় তাদের মনও খুব প্রশান্ত থাকে, তার সাহায্য আশা করে। কাফের তো এ থেকেও বঞ্চিত। শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা নির্ভর করে মনের বলের ওপর। আর মনের বল নির্ভর করে শক্ত ঈমানের ওপর। ঈমানদারদের প্রয়োজন সাহস ও শক্তির সাথে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকা। তাহলেই দেখা যাবে কাফেরদের পা টলটলায়মান হয়ে যাবে। মোমেনদের দৃঢ়তা তো তাদের সেই ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত যেখানে বলা হয়েছে, হয় তারা শহীদ হবে, না হয় তাদের ওপর সাহায্য আসবে। অপরদিকে তাদের দুশমনদের সামনে এই অস্থায়ী ও নিতান্ত ক্ষুদ্র জীবন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা যা কিছু করে, তা এই দুনিয়ার লোভ-লালসার জন্যেই করে, যার বাইরে তাদের কোনো কিছুরই আশা নেই! এর বাইরে তাদের কোনো জীবনও নেই। আর বর্তমান জীবন ছাড়া তাদের আর কোনো জীবনও নেই।

আল্লাহকে অধিক স্মরণ করা, বিশেষ করে যখন শত্রুর সাথে মোকাবেলা হবে, তখন এই 'যেকের' মোমেনের জন্যে স্থায়ী প্রেরণাদায়ক বিষয়। মোমেনরা এর থেকে শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে। মোমেনের হৃদয়ে যে হামেশা এটি প্রেরণার উৎস ছিলো– তা একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। কোরআন এর একাধিক বর্ণনা বিভিন্ন জায়গায় পেশ করেছে। মোমেন বিপদ মুসীবত, দুঃখ কষ্টে হামেশা আল্লাহর 'যেকেরের' আশ্রয় নিয়েছে।

ফেরাউনের দরবারের জাদুকরদের কাহিনী কোরআন বর্ণনা করেছে। যখন তাদের দিল ঈমান কবুল করলো, তখন ফেরাউন তাদের ভীষণভাবে ধমক দিলো। তাদের এই বিদ্রোহের জন্যে কঠিন শাস্তির হুমকি দিলো। জবাবে তারা বললো-

'তুমি কি আমাদের কাছ থেকে এই জন্যেই প্রতিশোধ নিতে চাও যে, আল্লাহর আয়াত আমাদের কাছে এসে যাওয়ার পর আমরা তাঁর ওপর ঈমান এনেছি! হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের ওপর 'ধৈর্য' ঢেলে দাও। তুমি আমাদের মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দাও।'

আবার যখন বনী ইসরাইলের (তালুতের) একটি ক্ষুদ্র দল জালুত ও তার (বিশাল) বাহিনীর মোকাবেলা করলো, তখন মোমেনরা এই বলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলো–

'হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের ওপর ধৈর্য ঢেলে দাও। আমাদের কদমকে দৃঢ় রাখো। কাফের জাতির বিরুদ্ধে তুমি আমাদের সাহায্য করো।'

কোরআন অন্যত্র কয়েকটি মোমেন দলের একটি ঐতিহাসিক দোয়া বর্ণনা করেছে। প্রতিপক্ষের সাথে মোকাবেলায় তাদের আচরণ সম্পর্কে কোরআন বলছে,

'কতো নবী ছিলো, যাদের সাথে মিলিত হয়ে আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিরা লড়াই করেছে। আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে আসা বিপদ-মুসীবত কখনো তাদের দুর্বল কিংবা হতোদ্যম করে দিতে পারেনি। মূলত আল্লাহ তায়ালা সর্বদাই ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। তাদের মুখে হামেশাই কথা ছিলো এই যে, তারা বলতো, 'হে আমাদের মালিক, আমাদের জন্যে আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দাও। আমাদের বাড়াবাড়িসমূহ ক্ষমা করে দাও। আমাদের কদমকে (শত্রুর সামনে) সুদৃঢ় করো এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।'

শত্রুর সাথে যুদ্ধের সময় মোমেন দলের হামেশাই এই অবস্থা ছিলো, যতোবার যতো জায়গায় মোমেনরা দুশমনদের সাথে মোকাবেলা করেছে, ততো জায়গায়ই তারা এভাবে আল্লাহর 'যেকেরের' সাহায্য নিয়েছে।

ওহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের ওপর (তাদের নিজেদেরই ভুলের জন্যে) বিপর্যয় এলো, তখন এ আহত নিহত হওয়ার বিপদ সত্তেও পরের দিন যখন তাদের দ্বিতীয় বার মোকাবেলার জন্যে ডাক দেয়া হলো, তখনো তাদের অন্তরে এই মহান শিক্ষা উপস্থিত ছিলো। আল্লাহর এরশাদ,

'যাদের উদ্দেশ্যে মানুষেরা বললো, একদল মানুষ তোমাদের সাথে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে। অতএব তোমরা তাদের ভয় করো। (একথা শোনার) পর তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেলো। তারা বললো, আমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক'।

দুশমনদের সামনে মোমেনদের আল্লাহর এই যেকের অনেক কাজে লাগে। এটা এমন এক শক্তির সাথে জড়িত, যা কখনো পরাজিত হতে পারে না। আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহর ওপর নিরংকুশ ভরসা। যিনি হামেশা আপন বন্ধুদের সাহায্য করেন। তার সাথে এই যুদ্ধের প্রকৃতি ও যুদ্ধের উদ্দেশ্য ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এই যুদ্ধ হচ্ছে আল্লাহর যুদ্ধ। তাঁর যমীনে তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। সেসব আল্লাহ বিরোধী শয়তানী শক্তিকে যমীন থেকে নির্মূল করা, যারা মানুষদের কাছ থেকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এটা এমন এক যুদ্ধ, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করা। বিজয় লাভ করা এর উদ্দেশ্য নয় গনীমতের মাল এর লক্ষ্য নয়। ব্যক্তিগত প্রাধান্য কিংবা জাতিগত কৌলীন্য রক্ষা করা এর উদ্দেশ্য নয়। সেই মহান কর্তব্যের তাগাদা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন ও বিপদের সময় মোমেন তার মালিককে বেশী বেশী স্মরণ করবে, দুঃসময়ের মুহূর্তগুলোতে তার সাথেই সম্পর্ককে মযবুত করবে। এই বিষয়গুলো অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহর শিক্ষা একে বারবার প্রমাণ করে দেখিয়েছে।

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের একনিষ্ঠ আনুগত্যের কথা এ কারণে বলা হয়েছে যে, ঈমানদার বান্দা যখন শুরুর দিকে যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়ে, তখন যেন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সামনে বিনত হয়।

এর ফলে মতপার্থক্যের কারণগুলো নির্মূল হয়ে যায়– যা পরে বড়ো হয়ে দেখা দেয়। বলা হয়েছে মতপার্থক্য ও পারস্পরিক মতানৈক্য করো না। এতে তোমরা কাপুরুষ ও দুর্বল হয়ে যাবে, তোমাদের মধ্য থেকে শক্তির মূল উৎস উড়ে যাবে। মানুষের মধ্যে মত বিরোধিতা একারণেই দেখা দেয় যে, নেতৃত্ব ও তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। প্রবৃত্তির দাসত্ব শুরু হয়ে যায়। আর এই নাফসের গোলামীই মানুষের চিন্তা ও ফেকেরের দিক নির্ণয় করতে শুরু করে। তাই যখনি কোনো মানব গোষ্ঠী প্রথমেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথার সামনে শর্তহীনভাবে নত হয়ে যাবে, তখন মতপার্থক্যের প্রথম কারণটি বিদূরিত হয়ে যাবে। যদিও উপস্থাপিত বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেকের দৃষ্টিভংগি ভিন্নমুখী হয়। কিন্তু আসলে দৃষ্টিভংগির বিভিন্নতা মত বিরোধের কারণ নয়। মত-বিরোধের কারণ হচ্ছে– নফসের গোলামী করা, যা প্রতিটি দৃষ্টিভংগি পোষণকারী ব্যক্তিকে তার মতামতের ওপর গোয়ার্তুমি করতে বাধ্য করে। যদিও এটা পরিষ্কার হয়ে যায়– আসলে 'সত্য' রয়েছে ভিন্নপক্ষে। এর পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, মানুষ নিজেকে এক পাল্লায় রাখে আর 'সত্যকে রাখে দ্বিতীয় পাল্লায়। এক্ষেত্রে প্রথমে সে প্রাকৃতিক প্রাধান্যকে বেশী গুরুত্ব দেয়।

এই স্বার্থপরতার একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য। এই আনুগত্যের বন্ধন ও শৃংখলা যুদ্ধের ময়দানে তো একান্ত অপরিহার্য। এখানে সর্বাবস্থায় সর্বোচ্চ নেতার আনুগত্য করতে হয়। এখান থেকে সেনাপতির আদেশের আনুগত্যের বিষয় আসে। আসলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য একটি অন্তরের বিষয়ও বটে। শুধু সাংগঠনিক ও দলীয় আনুগত্যই নয়– এটাতো সব বাহিনীতেই পাওয়া যায়। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যে লড়াই করে না– এটা তাদের মধ্যেও পাওয়া যায়। ইসলামী ফৌজের নেতৃত্বের আনুগত্যের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য সম্পৃক্ত। এ কারণেই ইসলামী ও অনৈসলামী নেতৃত্বের আনুগত্যে তফাৎ এতো বেশী।

অহংকার ও রিয়ার ধ্বংসাত্মক পরিণতি

এবার আয়াতে বর্ণিত সবরের প্রসংগ। এটি এমন একটি গুণ যুদ্ধের ময়দানে যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো ধরনের যুদ্ধ হোক না কেন, নফসের জেহাদ হোক কিংবা ময়দানের জেহাদ হোক, সর্বাবস্থায়ই এর প্রয়োজন। বলা হয়েছে,

'তোমরা ধৈর্যধারণ করো, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।'

ধৈর্যশীলদের জন্যে 'আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন' এই অনুভূতিই বিজয় ও সাহায্যের নিশ্চয়তা বিধান করে। এখন সর্বশেষ শিক্ষার আলোচনা বাকী রয়েছে –

তোমরা তাদের মতো হয়ো না–যারা নিজেদের ঘর থেকে গর্ব ও অহংকার সহকারে বেরিয়ে এসেছে লোকদের সামনে প্রদর্শনী করার জন্যে। এরাই মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। আল্লাহ তায়ালা তাদের কার্যকলাপ ঢেকে রেখেছেন'।

মোমেন দলের জন্যে এই শিক্ষাটা অত্যন্ত জরুরী ছিলো এবং এই প্রয়োজন হামেশাই বাকী থাকবে। যুদ্ধের জন্যে গর্ব ও অহংকারের সাথে নিজের শক্তির ব্যাপারে অহমিকা বোধ নিয়ে আল্লাহর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতাকে তাঁর ইচ্ছা ও আদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্যে কখনো বাইরে বের হয়ো না। মোমেন সম্প্রদায় তো জেহাদে নামবে আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর পথে। কিন্তু এই আচরণে তো আল্লাহর পথের কোনো লক্ষণ নেই– এতো হচ্ছে নফসের গোলামী ও শয়তানের পথ। মোমেনরা তো জেহাদে অবতীর্ণ হয় মানুষের জীবনে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে। এই অহংকার অহমিকা প্রদর্শনীমূলক আচরণ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ বিরোধী বিষয়। তারা আল্লাহর বান্দাদের ওপর শুধু আল্লাহর আইনের প্রাধান্যই কায়েম করতে চায়– এই

গোঁড়ামি রিয়াকারী হচ্ছে নফসের গোলামীর শামিল। আল্লাহ বিরোধী শক্তিসমূহ আল্লাহর পাওনাকে মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। মোমেনদের এ দল পুনরায় সে পাওনাকে আল্লাহর কাছে ফেরত দিতে চায়– এরা নিজেরা কোনো অবস্থায় 'তাগুত' হতে চায় না-নিজেরা নিজেদের খোদার আসনেও বসাতে চায় না, বরং নিজেদের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও সার্বভৌমত্বের গন্ডির ভেতরে রাখতে চায়।

যেসব আল্লাহ বিরোধী শক্তি আল্লাহর জায়গায় নিজেরা নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চায়-এ জামায়াত তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। এই দল আল্লাহর যমীনে মানুষদের মানুষের এবং অন্য সব কয় ধরনের গোলামী থেকে আযাদ করে দেয়ার এই চিরন্তন ঘোষণা নিয়ে নিজেদের বাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো গোলামী মানুষকে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করে তার যাবতীয় সম্মানকে বিনষ্ট করে দেয়। অতএব মোমেনদের এই দলটি মানুষদের স্বীয় মর্যাদা-সম্মান ও আযাদীকে রক্ষা করার জন্যেই ময়দানে অবতীর্ণ হয়। মানুষের ওপর খামাখা চেপে বসা, তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করা, তাদের নিজেদের গোলাম বানানো ও শক্তির দাসে পরিণত করার জন্যে মোমেনদের এই দল যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না। তারা যখন যুদ্ধের ময়দানে যায়, তখন নিজেদেরকে যাবতীয় বৈষয়িক স্বার্থ থেকে পাক সাফ করেই তারা যুদ্ধযাত্রা শুরু করে। তারা এই যুদ্ধের বিজয় ও প্রাধান্য নিজেদের ব্যক্তির প্রয়োজনে কামনা করে না– বরং আল্লাহর আনুগত্যের সামনে প্রতিটি মানুষ যেন হাঁ-বোধক জবাব দিতে পারে, তার জন্যেই তারা যাবতীয় প্রচেষ্টা চালায়।

এ অবস্থায় গর্ব, অহংকার ও নিজেদের প্রদর্শনী করার জন্যে– সর্বোপরি মানুষদের আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার জন্যে কোরায়শরা যেভাবে ঘর বাড়ি থেকে বের হয়ে ময়দানে এসেছে, তা মোমেনরা স্বচক্ষে দেখেছে এবং এ দাম্ভিক আচরণের কি ভয়াবহ পরিণাম নিয়ে তারা ঘরে ফিরে গেছে, তাও মোমেনরা ভালো করে দেখেছে। তারা অপমান, পরাজয় ও লাঞ্ছনা নিয়েই নিজ নিজ বাড়ি ঘরে ফিরে গেছে। আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনাটিকে মোমেনদের দলের সামনে একটি চূড়ান্ত শিক্ষামূলক বিষয় হিসাবে পেশ করলেন এই বলে যে,

'তোমরা তাদের মতো........ তাদের কার্য ঘিরে রেখেছ।'

কাফেরদের দম্ভ অহমিকা, প্রদর্শনীমূলক আচরণ ও আল্লাহর পথ থেকে মানুষদের ফিরিয়ে রাখা ইত্যাদি আবু জাহলের কথা থেকেই স্পষ্ট জানা যায়। আবু জাহলের কাছে আবু সুফিয়ানের দূত এসে খবর দিলো যে, আবু সুফিয়ান বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সমুদ্র পাড় দিয়ে বের হয়ে বেঁচে গেছে, তাই আবু জাহল যেন লশকর নিয়ে মক্কায় ফিরে যায়। কারণ বাণিজ্য কাফেলা বেঁচে যাওয়ায় আপাতত তাদের মোহাম্মদ ও তাঁর সাথীদের সাথে যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। আবু জাহল তার সাথে গায়িকা ও নর্তকী ও বহু ধরনের গান বাজনার সামগ্রী নিয়ে এসেছিলো। তারা ভেবেছে, গায়িকারা গান গাইবে, নর্তকীরা নাচবে এবং উট যবাই করে আনন্দ উপভোগ করবে এবং পথে পথে নিজেদের ক্ষমতার ও দম্ভ-অহমিকার চিহ্ন রেখে যাবে। এভাবেই আমরা বদরের উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছবো। তিন দিন সেখানে থাকবো, উট যবাই করবো, খাবার দাবার নিয়ে আনন্দ করবো, মদ খাবো, গায়িকাদের গান গাওয়াবো। এর ফলে গোটা আরব উপদ্বীপ আমাদের সব সময় ভয় করবে।

আবু জাহলের এই জবাব নিয়ে যখন দূত আবু সুফিয়ানের কাছে ফিরে গেলো, তখন আবু সুফিয়ান বললো, হায় আমার জাতি, এই হচ্ছে আমর বিন হিশামের (আবু জাহল) কান্ড! সে মানুষদের এজন্যে ফেরত নিতে চায় না যে, সে হচ্ছে তাদের নেতা এবং সে হচ্ছে ভারী অহংকারী,

আর অহংকার হামেশাই ক্ষতি ও দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে। যদি আজ মোহাম্মদের বাহিনী জয়লাভ করে, তাহলে আমরা অত্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে যাবো। পরে অবশ্য আবু সুফিয়ানের এই জ্ঞানসুলভ ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। মোহাম্মদ (স.) মোশরেক বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তারা অপমানিত ও পরাজিত হয়ে মক্কায় ফিরে গেলো। তাদের দম্ভ-অহমিকা পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে গেলো। তাদের অহংকার, তাদের না-ফরমানী তাদের পতনের কারণ হলো এবং বদরের উপত্যকা তাদের জয়মালা পরানোর বদলে অপমানের কলংক পরিয়ে দিলো। তাই আল্লাহ বলেন,

'তাদের যাবতীয় কার্যক্রম আল্লাহ তায়ালা পরিবেষ্টন করে আছেন।'

তাদের কোনো কিছুই আল্লাহর কাছ থেকে রক্ষা পাবে না। তাদের কোনো শক্তিই তাকে অক্ষম করতে পারে না। তিনি চারদিক থেকে তাদের কর্মকান্ডকে ঘিরে রেখেছেন। তারা কোনো দিক থেকেই বেঁচে যাবে না।

বদর যুদ্ধে শয়তানের উপস্থিতি

পরবর্তী প্রসংগে আসছে কিভাবে শয়তান মোশরেকদের প্রলোভন দিয়েছিলো, বিশেষকরে যখন তারা ঘর থেকে বের হয়ে বদরের দিকে আসছিলো তখন শয়তান তাদের সামনে কী ধরনের চিত্র পেশ করেছিলা সে আলোচনাই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এরশাদ হচ্ছে, (আয়াত-৪৮)

এই ঘটনা ও এই আয়াতের ব্যাপারে বেশ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে মোয়াত্তায়ে মালেকের রেওয়ায়াত ছাড়া অন্য কোনো হাদীসই রেওয়ায়াতের মাপকাঠি অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য নয়। মোয়াত্তার হাদীসটি হচ্ছে এই, আহমদ বিন ফারাজ বর্ণনাসূত্রে আবদুল মালেক বিন আবদুল আযীয ইবরাহীম বিন আবি আইলাহ তালহা বিন আবদুল্লাহ বিন কোরায়য থেকে বলেন, আল্লাহর রসূল বলেছেন ইবলীস শয়তান কোনো দিন এতো ছোট এতো হীন এতো উদ্বিগ্ন এবং এতো রাগান্বিত হয়না যেভাবে সে আরাফার দিন (যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ) হয়। এটা একারণে যে, সে এই দিন আল্লাহর রহমতের অবতরণ ও বান্দাদের গুনাহ মাফ করার দৃশ্য দেখতে পায়। হাঁ বদরের দিনও তার অবস্থা এমনটি হয়েছিলো। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, সে বদরের দিন কী দেখেছিলো। রসূলুল্লাহ (স.) বললেন, সে জিবরাঈলকে দেখলো তিনি ফেরেশতাদের এদিক-সেদিক অবতরণ করিয়ে তাদের দায়িত্ব ভাগ করে দিচ্ছেন। এই হাদীসে বর্ণনাকারী আবদুল মালেক বিন আবদুল আযীয হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। এ বর্ণনা মুরসাল।(১)

বাকী বর্ণনাগুলোর মধ্যে রয়েছে আলী ইবনে আবু তালহা ও ইবনে জারীর সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা। ইবনে ইসহাকের সূত্রে ওরওয়া ইবনে যোবায়রের বর্ণনা। সায়ীদ বিন যোবায়রের সূত্রে কাতাদার বর্ণনা। সর্বশেষে হাসান ও মোহাম্মদ ইবনে কা'বের বর্ণনা।

এই হচ্ছে কতিপয় রেওয়ায়াতের উদাহরণ। এর মাঝে ইবনে জারীর তাবারীর বর্ণনায় বলা হয়েছে,

মুসান্না আবদুল্লাহ বিন সালেহর কাছ থেকে, তিনি মোয়াবিয়া বিন আলী ইবনে আবু তালহার কাছ থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন–

ইবলীস বদরের দিন শয়তানদের একটি বাহিনী নিয়ে এলো। তার সাথে একটি পতাকাও ছিলো। শয়তান নিজে সুরাকা বিন মালেক (২) বিন জাশীমের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো। ইবলীস

(১) যে হাদীসের শেষের দিকে এসে একজন সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং স্বয়ং তাবেয়ী আল্লাহর রসূল (স.)-এর নাম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে 'হাদীসে মুরসাল' বলে।

(২) সূরাকা বিন মালেক অবশ্য পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।–সম্পাদক

মোশরেকদের কাছে এসে বললো, আজ তোমাদের ওপর কেউই বিজয়ী হতে পারবে না। আমি তোমাদের সাথেই রয়েছি। যখন লোকেরা যুদ্ধের জন্যে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো, তখন আল্লাহর রসূল এক মুষ্টি মাটি নিয়ে মোশরেকদের মুখের ওপর নিক্ষেপ করলেন। তখন তারা পেছনের দিকে পালাতে লাগলো। জুয়ায়ব ইবলীসের দিকে এগিয়ে গেলো। তার এক হাত এক মোশরেকের হাতের সাথে জড়ানো ছিলো। ইবলীস নিজের হাত তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলো। নিজের দলবলসহ পেছনের দিকে পালিয়ে গেলো। সে ব্যক্তি পেছন থেকে ডাকলো, হে সুরাকা (সে ছিলো মূলত ইবলীস) তুমি তো বলছিলে তুমি আমাদের সাথে রয়েছো! ইবলীস বললো, 'আমি এমন কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি, তোমরা যা দেখতে পাচ্ছো না। আমি অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ তায়ালা কঠোর আযাব নাযিল করেন। এ সময় ইবলীস নিজে ফেরেশতাদের দেখতে পাচ্ছিলো।

ইবনে হামীদ বর্ণনা করেন, তার কাছে ইবনে ইসহাক থেকে সালমা বলেছেন, ইয়াযীদ বিন রুমান ওরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, যখন কোরায়শরা ময়দানে সমবেত হয়েছে, তখন ইবলীস সুরাকা বিন মালেক বিন জা'শীমের রূপ নিয়ে আভির্ভূত হলো এবং বললো, আমি তোমাদের পাশে রয়েছি। আমি দেখি পেছন থেকে তোমাদের কেউ কোনো ক্ষতি করে কিনা, একথা বলে তারা দ্রুত বের হয়ে গেলো। কাতাদার বর্ণিত হাদীসটি এসেছে বাশির বিন মোয়াযের সূত্রে, তার কাছে সায়ীদের সূত্রে ইয়াযীদ বলেছেন, ইবলীস যখন জিবরাঈলকে ফেরেশতাদের দল নিয়ে অবতরণ করতে দেখলো, তখন আল্লাহর এই দুশমন বললো, আমি ফেরেশতাদের মোকাবেলা করতে পারবো না। আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখো না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। কিন্তু আল্লাহর এই দুশমন আসলেই মিথ্যা কথা বলেছে। সে আল্লাহকে ভয় করেনি। মূলত সে জানতো যে, এখানে দাঁড়াবার তার কোনো ক্ষমতাই নেই এবং এ থেকে সে রক্ষাও পাবে না। আর আল্লাহর এই শত্রু হামেশাই তার সাংগোপাংগদের সাথে এই নীতিই অবলম্বন করে যে, হক ও বাতিলের সম্মুখ সমরে সব সময়ই পালিয়ে যায়। নিজের সংগী সাথীদের এভাবেই সে বিপদের সময় ধুঁকে ধুঁকে মারার জন্যে ফেলে নিজে পালিয়ে যায়।

আমরা কিন্তু এই তাফসীরের নিয়ম অনুযায়ী কোনো অদৃশ্য বিষয়ের ওপর আলোচনা করি না। এখানেও তেমন কোনো আলোচনা আমরা করবো না। কেননা এসব বর্ণনা কোরআনের আয়াত কিংবা নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনায় সমর্থিত নয়। আমরা এগুলোকে ঘটনা হিসেবে অস্বীকার করি না, তবে একান্ত আকীদা বিশ্বাস হিসাবে এর ওপর কথা বলতে পারি না। কারণ আকীদা বিশ্বাস হচ্ছে তাই- যা একমাত্র কোরআন ও নির্ভরযোগ্য মোতাওয়াতের(৩) হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়। এ ব্যাপারে কোরআনের আয়াত শুধু এটুকুই বলে যে,

'শয়তান মোশরেকদের কার্যকলাপকে সুন্দর করে তাদের সামনে পেশ করেছে এবং তাদের নিজের সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে হাযির করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু ময়দানে যখন উভয় দল একে অপরের মুখোমুখি হয়েছে, তখন সে পালিয়ে গেলো এবং বললো, আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি- যা তোমরা দেখো না। আমি আল্লাহকে ভয় করি'।

একথা বলে সে যুদ্ধের ময়দানে তাদের একা রেখে নিজের পথে চলে গেলো।

শয়তানের এ কাজের ধরন ও প্রকৃতি আমাদের জানা নেই। এটা আমাদের বোধশক্তির বাইরে। শয়তান নিজে যেমন অদৃশ্য তার কর্মকান্ডও তেমনি অদৃশ্য। এ সব গায়বী বিষয়ের ধরন

(৩) যে সহীহ হাদীসকে প্রত্যেক যুগে এতো বেশী লোক রেওয়াত করেছেন যে, এতো লোকের পক্ষে একত্রে মিথ্যা বলা সাধারণত অসম্ভব বিবেচিত হয়, সে ধনের 'হাদীসকে হাদীসে মোতাওয়াতের' বলে।-সম্পাদক

সম্পর্কে আমরা কিছুই বলতে পারি না। আমাদের ইজতেহাদ এখানেই শেষ। এ ব্যাপারে শায়খ মোহাম্মদ আব্দুহু ও তার চিন্তাধারার দিকেও ধাবিত হতে চাই না যে দৃষ্টিসীমার বাইরে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কেও তার একটা বৈষয়িক ব্যাখ্যা করতে হবে।

আল্লামা রশিদ রেজা তার তাফসীরে বলেছেন যে, মোশরেকদের উদ্দেশ্যে শয়তানের কথা বলা মূলত কোনো বৈষয়িক দৃষ্টির কথা বলা নয়। এটা হচ্ছে এক ধরনের শয়তানী ওয়াসওয়াসা। সে তাদের মনে এ ওয়াসওয়াসা দিয়েছে যে, আজ তোমাদের ওপর অন্য কোনো মানুষই জয়লাভ করতে পারবে না। আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে আছি। মোহাম্মদের অনুবর্তন শুধু কতিপয় দুর্বল ব্যক্তিই করেছে। তোমরা সম্মান, মান মর্যাদা ও সংখ্যায় তাদের চাইতে অনেক বড়ো। এসব কিছুর পাশাপাশি আমি তো তোমাদের সাথে আছিই। বায়যাবী তার তাফসীরে বলেছেন, আসলে শয়তান এর দ্বারা একান্তভাবে তার আনুগত্য করার জন্যেই তাদের প্রলোভন দিয়েছে। মোশরেকেরা ধারণা করেছে সে হচ্ছে তাদের শুভাকাংখী, তাদের আশ্রয়দাতা।

'যখন সে উভয় বাহিনীকে দেখলো, তখন পালিয়ে গেলো।'

অর্থাৎ যখন উভয় দল যুদ্ধের জন্যে একে অপরের পাশে এলো, তারা একদল আরেক দলকে দেখতে পেলো এমনকি তখনো প্রাণপণ যুদ্ধ শুরু হয়নি, তখন সে কেটে পড়লো।

যেসব মোফাসসের বলেছেন শয়তান যুদ্ধের ময়দানে ধরা ছোঁয়া বস্তুর মতোই হাযির হয়েছে, তারা আসলে ভুল করেছেন। আসল কথা হচ্ছে শয়তান তাদের নানা কথার প্রলোভন দিয়েছে। তার 'কথা বলা' হচ্ছে ওয়াসওয়াসা দেয়ার উদাহরণের মতো। অতপর শয়তান তাদের ফেলে চলে গেলো। বললো, আমি অবশ্যই তোমাদের থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি– যা তোমরা দেখতে পাওনা। আমি আল্লাহকে ভয় করি, অর্থাৎ সে তাদের নিজ নিজ অবস্থার ওপর ফেলে চলে গেলো এবং তাদের অবস্থা– বিশেষ করে যখন দেখলো ফেরেশতাদের দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সাহায্য করছেন, তখন সে তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলো।

আসলে শয়তানী লশকর মোশরেকদের দলে অনুপ্রবেশ করলো। তাদের নানাভাবে ওয়াসওয়াসা দিতে শুরু করলো। মিথ্যা আশা ও প্রতারণা দিয়ে তাদের ধোকা দিতে লাগলো। অপরদিকে ফেরেশতারা মুসলমানদের নেকী ও দৃঢ়তার জন্যে উৎসাহ দিতে লাগলো। এর ফলে মুসলমানদের দৃঢ়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলো। ফেরেশতাদের কাজ মুসলমানদের গায়বী উৎসাহ দেয়ার পাশাপাশি ধরা-ছোঁয়ার জগতে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করাও কিছু মোফাসসেরের বক্তব্য অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। কেননা অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তাদের ঘাড়ের ওপর আঘাত করো– তাদের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করো।'

আল্লাহর এই বক্তব্যের মতো শয়তানের কাজকেও এরা মনে করেন বৈষয়িক– যাকে দেখা যায়, অনুভব করা যায়। এভাবেই মোহাম্মদ আবদুহু ৩০ পারার সূরা ফীল-এ 'তায়রান আবাবীলে'র ব্যাখ্যা করেছেন জল বসন্তের কীট ও জীবাণু। আসলে এসবই হচ্ছে তাফসীরের নামে কিছুটা বাড়াবাড়ি। কারণ যা কিছুই অদৃশ্য, যা-কিছু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তার একটা অনুভবযোগ্য ব্যাখ্যা করতেই হবে তা মোটেই ঠিক নয়। যেখানে এ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কোনোই প্রয়োজন নেই, কোরআনের সুস্পষ্ট শাব্দিক বর্ণনায় এ ধরনের কোনোই সুযোগ নেই। এ আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমি এ পদ্ধতিই অবলম্বন করেছি।

বস্তুবাদী উপকরণের ওপর নির্ভর করা মোনাফেকীর লক্ষণ

এদিকে যখন শয়তান কাফের মোশরেকদের বিশেষ করে যারা দম্ভ-অহমিকা ভরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, যারা আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করছিলো, তাদের শয়তান উৎসাহ দিয়ে প্রতারণা করছিলো। তখন আরেকদিকে মোনাফেক এবং যাদের অন্তরে

ব্যাধি রয়েছে, তারা মুসলমানদের দুর্বল ও কাপুরুষ বানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিলো, তাদের মনে ভয়ের উদ্রেক করছিলো, যেন তারা জেহাদের ময়দানে না যায়। তারা বলতো, মুসলমানরা সংখ্যায় নিতান্ত কম, তারা দুর্বল। মোশরেকদের মোকাবেলায় তাদের যুদ্ধ করা আত্মহত্যা করা ও নিজেদের ধ্বংস করার শামিল। তাদের দ্বীন তাদের ধোকায় ফেলেছে। তারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করতে চায়। এ ব্যাপারে এরশাদ হচ্ছে,

'যখন মোনাফেক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা বললো যে, এদের দ্বীন এদের প্রতারিত করে রেখেছে।'

মোনাফেক ও অন্তরের ব্যাধি সম্পন্ন লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা ছিলো সে সব লোক, যারা মক্কায় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু তাদের আকীদা তখনও পরিশুদ্ধ হয়নি। তাদের অন্তরও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়নি। এরা অনেকটা বাধ্য হয়ে মোমেনদের সাথে বেরিয়ে এসেছে। ময়দানে এসে যখন এরা দেখলো মুসলমানদের সংখ্যা নিতান্ত কম ও কাফেরদের সংখ্যা অনেক, তখন তারা এধরনের কথা বলতে শুরু করে। এরা জয় পরাজয়ের আসল উৎস সম্পর্কে কিছুই জানতো না। তারা শুধু বাহ্যিক দিকটাই দেখেছে, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কোনো ব্যাপারকে পর্যালোচনা করে দেখেনি। তারা চিন্তা করে দেখেনি যে, মানুষের আকীদা বিশ্বাসে কী পরিমাণ শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে। আল্লাহর ওপর ভরসা করলে, তাঁর ওপর নির্ভর করলে কী পাওয়া যায়, তাও তাদের জানা ছিলো না। আকীদা বিশ্বাস তথা কোনো আদর্শ যখন কোনো ব্যক্তি কিংবা দলকে শক্তি যোগায়, তখন তার সামনে সংখ্যা, প্রস্তুতি ও বৈষয়িক সাজ সরঞ্জাম অর্থহীন বস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। এই মূল জিনিসটার অনুপস্থিতির কারণে মোনাফেক ও অন্তরের ব্যাধি সম্পন্ন মানুষরা বাহ্যিক সাজ সরঞ্জামে প্রতারিত হয়ে গেলো। তারা মনে করেছিলো মুসলমানরা বুঝি নিজেদের ধ্বংস সাধন করতে যাচ্ছে। কিন্তু পরিণামে দেখা গেলো মুসলমানরা নয় মূলত তারাই নানাভাবে প্রতারিত হয়েছে। বৈষয়িক ও বাহ্যিক উপায় উপকরণের ক্ষেত্রে ঈমানদার ও বে-ঈমান লোকদের ব্যাপারটি একই রকম। কিন্তু এই বাহ্যিক ও বৈষয়িক উপায়-উপকরণের মূল্যবোধের ক্ষেত্রে, তার যথার্থ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এদের উভয়ের মাঝে ব্যবধান অনেক বেশী। বে-ঈমান ব্যক্তি শুধু সে উপায়-উপকরণকেই দেখে, তাদের দৃষ্টি এই উপায় উপকরণের বাইরে কখনো যায় না। কিন্তু ঈমানদারদের দৃষ্টি থাকে বাহ্যিক উপায় উপকরণের বাইরে– আসল সত্যের প্রতি যে আসল সত্য সব কয়টি শক্তির ওপর ছেয়ে আছে বে-ঈমান ব্যক্তি কখনো এই শক্তির মূল্যায়ন করতে পারে না। তাই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'যে কেউই আল্লাহর ওপর ভরসা করবে (সে যেন জেনে রাখে যে,) আল্লাহ তায়ালা বিজয়ী ও বিজ্ঞ কুশলী'।

তিনি বিজয়ী, তাঁর ওপর অন্য কোনো কিছুই বিজয়ী হতে পারে না। তিনি কুশলী, হেকমতওয়ালা। প্রতিটি কাজ তিনি হেকমত ও কৌশলের সাথে আঞ্জাম দেন। কোনো ব্যক্তি কিংবা সমষ্টি যখন তাঁর ওপর ভরসা করে, তখন তাদের সাহায্য করা থেকে কেউই তাকে রুখতে পারে না। এটাই হচ্ছে সে মূল্যবান জিনিস মোমেনদের অন্তর যা পেয়ে যায় এবং তাতেই সে সন্তুষ্ট হয়। বে-ঈমান লোকদের দৃষ্টি থেকে যে জিনিসটা গোপন– মোমেনদের কাছে তা অমূল্য, তার তুলনা কোনো কিছুর সাথেই করা যায় না। এটাই হচ্ছে সে জিনিস, যা ভারসাম্যের পাল্লাকে একদিকে ভারী করে দেয়। পরিণামও সে অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয়। প্রতিটি যুগে প্রতিটি জনপদে শেষ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এ বিষয়টির ওপরই ফয়সালা নির্ভর করে।

মোনাফেক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা বদরের যুদ্ধের মতো সব সময়ই যখন ঈমানদাররা কোনো আল্লাহ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের সম্পর্কে এমন ধরনের কথা বলেছে যে, ঈমানদারদের একমাত্র তাদের এই 'দ্বীন' ছাড়া আর কোনো কিছুই নেই। এরা শুধু এই দ্বীনের বিশ্বাসের ওপর ভরসা করেই নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে জেহাদের জন্যে বের হয়ে আসে। আর এই কারণেই তারা বলতো যে, মোমেনদের দ্বীন তাদের প্রতারণায় ফেলে দিয়েছে। এই দ্বীনের কারণেই তারা যাবতীয় ঝুঁকির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিপদে হতবাক না হয়ে বরং দৃঢ়পদে এগিয়ে যায়। তারা প্রায়ই এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করতো, নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে তারা এর কোনো ব্যাখ্যা করতে পারতো না। তাদের দৃষ্টিভংগি ছিলো নেহায়াত স্থূল ও বস্তুবাদী। তারা মানুষের গোটা জীবনকে তার দ্বীন-ঈমান সহ একটি বাজারী ব্যবসা মনে করে নিয়েছে। এই ব্যবসায় যদি লাভ দেখা যায়, তাহলে এগিয়ে যায়। আবার তাতে কোনো ক্ষতির আশংকা দেখা দিলে তা থেকে ফিরে আসে। এরা আসলে মানুষের জীবন ও জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলোকে মোমেনদের দৃষ্টি নিয়ে দেখে না। তারা কোনো কিছুর পরিণাম ফল– লাভ লোকসানকে ঈমানের পাল্লা দিয়ে ওযন করে না।

মোমেনদের কাছে দ্বীনটাই হচ্ছে একটা স্থায়ী লাভজনক ব্যবসা, যার পরিণাম আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়, শাহাদত ও জান্নাত। এর উভয়টাই মোমেনদের জন্যে লাভজনক। কোনো অবস্থায় সে লোকসানের সম্মুখীন নয়। তাছাড়া শক্তি সামর্থের বিষয়টিও বিভিন্ন ধরনের। এখানে আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সব কিছুর উৎস। সব কিছুর ওপর তিনিই ক্ষমতাবান। এ কথাটি মোনাফেকরা কখনো অনুধাবন করতে পারে না। মোমেনদের মানদন্ড হচ্ছে ঈমান। সে দুনিয়ার সবকিছুকে এই মানদন্ডের পাল্লায় ওযন করে। তার কাছে আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্থান কাল কোনো বিষয়ই নয়। সে সব কিছুকে আল্লাহর নূরের আলো দিয়ে দেখে। তার কাছে রয়েছে একটি স্থায়ী ও জীবন্ত মানদন্ড। যে কোনো জিনিসকেই সে এই মানদন্ডের ওপর রেখে পরখ করে নিতে পারে। আর এই দৃষ্টিতে আল্লাহ তায়ালাই মোমেনদের জন্যে যথেষ্ট। কেননা তিনিই হচ্ছেন চিরবিজয়ী।

কাফের ও মোশরেকদের করুন পরিণতি

শেষদিকে কোরআন এক পর্যায়ে যুদ্ধের দৃশ্যের মাঝে ফেরেশতাদের হস্তক্ষেপের কথাকে আল্লাহর অনুমতিক্রমে বলে পেশ করেছে। ফেরেশতারা আল্লাহর হুকুমে কাফেরদের শাস্তি প্রদানের কাজে শামিল ছিলো। তাদের রূহসমূহকে খুবই খারাপভাবে বের করে নিচ্ছিলো এবং তাদের ভয়ানক ও অপমানকর শাস্তি দিয়ে যাচ্ছিলো। এটা ছিলো তাদের দম্ভ ও অহমিকার শাস্তি। যুগে যুগে যারাই এই অহমিকার আচরণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের এভাবে শাস্তি দিয়েছেন। এটা ছিলো তাদের যথার্থ পাওনা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর যুলুম করেননি।

এই প্রসংগে এখানে অতীতের একটা প্রসংগ উপস্থাপন করে বলছেন–

'ফেরাউন ও তার দল বলের মতো– যারা আগে গত হয়ে গেছে।'

'এটা একারণে যে, আল্লাহ তায়ালা যে নেয়ামত কোনো জাতিকে দিয়েছেন, তাকে তিনি পরিবর্তন করতে চান না– যতোক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা তাকে পরিবর্তন করে ফেলে।'

তাই এখানেও তাদের উদাহরণ দেয়া হয়েছে ফেরাউন ও তার দলবলের সাথে। যুগে যুগে যারাই এভাবে আল্লাহর সাথে শেরেক করেছে, তাদের এভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছে।

এরশাদ হচ্ছে, (আয়াত-৫০-৫৪)

এই আয়াতগুলোর প্রথম দুটি আয়াত ফেরেশতাদের জান কবয করা ও তাদের আযাব দেয়ার কথা বলেছে। (আয়াত-৫০-৫১)

এতে যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতাদের শামিল হবার কথাটি বলা হয়েছে,

'অতপর ফেরেশতারা তাদের তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে ক্রমাগত আঘাত করে যাচ্ছিলো

ইতিপূর্বে নবম পারায় এই আলোচনায় আমরা বলেছি যে, ফেরেশতাদের এই মারার ধরন কেমন ছিলো, কিভাবে তারা মোশরেকদের ঘাড়ে আঘাত করছিলো, কিভাবে তাদের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হানতো, তাও বিস্তারিত বলতে পারবো না। কিন্তু এটা কোনো অবস্থায়ই আমাদের বলে না যে, আমরা এর এই সুস্পষ্ট বাহ্যিক আঘাতের কোনো ব্যাখ্যা পেশ করতে যাবো। কেননা এখানে সুস্পষ্ট আয়াতে ফেরেশতাদের মারার কথা বলা হয়েছে। আর ফেরেশতাদের ব্যাপারে আমরা জানি, আল্লাহর ভাষায়- 'আল্লাহর ফেরেশতারা কখনো আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করে না। তারা তাই করে, যা তাদের করতে বলা হয়।'

এই অর্থ তখনই গ্রহণ করা হবে, যখন এর সাথে বদরের যুদ্ধের সম্পর্ক জড়ানো হবে। কিন্তু এও হতে পারে যে, এর অর্থ একটি স্থায়ী অবস্থা বুঝানোর জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা যখনি কাফেরদের 'রূহ' কবয করেন, তখন এভাবেই করেন। সে অবস্থায় 'যদি তুমি দেখতে' দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তিকেই বুঝানো হবে, যদিও প্রথম উদ্দেশ্য- এ আয়াত বদরের ব্যাপারে আল্লাহর রসূলকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। কোরআনের সম্বোধনের ক্ষেত্রে এটা বহু জায়গায়ই এমন হয় যে, বলা হয় একটি বিশেষ ব্যাপারে, কিন্তু সম্বোধন করা থাকে সাধারণভাবে সবাইকে।

যাই হোক, এই আয়াতের সম্বোধন সাধারণ হোক কিংবা বিশেষ হোক, এর প্রথম দিকে সে অপমান ও লাঞ্ছনার কথা বলা হয়েছে যা কাফের ও মোশরেকদের রূহ কবয করার সময় তাদের দেয়া হয়ে থাকে। অতপর সম্বোধন এবার সরাসরি মধ্যম পুরুষে চলে এসেছে।

'তোমরা জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকো।' এটা তোমাদের তোমাদের নিজেদেরই তাদের কামাই।'

অতপর তোমাদের শাস্তি ঠিক মতোই তোমাদের করে দেয়া হবে, ঠিক সে পরিমাণ- যে পরিমাণ তোমরা অর্জন করেছো।

'আল্লাহ তায়ালা কখনো বান্দার ওপর যুলুম করেন না।'

এই হচ্ছে কোরআনের আয়াত। এখানে প্রশ্ন আসে যে, তাদের আযাবে নিক্ষেপ করা হবে কি হিসাব কিতাব হয়ে যাওয়ার পর- না কি তাদের মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের এই আযাবে নিমজ্জিত করা হবে।

আসলে এ দুটোই হতে পারে। কোরআনের বর্ণনা থেকে এর যে কোনো একটা গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। এ ব্যাপারে কোনো কিছু বাড়িয়ে এর কোনো ব্যাখ্যা করাকে আমরা পছন্দ করি না। এগুলো হচ্ছে গায়বের ব্যাপার। আমরা এ ব্যাপারে ঘটনা বিশ্বাস করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না। আসল কথা হচ্ছে যে, এটা ঘটবে, কেউই একে প্রতিরোধ করতে পারবে না, এখন তা কোথায় ঘটবে কখন থেকে শুরু হবে, তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

আগের আয়াতে বলা হয়েছে, অপমানকর আযাব ও লাঞ্ছনাকর শাস্তি শুধু এদের জন্যেই নয়- বরং যুগ যুগান্তর থেকে কাফের ও মোশরেকদের সাথেই আল্লাহর এই নিয়ম চলে এসেছে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'ফেরাউনের দলবল....... কঠোর আযাব।'

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা মানুষদের এমনি ছেড়ে দিয়ে রাখেননি যে, তাদের কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তাদের কোনো কার্যকলাপই এমন নয়, যার ওপর কোনো তদারককারী নিয়োজিত নেই। যা বদরের দিন যা ঘটেছে এটা কোনো নতুন কিছু নয়। এটা আল্লাহর এক স্থায়ী নীতি। মোশরেকদের জন্যে সেদিন যে শাস্তি ও অপমানের বিধান ছিলো আজো তা কার্যকর রয়েছে। ফেরাউনের সাথীরা ও তাদের পূর্ববর্তী কাফেররাও এ ভাবে তাদের শাস্তি ভোগ করেছিলো।

এরশাদ হচ্ছে,

'তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করেছিলো, এরপর তাদের গুনাহের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করলেন।'

কেউ আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারেনি। কারোই এ শক্তি নেই। তাদের ওপর আপতিত তাঁর শাস্তি কখনো কেউ রুখতে পারেনি।

'অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তিদাতা।'

আসলে আল্লাহ তায়ালা কখনো কাউকে বিনা দোষে আযাব দেন না। যখন মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তাঁর মানুষের ওপর আযাব আসতে শুরু করে। পক্ষান্তরে বান্দারা যখন সর্বাত্মকভাবে তাঁর হুকুম মানতে শুরু করে তখন তিনি তাদের ওপর তাঁর অবারিত নেয়ামত বর্ষণ করেন। অসংখ্য নেয়ামত দিয়ে তাদের তিনি ধন্য করেন। যমীনে তাদের প্রতিষ্ঠা দান করেন। তাদের শাসন ক্ষমতা দান করেন। এগুলো সবই আল্লাহ তায়ালা করেন মানুষদের পরীক্ষার জন্যে। যেন আল্লাহ তায়ালা একথা জেনে নিতে পারেন যে, কে তাঁর নেয়ামতের শোকর আদায় করে মূলত আর কে তাঁর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়। মানুষেরা তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে অস্বীকার করে তাকেই তারা অস্বীকার করলো, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাথা উঁচু করলো। আল্লাহ তায়ালা যে নেয়ামত দিয়েছেন- অস্বীকার করলো। মানুষ আল্লাহ বিরোধিতার প্রমাণ দিতে লাগলো। আল্লাহর যেসব আয়াত তাদের কাছে নাযিল করা হলো, তারা তাও অস্বীকার করতে শুরু করলো,- কোনো জনগোষ্ঠীর যখন এই অবস্থা হয়, তখন বুঝতে হবে যে, আল্লাহর নিয়ম মোতাবেক তখন তারা আল্লাহর আযাবের যোগ্য হয়ে উঠেছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেয়ামতকে তখন এক এক করে আযাবে পরিণত করে যমীন থেকে তাদের সমূলে উৎখাত করে দেন।

'এটা এ কারণে যে........তারা সবাই ছিলো যালেম।'

এতে বুঝা গেলো যে, 'আলে ফেরাউন' ও তার পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস এসেছিলো যখন তারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করেছিলো। তারা 'কাফের' হওয়া সত্তেও আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে তাদের ধ্বংস করেননি। কেননা এটা আল্লাহর নীতি নয়-

'আমি কোনো অবস্থায় আযাব নাযিল করি না........যতোক্ষণ না তাদের কাছে রসূল পাঠাই-'

এখানে এর অর্থ এই ধরে নেয়া হয়েছে যে, তারা ফেরাউনের দলবল ও তাদের পূর্ববর্তী লোকজন ছিলো- যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে- যার পরিণামে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। কেননা তারা ছিলো যালেম। এখানে যুলুম মানে হচ্ছে কুফর ও শেরেক। কোরআনে যুলুম বলতে অনেক স্থানেই এই কুফর ও শেরেক বুঝানো হয়ে থাকে।

এই আয়াতটি নিয়ে আরেকটু চিন্তা ভাবনা করা দরকার।

'এটা এই কারণে যে, আল্লাহ তায়ালা.......... নিজেদের পরিবর্তন না করে।'

চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, বান্দাদের বেলায় আল্লাহর ইনসাফ এখানে কিভাবে কার্যকর। বান্দা যতোক্ষণ পর্যন্ত নিজেকে আল্লাহর আযাবের উপযোগী না করবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাকে দেয়া নেয়ামতকে কখনো বদলে দেন না। যতোক্ষণ না তারা তাদের নিয়ত ও এরাদা বদলে দেয়, নিজেদের কার্যপ্রণালী না বদলে ফেলে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে তাঁর নেয়ামতসমূহ কেড়ে নেন না। কিন্তু যখন সত্যিই জাতি তাদের অবস্থা ও আচার আচরণ বদলে ফেলে, আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করে না, অকৃতজ্ঞ হয়ে যমীনে দম্ভভরে চলতে শুরু করে, তখন আল্লাহর ইনসাফের দরবারে তাদের বিরুদ্ধে ফয়সালা হয় যে, এই জাতিকে এখন নির্মূল করে দেয়াই হবে উত্তম। একদিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই ফয়সালার মাধ্যমে যমীনে তাঁর ইনসাফের ভারসাম্য বজায় রাখেন, অন্যদিকে মানুষ ও তার মনুষ্যত্বের সম্মান ও মর্যাদার দিকেও লক্ষ্য রাখেন।

তার কার্যকারিতা মানুষের জন্যে তখনি শুরু হয়, যখন আল্লাহর নেয়ামতের ব্যাপারে তাদের চিন্তা ও কর্মধারা বদলে যায়। আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও তাঁর কৌশল তো মানুষের ওপর প্রযোজ্য হবেই। কিন্তু মানুষের জীবনে তার বাস্তব প্রয়োগ নির্ভর করে তার ব্যবহারিক জীবনের পরিবর্তন পরিবর্ধনের ওপর– যা মানুষ তার কর্মকান্ড দিয়ে প্রমাণ করে। মানুষ যদি কৃতজ্ঞতার ভূমিকা পালন করে, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টিও তার সাথে সাথে থাকে। অপরদিকে যদি অকৃতজ্ঞতার আচরণ করে, তাহলে পরিণামও সেভাবেই আসে।

এই মহা সত্য 'মানুষের হাকীকত' সম্পর্কে ইসলামের ধ্যান ধারণার একটা দিক ফুটিয়ে তোলে। ফুটিয়ে তোলে এ বিশ্বজগতে তার সম্পর্কে আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা এবং এ বিশ্বজগতের সাথে ও এতে সংঘটিত ঘটনাবলীর সাথে তার সম্পর্কের দিকটাও। আর এ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় আল্লাহর মানদন্ডে মানুষের প্রকৃত মূল্য কী এবং মানুষের নিজের ও তার আশপাশের ঘটনাবলীর পরিণতি নির্ধারণে তার ভূমিকা কী। এই কর্মের বদৌলতে মানুষ তার পরিণতি নির্ধারণে আল্লাহর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত ক্রমেই ইতিবাচক উপকরণ বলে প্রমাণিত হয় আর আল্লাহর সেই ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত তার তৎপরতা, কর্ম, নিয়ত ও আচরণের মধ্য দিয়েই বাস্তবায়িত হয়। অন্যদিকে জড়বাদী মতাদর্শ মানুষকে নিছক এক দুর্বল নেতিবাচক উপাদান সাব্যস্ত করে এবং বিশ্বের অর্থনীতিতে, ইতিহাসে ও বিকাশে যে অনিবার্য ও অবধারিত প্রক্রিয়া চলতে থাকে, এই ব্যাবস্থায় তার ওপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং সে শুধু অসহায়ের মতো তার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়, সব মতাদর্শের শিকার হওয়া থেকে এই মহাসত্য মানুষকে রক্ষা করে।

অনুরূপভাবে এই মহাসত্য মানুষের জীবন কর্ম ও কর্মফলের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক চিত্রিত করে এবং এও বুঝিয়ে দেয় যে, কর্ম ও কর্মফলের এই অনিবার্যতা আল্লাহর পরিপূর্ণ ন্যায় বিচারেরই স্বাক্ষর। এটা আল্লাহর অমোঘ প্রাকৃতিক নীতি ও অটুট সিদ্ধান্ত। এতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোনো বান্দার ওপর যুলুম করেন না। এ বক্তব্যই ফুটে উঠেছে নিম্নের ক'টি উক্তিতে–

'আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের ওপর যুলুম করেন না।'

'আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম তাদেরই পাপের কারণে এবং ফেরাউনের সমর্থকদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। তারা সবাই অত্যাচারী ছিলো।'

'কেনো জাতি নিজেদের অবস্থার নিজেরাই পরিবর্তন না ঘটানো পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দেয়া কোনো নেয়ামতের পরিবর্তন ঘটান না।'

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ
عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِمَّا
تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِمَّا
تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ
اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

৫৫. নিশ্চয়ই (আল্লাহর এ) যমীনে (বিচরণশীল) জীবের মধ্যে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম হচ্ছে তারা, যারা (স্বয়ং এ যমীনের স্রষ্টাকেই) অস্বীকার করে এবং তারা (তাঁর ওপর) ঈমান আনে না। ৫৬. (তারাও এ নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম,) যাদের সাথে তুমি (বাকায়দা) সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করেছো, অতপর তারা প্রতিবার সুযোগ পেয়েই সে চুক্তি ভংগ করেছে এবং (এ ব্যাপারে) তারা (কাউকেই) পরোয়া করেনি। ৫৭. অতএব, এ লোকদের যদি কখনো তুমি ধরতে পারো, তাহলে তাদের মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে শাস্তি দেবে, যাতে তাদের পরবর্তী বাহিনী (এ থেকে কিছু) শিক্ষা গ্রহণ করে। ৫৮. যদি কখনো কোনো জাতির কাছ থেকে তোমার এ আশংকা হয় যে, তারা (চুক্তি ভংগ করে) বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তাহলে তুমিও (তাদের সাথে সম্পাদিত) চুক্তি একইভাবে তাদের (মুখের) ওপর ছুঁড়ে দাও (তবে তোমরা নিজেরা তা আগে লংঘন করো না); নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।

রুকু ৮

৫৯. আর কাফেররা যেন কখনোই এমন ধারণা করতে না পারে যে, ওরা (তোমাদের পেছনে ফেলে নিজেরা) এগিয়ে গেছে; (আসলে) তারা (তোমাদের পরাভূত করার কোনো) ক্ষমতাই রাখে না। ৬০. তাদের (সাথে যুদ্ধের) জন্যে তোমরা যথাসাধ্য সাজ-সরঞ্জাম, শক্তি ও ঘোড়া প্রস্তুত রাখবে এবং এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেবে, (এ ছাড়াও কিছু লোক আছে) যাদের পরিচয় তোমরা জানো না, শুধু আল্লাহ তায়ালাই তাদের চেনেন; আল্লাহ তায়ালার পথে তোমরা যা কিছুই ব্যয় করবে, তার পুরোপুরি প্রতিদান তোমাদের (পরকালে) আদায় করে দেয়া হবে এবং তোমাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না।

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي
أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ

৬১. (হে মোহাম্মদ,) তারা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহ দেখায়, তাহলে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকে যাবে এবং (সর্বদা) আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (সব কিছু) শোনেন, (সব কিছু) দেখেন। ৬২. আর যদি কখনো তারা (সন্ধির আড়ালে) তোমাকে ধোকা দিতে চায়, তাহলে (তোমার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই, কেননা) তোমার (রক্ষার) জন্যে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট; (অতীতেও) তিনি তাঁর (সরাসরি) সাহায্য ও এক দল মোমেন দ্বারা তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন, ৬৩. আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরসমূহের মাঝে পারস্পরিক (ভালোবাসা ও) সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন; অথচ তুমি যদি দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদও (এর পেছনে) ব্যয় করতে, তবু তুমি এ মানুষদের দিলগুলোর মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধন স্থাপন করতে পারতে না; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এদের মাঝে প্রীতি স্থাপন করে দিয়েছেন; অবশ্যই তিনি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ কুশলী। ৬৪. হে নবী, তোমার জন্যে এবং তোমার অনুবর্তনকারী মোমেনদের জন্যে তো আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

রুকু ৯

৬৫. হে নবী, তুমি মোমেনদের যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করো (মনে রেখো); তোমাদের মধ্যে বিশ জন লোকও যদি ধৈর্যশীল হতে পারে তাহলে তারা দু'শ' লোকের ওপর বিজয়ী হবে, আবার তোমাদের মাঝে (এমন লোকের সংখ্যা) যদি একশ হয় তাহলে তারা এক হাজার লোকের ওপর জয় লাভ করবে, এর কারণ হচ্ছে, তারা এমন জাতি যারা (আল্লাহর শক্তি সম্পর্কে) কিছুই বোঝে না। ৬৬. (এ নিশ্চয়তা দ্বারা) এখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর থেকে (উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার) বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, (যেহেতু) তিনি (একথা)

ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ
أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ
أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ
لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي
أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا
مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٠﴾ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ

জানেন, তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে; (অতপর) তোমাদের মধ্যে যদি একশ' ধৈর্যশীল মানুষ থাকে তাহলে তারা দু'শ'র ওপর বিজয়ী হবে, আবার যদি থাকে তোমাদের এক হাজার ধৈর্যশীল ব্যক্তি, তাহলে তারা আল্লাহ তায়ালার হুকুমে বিজয়ী হবে দু'হাজার লোকের ওপর; (জেনে রেখো,) আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন। ৬৭. কোনো নবীর পক্ষেই এটা শোভা পায় না যে, সে তার কাছে বন্দীদের আটকে রাখবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে যমীনে রক্তপাত ঘটাবে এবং (আল্লাহর) শত্রুদের নিপাত না করে দেবে; আসলে তোমরা তো দুনিয়ার (সামান্য) স্বার্থটুকুই চাও, আর আল্লাহ তায়ালা চান (তোমাদের) আখেরাতের কল্যাণ (দান করতে); আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। ৬৮. যদি (এ ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পূর্বের কোনো (ফরমান) লেখা না থাকতো, তাহলে (বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে তোমরা) যা কিছু নিয়েছো, তার জন্যে একটা বড়ো ধরনের আযাব তোমাদের পেয়ে বসতো। ৬৯. অতএব যা কিছু তোমরা গনীমত হিসেবে লাভ করেছো, (নিসংকোচে) তোমরা তা খাও, (কেননা) তা সম্পূর্ণ হালাল ও পবিত্র, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো; আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

রুকু ১০

৭০. হে নবী, তোমার হাতে যেসব বন্দী রয়েছে, তাদের তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের দিলে ভালো কিছু (গ্রহণের যোগ্যতা আছে বলে) জানতে পান, তাহলে তিনি তোমাদের (ঈমানের) এমন এক কল্যাণ দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে (মুক্তিপণ হিসেবে) গৃহীত সম্পদের চাইতে অনেক ভালো এবং তিনি তোমাদের (গুনাহসমূহও) মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়াবান। ৭১. আর তারা যদি তোমার সাথে

فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٧١﴾ اِنَّ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ وَاِنِ
اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٧٢﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ
بَعْضٍ ؕ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٤﴾

বিশ্বাস ভংগ করতে চায় (তাহলে তুমি ভেবো না), এরা তো এর আগে আল্লাহ তায়ালার সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং (এ কারণেই) তাদের মধ্য থেকে তিনি তোমাদের বিজয় (ক্ষমতা) দান করেছেন; আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন জ্ঞানবান ও কুশলী। ৭২. নিসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে (এবং এই ঈমানের জন্যে) হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা (মোহাজেরদের) আশ্রয় দিয়েছে ও (তাদের) সাহায্য করেছে, তারা সবাই পরস্পরের বন্ধু; (অপরদিকে) যারা ঈমান এনেছে অথচ এখনো হিজরত করেনি, যতোক্ষণ পর্যন্ত তারা হিজরত না করবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের ওপর নেই, (তবে কখনো) যদি তারা (একান্ত) দ্বীনের খাতিরে তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য চায়, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, (তবে তা) যেন এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে না হয় যাদের সাথে তোমাদের (কোনো রকম) চুক্তি রয়েছে; (বস্তুত) তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা সব কিছুই দেখেন। ৭৩. যারা কুফরী করেছে তারা একে অপরের বন্ধু, তোমরা যদি (একে অপরকে সাহায্য করার) সে কাজটি না করো, তাহলে (আল্লাহর এ) যমীনে ফেতনা-ফাসাদ ও বড়ো ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। ৭৪. যারা ঈমান এনেছে, (এ ঈমানের জন্যে) হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে এবং যারা (এ হিজরতকারীদের) থাকার জায়গা দিয়েছে এবং (তাদের) সাহায্য করেছে, (মূলত) এরা সবাই হচ্ছে সত্যিকারের মোমেন; এদের জন্যে (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে) ক্ষমা ও উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে।

وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٥﴾

৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত; যারা আত্মীয়তার বন্ধনে একে অপরের সাথে আবদ্ধ, আল্লাহর কেতাব অনুযায়ী তারাও একে অন্যের (উত্তরাধিকারের বেশী) হকদার, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব ব্যাপার জানেন।

তাফসীর

আয়াত-৫৫-৭৫

সূরা আনফালের এই সর্বশেষ অধ্যায়ে যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে ইসলামী রাষ্ট্র বিভিন্ন অমুসলিম শিবিরের সাথে কিভাবে আচরণ করবে, ইসলামী রাষ্ট্রের বিদ্যমান বিভিন্ন সংগঠনের সাথেই বা কেমন আচরণ করবে এবং কিভাবেই বা সে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে, তার বহু সংখ্যক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে চুক্তি ও অংগীকারসমূহ, রক্ত, জাতীয়তা, ভূমি ও ধর্মভিত্তিক সম্পর্কের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভংগিও এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এ আলোচনা থেকে আরো বেশ কিছু বিধিও জানা গেছে, যার কোনো কোনোটা অপরিবর্তনীয় ও চিরস্থায়ী। আবার কোনো কোনোটা অস্থায়ী, সুনির্দিষ্ট পর্যায় ও পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত এবং পরবর্তীতে মাদানীযুগের প্রায় শেষ পর্যায়ে নাযিলকৃত সূরা তাওবায় সেগুলোর সাথে চূড়ান্ত ও স্থায়ী সংশোধনী যুক্ত হয়েছে।

কোরআনের বর্ণনার ধারাবাহিকতা অনুসারে এই সব মূলনীতি ও বিধিসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ–

১. যারা ইসলামী শিবিরের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে তা ভংগ করে, তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জীব। তাই ইসলামী রাষ্ট্রের উচিত তাদের এমন শাস্তি দেয়া, যাতে ভয় পেয়ে তারা ও তাদের উস্কানিদাতারা পালিয়ে যায়। ওই উস্কানিদাতারাই তাদেরকে চুক্তি ভংগ করতে কিংবা ইসলামী শিবিরের ওপর আক্রমণ চালাতে প্ররোচনা দিয়ে থাকে।

২. ইসলামী নেতৃবৃন্দ যে সকল চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে আশংকা করে যে, তারা চুক্তি ভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ বাতিল ঘোষণা করতে পারে। অতপর তাদের সাথে যুদ্ধ করা, তাদেরকে শাস্তি দেয়া এবং তাদেরকে ও তাদের সমমনাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করা সম্পূর্ণ বৈধ হয়ে যাবে।

৩. সর্বক্ষণ অস্ত্রশস্ত্র, সাজ সরঞ্জাম ও সৈন্য সামন্ত প্রস্তুত ও যুদ্ধ সাজে সজ্জিত রাখা এবং যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চিত করে রাখা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য, যাতে আল্লাহর অনুগত ও সৎপথের অনুসারী লোকেরাই পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী ও সবার ওপর বিজয়ী থাকে, পৃথিবীর সকল বাতিল শক্তি তাকে ভয় পায়। পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামী শক্তির বিজয় ডংকা বাজে, এর ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করার ধৃষ্টতা কারো মধ্যে না জন্মে, আল্লাহর শক্তির কাছে সবাই মাথা নত রাখে, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও তা গ্রহণ থেকে কেউ কাউকে ঠেকাতে না পারে, কেউ সার্বভৌমত্বের দাবীদার ও মানুষকে নিজের গোলামে পরিণত করতে সাহসী না হয় এবং পৃথিবীর সকল আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্যে নিবেদিত হয়ে যায়।

৪. কোনো অমুসলিম দল যখন ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে আপোষ রক্ষা করা, তার সাথে শত্রুতা পরিত্যাগ করা ও তার পথে বাধা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন মুসলিম নেতৃত্ব তাদের সেই আপোষ গ্রহণ করবে এবং এই বিষয়টি তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করবে। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে তারা যদি কোনো প্রচ্ছন্ন ধোকা দিতে চায় এবং এমন কিছু প্রকাশ না করে, যা দ্বারা ধোকা অনুমান করা যায়, তাহলে তাদের ব্যাপার আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করবে। ধোকাবাজদের ধোকা থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট।

৫. জেহাদ মুসলমানদের ওপর ফরয, এমনকি তাদের শত্রুদের সংখ্যা যদি তাদের কয়েকগুণ বেশী হয়, তবু। আল্লাহর সাহায্যে তারা বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ। তাদের একজন স্বাভাবিক অবস্থায় শত্রুর দশজন এবং দুর্বলতম অবস্থায় দু'জনের ওপর বিজয়ী হবে। সুতরাং জেহাদ ফরয হওয়ার বিষয়টা মোমেনদের ও তাদের শত্রুদের মাঝে বাহ্যিক শক্তি ও সাজ সরঞ্জামের সমতার ওপর নির্ভর করে না। মোমেনদের যতোদূর সম্ভব শক্তি সংগ্রহ করা, আল্লাহর ওপর ভরসা করা, যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণপূর্বক ময়দানে টিকে থাকা এবং বাদবাকী সব কিছু আল্লাহর ওপর সোপর্দ করা তাদের কর্তব্য। কেননা বাহ্যিক বস্তুগত শক্তি ছাড়া তাদের কাছে আরো একটা শক্তি (ঈমানী শক্তি) রয়েছে।

৬. মুসলিম বাহিনীর পয়লা কাজ হচ্ছে বাতিল শক্তির সকল উৎস ধ্বংস করে দিয়ে তাকে বিধ্বস্ত ও অকেজো করে দেয়া। শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধাদের কেবল বন্দী করা ও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়াতে যদি এ লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তাহলে এ পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। কেননা রসূল (স.) ও তার উত্তরসূরীদের কাছে শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত করে ও তাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়ে ইসলামী বাহিনীর বিজয় সুনিশ্চিত না করা পর্যন্ত কোনো বন্দী রাখার অনুমতি ছিলো না। এরপর অবশ্য বন্দী রাখা ও মুক্তিপণ বা বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তিদানে আপত্তি নেই। বিজয় সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ও শত্রুকে খতম করতে থাকাই শ্রেয়।

৭. যুদ্ধের পর গনীমত স্বরূপ হস্তগত হওয়া মোশরেকদের ধন-সম্পদ এবং শত্রু পক্ষকে ধ্বংস করে বিজয় ছিনিয়ে আনার পর তাদের থেকে মুক্তিপণ বাবদ অর্জিত অর্থ সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল।

৮. মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী অমুসলিমদেরকে প্রথমে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং ইসলাম গ্রহণ করলে তাদেরকে তাদের কাছ থেকে গৃহীত গনীমত বা মুক্তিপণের চেয়েও ভালো জিনিস দেয়ার আশ্বাস দিতে হবে। সেই সাথে এই মর্মে সতর্কও করতে হবে যে, তারা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে তা পূর্বের মতো নস্যাৎ করে দেয়া হবে।

৯. মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধনের ভিত্তি হলো ঈমান। কিন্তু শুধু ঈমানের ভিত্তিতে হতে পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা ও অভিভাকত্ব পারে না। এর জন্যে ঈমানের সাথে সাথে আন্দোলন ও সংগঠনের সাথে পরিপূর্ণ সম্পৃক্ততাও জরুরী। তাই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, হিজরতকারীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পরের অভিভাবক বন্ধু ও সহায়ক। কিন্তু যারা ঈমান এনেও ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করেনি, ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ও জনগণ তাদের অভিভাবক ও সহায়ক হতে পারবে না। তবে মুসলমান হওয়ার কারণে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে, কিন্তু আক্রমণকারীদের মুসলমানদের কোনো অনাক্রমন চুক্তি থাকলে সাহায্যও করতে পারবে না।

ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের সাধারণ পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সহযোগিতা ও অভিভাকত্বের সম্পর্ক যদিও ঈমান এবং আন্দোলন ও সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে হতে হবে, কিন্তু রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে অভিভাবকত্বের বন্ধন অগ্রাধিকার পাবে। এ ধরনের আত্মীয়রা

অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে যদি তারা মোমেন হয় এবং আন্দোলন ও সংগঠনে সম্পৃক্ত থাকে। শুধুমাত্র রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা অগ্রাধিকার কিংবা অভিভাবকত্বের অধিকার এ দুটোর কোনোটাকেই নিশ্চিত করে না– যদি ঈমান এবং আন্দোলন-সংগঠনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

সংক্ষেপে এই কটা বিধি ও মূলনীতি এই আয়াতগুলোতে আলোচিত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতির জন্য এগুলো খুবই কল্যাণকর বিধি। পরবর্তীতে আয়াতগুলোর তাফসীরের সময় এগুলো আরো কিছুটা বিশদভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

প্রতিবেশী অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক

'নিসন্দেহে সেই কাফেররা আল্লাহর চোখে নিকৃষ্টতম জীব.........যাদের সাথে তুমি চুক্তি সম্পাদন করেছ, কিন্তু তারা সেই চুক্তি প্রতিবারই লংঘন করে.........(আয়াত ৫৫ও ৬৩)

মদীনায় প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে মুসলমানরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিলো, এ আয়াতগুলোতে সেই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং মুসলিম নেতৃত্ব কিভাবে ওই পরিস্থিতির মোকাবেলা করবে, তার বিধিব্যবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে।

এ আয়াতগুলোতে পার্শ্ববর্তী অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে একটা মূলনীতি নির্ধারন করে দেয়া হয়েছে , পরবর্তী সময়ে এ মূলনীতিতে কিছু পরিপুরক ধারা এবং আংশিক সংশোধনী যুক্ত হয়েছে মাত্র। তবে সামগ্রিকভাবে এটা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও লেনদেনের অন্যতম ইসলামী মূলনীতি হিসাবে সব সময়ই বহাল রয়েছে।

এ মূলনীতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহাবস্থানের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদনের অনুমতি দেয় ও ব্যবস্থা করে– যতোক্ষণ ওই চুক্তি লংঘন করা হবে না বলে নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। এই সময়ে চুক্তিকে পূর্ণ সম্মান ও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া অপরিহার্য। কিন্তু প্রতিপক্ষ যখন চুক্তিকে প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র পাকাবার আবরণ হিসাবে ব্যবহার করবে এবং চুক্তির আড়ালে লুকিয়ে দুরভিসন্ধিমূলক তৎপরতা চালাবার পাঁয়তারা করবে, তখন মুসলিম নেতৃত্বের পক্ষে ওই চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা সম্পূর্ণ বৈধ হয়ে যাবে। তবে প্রতিপক্ষকে চুক্তি প্রত্যাখ্যানের খবরটা জানাতে হবে। জানানোর পর চুক্তি ভংগকারী বিশ্বাসঘাতকদের ওপর আক্রমণ পরিচালনার উপযুক্ত সময় নির্ধারণে মুসলিম নেতৃত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। তবে আক্রমণটা এতো প্রবল ও জোরদার হওয়া চাই যে, মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে যারা গোপন ও প্রকাশ্য ফন্দিফিকিরে লিপ্ত, তাদের সবাইকে যেন ভীত সন্ত্রস্ত করে দেয়া যায়। কিন্তু যারা মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কামনা করে এবং ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারে বাধা সৃষ্টি করতে চায় না, তাদের সাথে মুসলিম নেতৃত্বও ততোক্ষণ পর্যন্ত আপোষকামী থাকবে ও উদার আচরণ করবে, যতোক্ষণ তাদের কাছে প্রতীয়মান হবে যে, তারা শান্তিপ্রিয় ও আপোষকামী।(১)

প্রতিবেশী শিবিরসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা যে বাস্তব পরিস্থিতি মোকাবেলার বাস্তবানুগ পন্থা, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যখন ইসলামী আন্দোলন সত্যিকার নিরাপত্তা লাভ করবে এবং জনগণের কাছে তার ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর সমস্ত বাধা দূর হয়ে যাবে, এখন উদারতা ও আপোষকামিতা পরিহার করা হবে না। তবে আপোষ চুক্তিকে অপতৎপরতা ও দুরভিসন্ধির ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা এবং মুসলমানদের ওপর বিশ্বাসঘাতক সুলভ অতর্কিত আক্রমণ চালানোর সুযোগ শত্রুদেরকে কখনো দেয়া যাবে না।

এ আয়াতগুলো তৎকালীন মদীনার সমাজের যে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে, সেটা মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পর মুসলিম নেতৃত্ব সেখানে যে পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করেছে

(১) পরবর্তী সূরা তাওবায় এই সব অবস্থাকে চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে–সম্পাদিক

তারই ফলশ্রুতি। এই পরিস্থিতির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন ইমাম ইবনে কাইয়েম তার 'যাদুল মায়াদে।' তিনি বলেছেন,

'রসূল (স.) যখন মদীনায় উপস্থিত হলেন, তখন কাফেররা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হলো। একটা শ্রেণী তাঁর সাথে আপোষে উপনীত হলো এবং এই মর্মে অংগীকার করলো যে, তারা তাঁর সাথে যুদ্ধও করবে না, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকে উস্কে বা লেলিয়ে দেবে না এবং তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুর সাথে মৈত্রীও স্থাপন করবে না। এ শ্রেণীটা তাদের কুফরীর ওপর বহাল ছিলো এবং জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করতো।

আর একটা শ্রেণী তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে ও শত্রুতা পোষণ করেছে। আর একটা শ্রেণী তাঁর সাথে কোনো সম্পর্কই রাখেনি। তাঁর সাথে যুদ্ধও করেনি আপোষও করেনি। বরং অপেক্ষায় থেকেছে যে, তাঁরই বা কী পরিণতি হয়, আর তাঁর শত্রুদের ভাগ্যেই বা কী ঘটে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্য থেকে আবার একটা দল মনে মনে তাঁর বিজয় ও প্রতিষ্ঠা কামনা করতো।, একটা দল তাঁর ওপর তাঁর শত্রুদের বিজয় কামনা করতো আর একটা দল প্রকাশ্যে তাঁর সহযোগী কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাঁর শত্রুদের সহযোগী ছিলো, যাতে উভয় দলের কোপানল থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। এই শেষোক্ত গোষ্ঠীটা হলো মোনাফেক। এই দলগুলোর প্রত্যেকটার সাথে রসূল (স.) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আচরণ করতেন।

যারা রসূল (স)-এর সাথে আপোষ ও সহাবস্থানের অংগীকারে আবদ্ধ ছিলো, তাদের মধ্যে মদীনার আশপাশে অবস্থানরত তিনটা ইহুদী গোত্র– বনু কাইনুকা, বনু কোরায়যা ও বনু নযীর এবং কতিপয় মোশরেক গোত্র উল্লেখযোগ্য।

এই অবস্থাটা ছিলো নিতান্তই সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। আর এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধিমালাও চূড়ান্ত ও স্থায়ী বিধিমালা ছিলো না। বরং তাতে ক্রমাগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অবশেষে সূরা তাওবায় চূড়ান্ত ও স্থায়ী বিধিমালা নাযিল হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই পর্যায়গুলো সংক্রান্ত একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি নবম পারায় ইমাম ইবনুল কাইয়েমের 'যাদুল মায়াদ' থেকে উদ্ধৃত করেছি। এখানে ওই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটার পুনরাবৃত্তি করা জরুরী মনে করছি।

'নবুওতের সূচনাকাল থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত রসূল (স.) কাফের ও মোনাফেকদের সাথে যে নীতি অনুসরণ করেছেন তার বিবরণ এখানে আসছে।.......... নবুওতের সর্ব প্রথম যে ওহী নাযিল হয় তা হলো, 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাকা' (তুমি পড়ো তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে)-এর অর্থ দাঁড়ালো, ওই পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শুধু নিজে নিজে পড়ার আদেশ দিয়েছেন, কোনো তাবলীগ বা প্রচারের আদেশ দেননি। এরপর নাযিল করেছেন, 'হে কম্বলাবৃত, ওঠো, মানুষকে সতর্ক করো।' (মুদ্দাসসের ১ ও ২) এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, 'পড়ো তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে'। এ ওহী নাযিল করার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে নবী বানালেন। আর 'হে কম্বলাবৃত, ওঠো, মানুষকে সতর্ক করো' এ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে রসূল বানালেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছে ইসলাম প্রচারের আদেশ দেন। এরপর তিনি তাঁর গোত্রকে, তারপর তাঁর প্রতিবেশী গোত্রগুলোকে, তারপর সমগ্র আরব জাতিকে এবং সর্বশেষে সমগ্র বিশ্ববাসীকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। এভাবে তিনি নবুওত লাভের পর ১৩ বছর যাবত যুদ্ধ বিগ্রহ ও জিযিয়া আরোপ ছাড়াই ইসলামের দাওয়াত দেন এবং ধৈর্যধারণ, রক্ষণশীল নীতি অবলম্বনের আদেশ লাভ করেন।

তেরো বছরের পর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হিজরত ও যুদ্ধ করার অনুমতি দেন। এই পর্যায়ে প্রথমে তাঁকে আদেশ দেয়া হয় শুধুমাত্র আক্রমণকারীর সাথে যুদ্ধ করতে এবং যারা আক্রমণ করেনি বরং নিরপেক্ষ থেকেছে, তাদের ব্যাপারে অস্ত্র-সংবরণ ও অনাক্রমণের নীতি অবলম্বন করতে। এরপর সকল মোশরেকের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয় এবং যতোদিন কুফরী পরাভূত হয়ে পৃথিবীতে শুধু আল্লাহর আনুগত্য ও প্রভুত্ব না করে, ততোদিন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সশস্ত্র জেহাদের আদেশ আসার পর তাঁর কাছে কাফেররা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রথম শ্রেণীতে সাথে আপোষ ও শান্তি চুক্তি করা হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হয় এবং তৃতীয় অন্য একটি শ্রেণীকে জিযিয়া ও আনুগত্যের বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দেয়া হয়। যাদের সাথে শান্তি চুক্তি করা হয়, তারা যতোদিন চুক্তি মেনে চলে, ততোদিন তাদের সাথে চুক্তি পালন করতে তাঁকে আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু যদি তাদের দ্বারা চুক্তি ভংগের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তাঁকে চুক্তি বাতিল করার আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু তাদেরকে চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত না জানিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়। যারা তাঁর সাথে করা প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ....

সূরা তাওবা নাযিল হওয়ার পর এই শ্রেণীগুলোর প্রত্যেকটার সাথে কী আচরণ করতে হবে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি নাযিল হয়। আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্য থেকে যারা তাঁর শত্রু ছিলো, তারা ইসলাম গ্রহণ না করা কিংবা জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে তাঁকে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। কাফের ও মোনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ও কঠোরতার নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি কাফেরদের সাথে অস্ত্র দ্বারা এবং মোনাফেকদের সাথে কথা ও যুক্তি দ্বারা জেহাদ করেন। আর তাঁকে কাফেরদের সাথে করা সকল চুক্তি বাতিল করা ও তার দায়দায়িত্ব অস্বীকার করার আদেশ দেয়া হয়।

চুক্তিবদ্ধদেরকে সূরা তাওবায় তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমত যারা চুক্তি ভংগ করেছে, তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। সে অনুসারে তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করেন ও তাদের ওপর জয়ী হন। দ্বিতীয়ত যাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি রয়েছে, যা এখনো তারা ভংগ করেনি এবং কাউকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে প্ররোচনাও দেয়নি। এই শ্রেণীর সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, যাদের সাথে কোনো চুক্তিই হয়নি এবং তারা তাঁর ওপর আক্রমণ চালায়নি অথবা অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে চুক্তি ছিলো। এই শ্রেণীকে চার মাস সময় দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এই চার মাস অতিবাহিত হবার পর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হয়। এরপর তিনি চুক্তিভংগকারীকে হত্যা করেন এবং যার সাথে চুক্তি ছিলো না কিংবা মেয়াদহীন চুক্তি ছিলো তাদেরকে চার মাস সময় দেন। আর যারা চুক্তি পালন করতো, তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে এবং মেয়াদ শেষ পর্যন্ত কুফরীতে বহাল থাকেনি। আর যিম্মীদের (ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকারকারী) এবং ইসলাম গ্রহণ ছাড়া আর সব কিছুতে তার আইনের অনুগত অমুসলিম নাগরিকদের, ওপর জিযিয়া আরোপ করেন।......'

উদ্ধৃত এই সংক্ষিপ্ত ও চমৎকার বিবরণটা পড়া, রসূল (স.)-এর জীবনেতিহাস অধ্যয়ন ও এই সব বিধিমালা সম্বলিত আয়াত ও সূরার অবতরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করার পর আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সূরা আনফালের আয়াতগুলো মদীনার প্রাথমিক যুগ ও সূরা তাওবা নাযিলের পরবর্তী যুগের মধ্যবর্তী সময়ের অবস্থাটা ব্যক্ত করে। এ সব কথা বিবেচনায় রেখেই এ সব আয়াত অধ্যয়ন করা কর্তব্য। এই আয়াতগুলোতে যদিও কিছু সংখ্যক মূলনীতি আলোচিত

হয়েছে, কিন্তু এগুলো এ সূরাতে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেনি। চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে সূরা তাওবায় এবং রসূল (স.)-এর জীবনের শেষ পর্যায়ে এর বাস্তব অনুশীলনগুলোতে, যার বিবরণ পরে আসছে।

ইসলামের পররাষ্ট্র নীতিতে সন্ধিচুক্তি

এই আলোচনার প্রেক্ষাপটেই আমরা এ আয়াতগুলোর তাফসীরে মনোনিবেশ করতে পারি।

'আল্লাহর কাছে তারাই নিকৃষ্টতম জীব, যারা কুফরী করেছে ....' (আয়াত ৫৫-৫৬) 'দাওয়াব' (জীব) শব্দটা যদিও যে কোনো ভূচর প্রাণীকে বুঝায় এবং স্বভাবতই তা মানুষকেও অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু এটা যখন মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হয়, তখন তাতে একটা পাশবিক ভাবমূর্তি ফুটে ওঠে। তারপর এই সব মানুষ যখন এমন কুফরীতে লিপ্ত হয়, যে তারা আর ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না এবং প্রতিবার চুক্তি করে তা ভংগ করে, অথচ একটি বারও আল্লাহকে বিন্দুমাত্র ভয় করে না, তারা পরিণত হয় নিকৃষ্টতম পশুতে।

এ আয়াত দুটো কাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, সে সম্পর্কে একাধিক মতামত পাওয়া যায়। কেউ বলেন, বনু কোরায়যা সম্পর্কে। কেউ বলেন বনু নযীর সম্পর্কে। কেউ বলেন বনু কাইনুকা সম্পর্কে। আবার কারো কারো মতে, মদীনার আশপাশে বসবাসকারী মোশরেক বেদুইনদের সম্পর্কে।

আয়াতের ভাষা ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিক দিয়ে এই সবকটা মতই সঠিক হওয়া সম্ভব। কেননা রসূল (স.)-এর সাথে চুক্তি লংঘন ইহুদীরা যেমন করেছিলো, তেমনি করেছিলো মোশরেকরাও। প্রসংগত এ কথাও জানা দরকার যে, এই আয়াতগুলো বদর যুদ্ধের আগে ও পরে উদ্ভূত এবং এই আয়াতগুলো নাযিল হবার সময় পর্যন্ত বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়েই আলোচনা করেছে। তবে যে বিধি এতে বর্ণিত হয়েছে এবং চুক্তিভংগকারীদের যে স্বভাব এতে তুলে ধরা হয়েছে, তা সর্বকালেই প্রযোজ্য ও চিরস্থায়ী বৈশিষ্টেরই প্রতীক।

এই কাফেরদের কুফরী এতোটা একগুঁয়ে ধরনের যে, তা আর কখনো ঈমানে রূপান্তরিত হয় না এবং তারা ঈমান আনে না। কেননা ক্রমাগত একগুঁয়েমি ও হঠকারিতা চালিয়ে যাওয়ার দরুন তাদের স্বভাবটাই বিকৃত ও নষ্ট হয়ে গেছে এবং এর ফলে তারা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হয়েছে। প্রতিবার চুক্তি সম্পাদন করে লংঘন করতে করতে তারা মনুষ্য স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য 'প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা' তারা হারিয়ে বসেছে। ফলে পশু যেমন কোনো বিধি নিষেধ মানে না, তাদের অবস্থাও তেমনি। বরঞ্চ তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে জঘন্যতম পশু। কেননা পশুরাও তাদের স্বভাবসুলভ কিছু নিয়ম কানুন মানে না। কিন্তু এই কাফেররা কোনো নিয়ম কানুনেরই ধার ধারে না।

যেহেতু এই কাফেরদের প্রতিশ্রুতি ভাংগার স্বভাবের কারণে কেউ তাদের প্রতিবেশী হয়ে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না, তাই তাদের শাস্তি হলো, নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হওয়া। কেননা তারাও অন্যদেরকে নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করেছে। তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করা, বিতাড়িত করা ও তাদের শক্তি চূর্ণ করাও তাদের শাস্তির আওতাভুক্ত। এ কাজগুলো করতে হবে এমন প্রবলভাবে ও কঠোরভাবে যে, শুধু তারাই ভীত সন্ত্রস্ত হবে না, বরং তাদের চেলা চামুন্ডারাও ভীত সন্ত্রস্ত হবে। রসূল (স.) এবং তাঁর পরবর্তী মুসলমানরা যখনই যুদ্ধের সময় এ ধরনের শত্রুর মুখোমুখি হয়েছেন, এরূপ আচরণ করতে আদিষ্ট হয়েছেন।

৫৭ নং আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে,

'যুদ্ধে তুমি যদি তাদের সাক্ষাত পাও, তবে এমনভাবে শাস্তি দিও যেন পরবর্তীদের জন্যেও দৃষ্টান্ত হয়ে যায়।'

এটা একটা চমকপ্রদ বাচনভংগি। এতে এমন ভয়ংকর শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে, যা শুনতেই গা শিউরে ওঠে এবং পালাতে ইচ্ছা হয়। শ্রোতার মধ্যে যদি এমন প্রতিক্রিয়া হয়, তাহলে যার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, তার কী দশা হবে, সেটা বোধ হয় কল্পনা করাও দুসাধ্য। প্রতিশ্রুতি ভংগ করা যাদের জন্মগত স্বভাব হয়ে গেছে এবং যারা মনুষ্য সমাজের নিয়ম শৃংখলার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে, তাদেরকে এই কঠোর শাস্তি বিধান করতে আল্লাহ তায়ালা নিজেই রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো, এই সব অপশক্তির উপদ্রব থেকে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজকে নিরাপদ করা, এর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সকল বিদ্রোহকে অংকুরেই বিনষ্ট করা এবং অনাগত ভবিষ্যতে আর কেউ যাতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথ রোধ করার স্পর্ধা না দেখায়, সেটা নিশ্চিত করা।

বস্তুত, মুসলমানদের মনে ইসলামী শক্তির এই স্বাভাবিক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার মানসেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা আল্লাহর দ্বীনের এমনি শক্তি, প্রতাপ, পরাক্রম ও তেজবীর্য থাকা অপরিহার্য, যাতে খোদাদ্রোহী শক্তির মনে কাঁপুনি সৃষ্টি হয় এবং ইসলাম পৃথিবীর মানুষকে সকল খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তির খপ্পর থেকে মুক্ত করার যে অভিযান চালাতে বদ্ধপরিকর, তার পথে যেন তারা বাধা দেয়ার সাহস না পায়। যারা মনে করে যে, ইসলামের কর্মসূচী কেবল দাওয়াত ও প্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং পরাক্রান্ত খোদাদ্রোহী শক্তির দোর্দন্ড প্রতাপের মুখে এর চেয়ে বেশী কিছু করার দরকার নেই, তারা ইসলামের স্বভাব ও মেযাজ সম্পর্কে কিছুই জানে না।

এটা হলো প্রথম নির্দেশ, যাতে ইসলামী সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি কার্যত ভংগকারীর বিরুদ্ধে এই শাস্তি বিধান করা হয়েছে। প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে বিদ্রোহকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা এবং ভবিষ্যতের জন্যে তাদের ও তাদের অনুগামীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা থেকে নিবৃত্ত করাই এর লক্ষ্য।

দ্বিতীয় নির্দেশটার সম্পর্ক চুক্তিভংগ ও বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা দেখা দেয়ার সাথে। যখন এমন কিছু লক্ষণ দেখা যাবে, যা থেকে বুঝা যায় যে, সংশ্লিষ্ট লোকেরা চুক্তি ভংগ করার মতলব আঁটছে, তখনই হবে এই নির্দেশ পালনের উপযুক্ত সময়। নির্দেশটা হলো,

'আর যদি তুমি কোনো জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা কর, তবে তুমিও একই ভাবে চুক্তিটা তাদের দিকে ছুঁড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসঘাতকদেরকে ভালোবাসেন না।'

ইসলাম চুক্তি সম্পাদন করে চুক্তি রক্ষা করার জন্যে, ভংগ করার জন্যে নয়। কিন্তু সে যখন প্রতিপক্ষের দিক থেকে চুক্তি ভংগ করার আশংকা বোধ করে, তখন সে সম্পাদিত চুক্তিকে প্রকাশ্যভাবে বাতিল করে দেয়। ইসলাম প্রতিপক্ষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে না বা ধোকা দেয় না। সে প্রতিপক্ষকে খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দেয় যে, সে তাদের সাথে করা চুক্তির দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। কাজেই তার ও প্রতিপক্ষের মধ্যে তখন আর কোনো সন্ধি নেই। এই স্বচ্ছতা দ্বারা ইসলাম মানবতাকে মর্যাদা, স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও শান্তির উচ্চ মার্গে উন্নীত করে। শান্তি ও সন্ধির চুক্তি বহাল আছে জেনে প্রতিপক্ষ যখন নিশ্চিন্ত এবং সতর্কতামূলক ও আত্মরক্ষামূলক কোনো ব্যবস্থাই যখন গ্রহণ করেনি, তখন ইসলাম তার ওপর অতর্কিত, বিশ্বাসঘাতকসুলভ ও কাপুরুষোচিত আক্রমণ করার পক্ষপাতী নয়। এমনকি সে যদি তাদের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকসুলভ প্রথম আক্রমণ সংঘটিত হবার আশংকা করেও, তবু সে বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে আকস্মিক আক্রমণ করে না। তবে মনে রাখতে হবে খোলাখুলিভাবে চুক্তি বাতিলকরণের বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পর আর নতুন করে দিন তারিখ জানিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করতে সে বাধ্য নয়। কেননা যুদ্ধ ধোকাবাজী ও চালাকি ছাড়া কিছু নয়। যুদ্ধের সময় পক্ষ মাত্রেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে,

এটাই স্বাভাবিক। কাজেই চুক্তি বাতিল ঘোষণার পর কেউ যদি প্রতিপক্ষের ধোকা বা চালাকির শিকার হয় এবং অতর্কিত আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু হয়, তবে সে প্রতিপক্ষকে চুক্তি লংঘনের দোষারোপ করতে পারে না। এটা তার অসতর্কতারই পরিণাম। এ পরিস্থিতিতে সব ধরনের ধোকা ও চালাকি বৈধ। কেননা তা চুক্তির লংঘন নয়।

ইসলাম মানবতার সম্মান ও পবিত্রতা নিশ্চিত করতে চায়। এ জন্য সে উচ্চতর ও মহত্তর লক্ষ্য অর্জনে বিজয়ী হওয়ার নিমিত্তে অন্যায় ও হীন পন্থা অবলম্বন ও প্রতিশ্রুতি ভংগ করাকে বৈধতা দেয় না।

ইসলাম বিশ্বাসঘাতকতাকে অপছন্দ করে। যারা প্রতিশ্রুতি ভংগ করার মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাদেরকে সে ঘৃণা করে। চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি তার দৃষ্টিতে একটা পবিত্র আমানত। যতো পবিত্র ও মহৎ কাজ করাই লক্ষ্য হোক না কেন, তার দৃষ্টিতে সে জন্যে এই আমানতের খেয়ানত করা চরম ধিক্কারযোগ্য ও চরম গর্হিত ও ধিক্কৃত কাজ। মনে রাখা দরকার যে, মানুষের মন একটা অবিভাজ্য একক। এই মন যদি কোনো হীন পন্থাকে তার জন্যে বৈধ মনে করে, তাহলে ওই একই মন কোনো মহৎ ও পবিত্র লক্ষ্যের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখবে এটা সম্ভব নয়। মহৎ উদ্দেশ্য অর্জন করতে হীন ও অসৎ পন্থা অবলম্বন করা বৈধ, এটা কোনো মুসলমানের যুক্তি হতে পারে না। এ ধারণা ইসলামী চেতনা ও ইসলামী অনুভূতির পরিপন্থী। কেন না মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সততা অংগাংগিভাবে জড়িত। নোংরা পানি দিয়ে গোসল করে পবিত্র হওয়া যায় না। এসব কারণেই আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারী ও বিশ্বাসঘাতকদেরকে ভালোবাসেন না।

প্রসংগত বলা দরকার যে, এ সব হুকুম ও বিধি যখন নাযিল হয়, তখনও মানব জাতি সামগ্রিকভাবে এমন উচ্চাংগের মহৎ ও উদার নীতির সন্ধান পায়নি। যুদ্ধ বিগ্রহে তখনো জংলী আইন অনুসৃত হতো। 'জোর যার মুল্লুক তার' এটাই ছিলো শক্তিমানদের নীতি। এখানে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, এরপরও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত সকল অমুসলিম সমাজে জংলী আইনেরই রাজত্ব চলেছিলো। মুসলিম বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ও লেনদেনের সময় ছাড়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে ইউরোপের হাতে খড়িও হয়নি। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ইউরোপ 'আন্তর্জাতিক আইন' নামে একটা জিনিস যদিওবা শিখেছে, কিন্তু ইসলামের ন্যায় এত উঁচুমানের উদার ও মহৎ আচরণ সে আজও আয়ত্ত করতে পারেনি। যারা আইন শাস্ত্রে বিপুল অগ্রগতি অর্জনের কৃতিত্বের দম্ভে বিভোর তাদের ইসলাম ও আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে কতো পার্থক্য, তা খতিয়ে দেখা উচিত।

এই স্বচ্ছ, সরল ও পরিচ্ছন্ন নীতির পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তায়ালা ৫৯নং আয়াতে মুসলমানদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং কাফেরদের প্রতাপ ও পরাক্রমকে তাদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি বলেছেন,

'কাফেররা যেন কখনো মনে না করে যে, তারা মুসলমানদেরকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। তারা কখনো (সত্যিকার) মুসলমানদেরকে পরাভুত করতে পারবে না।' (আয়াত-৫৯)

তাদের খেয়ানত ও চুক্তিভংগের ন্যায় অপকর্ম তাদেরকে এ সুযোগ দেবে না যে, তারা মুসলমানদেরকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা কখনো মুসলমানদেরকে একাকী ছেড়ে দেবেন না এবং বিশ্বাসঘাতকদেরকে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম থেকে রেহাই দেবেন না। কাফেররা এত শক্তির রাখে না যে, আল্লাহ তায়ালা যখন তাদেরকে পাকড়াও করবেন, তখন তাকে পাকড়াও থেকে নিবৃত্ত রাখবে। অনুরূপভাবে তারা মুসলমানদেরকেও পরাভূত করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজেই তাদেরকে সাহায্য করেন।

সুতরাং যারা সৎ ও শালীন উপায়ে কাজ করে, তারা যখন নিয়ত খালেস রাখে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তখন অসৎ ও অন্যায় পন্থায় যারা কাজ করে, তারা যে তাদেরকে পেছনে ফেলে দিতে পারবে না, এ ব্যাপারে তাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত। কেননা তারা আল্লাহর নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত এবং তাঁর বাণীকে সমুন্নত করার কাজে ব্যস্ত। তারা আল্লাহর নামেই প্রতিটা কাজ করে এবং মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করে। তাই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

সামরিক শক্তি অর্জন করতে আল্লাহর নির্দেশ

তবে ইসলাম বিজয়ী হওয়া ও আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য মুসলমানদের সাধ্য অনুপাতে শক্তি ও সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করে। সে তার মহান লক্ষ্যগুলো অর্জনের উদ্যোগ নেয়ার আগে যে মাটিতে তার পা রয়েছে, তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং বিবেক বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে যে বাস্তব উপায় উপকরণগুলোকে সে ফলপ্রসূ পেয়েছে, সেগুলো সংগ্রহ করে। লক্ষ্য অর্জনকে নিশ্চিত করার জন্যে সে যথোপযুক্ত বাস্তবানুগ আন্দোলন চালায়। ৬০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা একথাই বলেছেন,

'তাদের জন্যে তোমরা যতোটা পারো শক্তি সঞ্চয় ও ঘোড়ার বহর প্রস্তুত করো, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারো। .... '

সুতরাং জেহাদ যেমন ফরয, তেমনি তার সাথে সাধ্যমতো শক্তি ও সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করাও ফরয। আয়াতে ধরন শ্রেণী, মাত্রা ও উপকরণ নির্বিশেষে শক্তি সঞ্চয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু 'ঘোড়ার বহর' টা সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এই জিনিসটা কোরআনের প্রথম শ্রোতাদের কাছে সুপরিচিত ছিলো। সেই যুগে পরিচিত ছিলো না কিন্তু ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে-এমন কোনো সরঞ্জাম যদি সংগ্রহ করার নির্দেশ দেয়া হতো, তা হলে মুসলমানদেরকে অনর্থক হয়রান করা হতো। এ ধরনের নির্দেশ দেয়া আল্লাহর পক্ষে মোটেই শোভন হতো না । এ নির্দেশের সোজা কথা হলো, সর্বপ্রকারের যুদ্ধাস্ত্র, সাজ সরঞ্জাম ও শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে হবে।

'তোমরা যতোটা পারো শক্তি সংগ্রহ করো।'......

বস্তুত পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টির গোলামী থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করার জন্যে ইসলামের হাতে শক্তি সঞ্চিত হওয়া অত্যাবশ্যক। এই শক্তির সার্থকতা সর্বাগ্রে প্রমাণিত হয় দাওয়াতের ময়দানে। যারা ইসলামের আকীদা বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে চায়, তাদের গ্রহণের স্বাধীনতাকে কেউ যাতে খর্ব করতে না পারে ও বাধা দিতে না পারে এবং গ্রহণের পরেও যাতে তাদের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালাতে না পারে, ইসলামের হাতে যথেষ্ট শক্তি সামর্থ থাকলে সে এটা নিশ্চিত করতে পারে। শক্তি অর্জনের দ্বিতীয় সার্থকতা হলো, এ দ্বারা সে ইসলামের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর আগ্রাসন চালানোর ধৃষ্টতা রোধ করতে পারে। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্যে তার হাতে যথেষ্ট শক্তি থাকলে শত্রুদের দুঃসাহস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনা। তৃতীয় সার্থকতা হলো, ইসলাম সারা পৃথিবীতে মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার ঘটানোর যে ইচ্ছা পোষণ করে, শত্রুরা তার পথ রোধ করবে না। চতুর্থ সার্থকতা হলো, যে সব শক্তি পৃথিবীর অঞ্চলে অঞ্চলে বা দেশে দেশে একনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজের মনগড়া আইন দিয়ে দেশ শাসন করছে এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যে একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট, তা স্বীকার না করে ওই ক্ষমতা নিজেরা জবরদখল করে খোদা হয়ে বসেছে, সেই সব শক্তিকে ইসলাম নিজের শক্তি দ্বারা চূর্ণ করে দিতে পারবে।

বস্তুত, ইসলাম এমন কোনো ধর্ম নয়, যা কেবল অন্তরে বিশেষ আকীদা বিশ্বাস ও সমাজে একটা নির্দিষ্ট ভাবাবেগের আবহ সৃষ্টি করলেই তার বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়ে যায়। ইসলাম হচ্ছে জীবন যাপনের একটা বাস্তব ও সক্রিয় ব্যবস্থা। অন্যান্য যে সব জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার পেছনে বস্তুগত শক্তি কার্যকর থাকে, সেগুলোর মোকাবেলা করা ও প্রয়োজনে সেগুলোকে ধ্বংস করা তার জন্যে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর বিধানকে প্রতিরোধকারী ওই সব অপশক্তির মোকাবেলা না করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না।

উপরোক্ত বাস্তব সত্যটি দ্বিধাহীন চিত্তে ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা এবং এতে বিন্দুমাত্রও জড়তা ও অস্পষ্টতা প্রকাশ না করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আল্লাহর বিধানে কোনো লজ্জা ও কুণ্ঠাবোধের অবকাশ নেই। প্রত্যেক মুসলমানের ঘোষণা করা উচিত যে, ইসলাম যখন পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হবে, তখন তা মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা এনে দেয়ার জন্যেই বাস্তবায়িত হবে। আর মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতা আনতে তাকে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও একক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং মানুষের প্রভুত্ব উচ্ছেদ করতে হবে। ইসলাম কোনো মানব রচিত বিধান চালু করবে না, কিংবা কোনো নেতা, শাসক, সরকার, রাষ্ট্র, শ্রেণী বা জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করবে না। রোম সাম্রাজ্যে যেমন অভিজাত শ্রেণীর যমীন চাষ করার জন্যে দাস শ্রেণীর লোক সৃষ্টি করা হতো কিংবা আধুনিক পুঁজিবাদী পাশ্চাত্যে যেমন দোকানপাট ও বাজার চালাতে নব্য দাস শ্রেণী পোষা হয়, অথবা কমিউনিজম বা অন্যান্য মানব রচিত ব্যবস্থায় যেমন মানুষের মনগড়া অসম্পূর্ণ মতবাদ চাপিয়ে দেয়া হয়, ইসলাম সে ধরনের শোষণ ও নিপীড়নমূলক কোনো ব্যবস্থা নয়। ইসলাম হচ্ছে মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞানী আল্লাহর রচিত বিধান। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর পৃথিবীতে মানুষের প্রভুত্ব খতম করে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম করার মাধ্যমে মানুষের গোলামী ও দাসত্বের চির অবসান। এই মহাসত্য ও এই আল্লাহর বিধানকে যথাযথভাবে হৃদয়ংগম করা প্রত্যেক মুসলমানের বিশেষত সেই সব মুসলমানের কর্তব্য, যারা ইসলামকে নিয়ে পরাজিত মানসিকতা ও হীনমন্যতায় ভোগে, আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং ইসলামের বিস্তার ও ইসলামী জেহাদ সম্পর্কে ইনিয়ে বিনিয়ে কৈফিয়ত দিতে সচেষ্ট থাকে।(১)

আমাদের শক্তি অর্জনের দায় দায়িত্বের সীমা কতোদূর বিস্তৃত, সেটা আমাদের জানা দরকার। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা যতোদূর পারো শক্তি সঞ্চয় করো।'

এ উক্তি থেকে জানা গেলো যে, আমাদের সাধ্য ও সামর্থের শেষ সীমা পর্যন্তই আমাদের দায়িত্ব বিস্তৃত। কাজেই কোনো মুসলিম জনগোষ্ঠীর এমন কোনো উপকরণ সংগ্রহে বিরত থাকা বৈধ হবে না, যা তার শক্তি সামর্থের আওতাধীন। এই শক্তি অর্জনের প্রথম উদ্দেশ্যটা হলো,

'এ দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেবে। ভীত সন্ত্রস্ত করে দেবে এমন আরো অনেককে, যাদেরকে তোমরা চেন না, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চেনেন।'

অর্থাৎ শক্তি অর্জনের প্রথম উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সেই সব শত্রুকে ভয় দেখানো এবং তাদের মনে ত্রাস সঞ্চার করা, যারা পৃথিবীতে মুসলমানদেরও শত্রু, যাদের একাংশ প্রকাশ্য ও মুসলমানদের পরিচিত, আর অপরাংশ তাদের অচেনা ও অজানা, কিংবা যারা মুসলমানদের কাছে শত্রুতা প্রকাশ করেনি, কিন্তু তাদের আসল পরিচয় আল্লাহ তায়ালা জানেন। ইসলাম তাদের ওপর শক্তি প্রয়োগ না করলেও তার শক্তি তাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করবে। ইসলামের শত্রুরা যাতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দমিত থাকে এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী ও আল্লাহর বাণী সমুন্নত হয়, সে জন্যে

---

(১) এ বিষয়ে বিশদভাবে অবহিত হবার জন্য ওস্তাদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর রচিত পুস্তিকা 'জেহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' দ্রষ্টব্য।

মুসলমানদের শক্তিশালী হওয়া এবং শক্তির যতো বেশী উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব সংগ্রহ করা কর্তব্য।

যেহেতু শক্তি ও সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহের এ কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় এবং ইসলামী ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপরই নির্ভরশীল, তাই জেহাদের আহবানের সাথে সাথেই আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়েরও আহ্বান জানানো হয়েছে,।

'আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছুই ব্যয় করবে, তা তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবেই ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের ওপর কোনোই যুলুম করা হবে না।'

এভাবে ইসলাম আল্লাহর পথে জেহাদ ও অর্থব্যয়কে যাবতীয় দুনিয়াবী স্বার্থ, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য এবং যাবতীয় শ্রেণীগত ও জাতিগত আবেগ অনুভূতির মিশ্রণ থেকে মুক্ত করেছে, যাতে এই জেহাদ ও অর্থ ব্যয় শুধু আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্যে এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য নিবেদিত হয়।

এ কারণেই ইসলাম তার সূচনাকাল থেকেই এমন সব যুদ্ধকে অনৈসলামী যুদ্ধ বলে গণ্য করেছে, যা কোনো ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের গৌরবের জন্যে, সম্পদ ও বাজার লাভের জন্যে, প্রতিপক্ষকে দমন করা ও তার ওপর নিজের প্রতাপ চাপিয়ে দেয়ার জন্যে, কিংবা একটা দেশকে অপর দেশের, একটি জাতিকে অপর জাতির অথবা একটি শ্রেণীকে অপর শ্রেণীর প্রভু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে করা হয়। ইসলাম শুধু সেই যুদ্ধকেই স্বীকৃতি দেয়, যা আল্লাহর পথে করা হয়। আল্লাহ তায়ালা কোনো ব্যক্তি, জাতি, গোষ্ঠী, শ্রেণী বা দেশের আধিপত্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান না। তিনি চান শুধু তাঁর নিজের প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিজগতের কাছে বিন্দুমাত্রও মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাতেই সৃষ্টিজগতের কল্যাণ, স্বাধীনতা ও সম্মান নিহিত রয়েছে।

বিধর্মীদের সাথে সম্পাদিত সাময়িক শান্তিচুক্তি

এ আয়াতগুলোতে তৃতীয় যে বিধিটা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা হলো ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে শান্তি, আপোষ ও সহাবস্থান কামনাকারী এবং নিজেদের কার্যকলাপ ও বাহ্যিক আচার আচরণ দ্বারা শান্তির প্রতি আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশকারীদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের ও মুসলমানদের কী আচরণ করতে হবে, সে সম্পর্কে। (এ বিধিটা ৬১ রয়েছে)

'আর যদি তারা আপোষ ও শান্তির প্রতি আগ্রহী হয়, তাহলে তুমিও শান্তির প্রতি আগ্রহী হও'।

শান্তির প্রতি আগ্রহী হওয়াকে 'জুনুহ' দ্বারা প্রকাশ করা খুবই তাৎপর্যবহ। আরবী ভাষায় 'জুনুহ' শব্দটা থেকে এক ধরনের কোমল সম্প্রীতির ভাব প্রকাশ পায়। এ দ্বারা পাখির ডানা গুটিয়ে শান্তি ও সম্প্রীতির দিকে নেমে যাওয়ার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। আর এই শান্তির প্রতি আগ্রহী হওয়ার সাথে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলও যুক্ত। আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রোতা। তিনি সব কথা শোনেন এবং সকল না বলা গুপ্ত তথ্যও জানেন। বস্তুত আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট।

রসূল (স.) ও মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের পর থেকে বদরের যুদ্ধ ও এই বিধি নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত কাফেরদের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠী রসূল (স.) সম্পর্কে যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলো এবং রসূল (স.) তাদের সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, সেটা ইমাম ইবনুল কাইয়েমের ইতিপূর্বে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণে তুলে ধরা হয়েছে। ওই বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতটা কাফেরদের সেই গোষ্ঠী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা প্রথম থেকেই রসূল (স.)-এর সাথে নিরপেক্ষতা ও অনাক্রমণের নীতি অনুসরণ করেছে। শান্তি ও আপোষের মনোভাব

দেখিয়েছে। ইসলামী দাওয়াতের প্রতি শক্রতা ও প্রতিরোধের মনোভাব দেখায়নি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিও কোনো বৈরী মনোতার প্রকাশ করেনি। আল্লাহ তায়ালা ও রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন এই গোষ্ঠীর প্রতি নিরপেক্ষতা, শান্তি ও আপোষের মনোভাব অবলম্বন করেন। (অবশ্য এটা ছিলো সূরা তাওবা নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্তকার বিধান। যাদের সাথে মুসলমানদের কোনো চুক্তি ছিলো না, অথবা অনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি ছিলো, তাদেরকে ওই সূরায় চার মাস সময় দেয়া হয়। ওই চার মাস পর এই গোষ্ঠীর জন্যে তাদের ভূমিকা ও আচরণ অনুযায়ী নতুন নির্দেশ দেয়া হবে।) সুতরাং এ বিধান চূড়ান্ত নয়। বিশেষত এই সব আনুষংগিক অবস্থা, তৎকালীন অন্যান্য আয়াতের বক্তব্য এবং তার পরবর্তী সময়ে রসূল (স.) যে সব আচরণ করেছেন, সে সবের সাথে এ বিধান সম্পর্কযুক্ত। তবে এ আয়াতের বর্ণিত বিধান তৎকালে অনেকটা শর্তহীনভাবেই প্রতিপালিত হতো। সূরা তাওবা নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রসূল (স.) এ বিধান কার্যকরীও করেছেন। ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধিও তিনি এই বিধানের আলোকে সম্পাদন করেছেন।

কোনো কোনো ফেকাহ শাস্ত্রকার এই বিধানকে চূড়ান্ত ও স্থায়ী বলে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। তারা আপোষ ও শান্তির প্রতি আগ্রহী হওয়ার ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, তাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করতে হবে। তবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাথে এ ব্যাখ্যা সামাঞ্জস্যশীল নয়। কেননা জিযিয়ার বিধান নাযিল হয়েছে অষ্টম হিজরীতে সূরা তাওবায়। আর এ আয়াত নাযিল হয়েছে ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পর। সে সময় জিযিয়ার কোনো বিধান ছিলো না। আয়াত নাযিলের ইতিহাস, ইসলামী বিধানের আন্দোলনী চরিত্র ও তৎকালীন ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে এ মতটাই সঠিক বলে মনে হয় যে, এ বিধান চূড়ান্ত ও সর্বশেষ বিধান নয়। এ বিধান পরবর্তীকালে সূরা তাওবার বিধান দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে। সূরা তাওবা মানুষকে তিন শ্রেণীর যে কোনো একটিতে অন্তর্ভুক্ত হবার বিধান দিয়েছে। হয় সে যুদ্ধরত হবে, অথবা মুসলমান হবে এবং আল্লাহর শরীয়ত অনুসারে কাজ করবে। নচেত জিযিয়া দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তিবদ্ধ নাগরিকে পরিণত হবে। এগুলো হচ্ছে ইসলামের জেহাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত বিধান। এ ছাড়া আর সবই ছিলো অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং ইসলাম সে সবকে পরিবর্তিত করে এই তিন অবস্থার মধ্যে সীমিত করে ফেলেছে। এই তিন অবস্থাকে সহীহ মুসলিম ও মোসনাদে আহমাদের একটা হাদীসে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

'ইয়ায়ীদ ইবনে খতীব আল আসলামী বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.) যখনই কাউকে কোনো সেনাবাহিনীর অধিনায়ক করে পাঠাতেন, তাকে আল্লাহর ভয় করা ও সহযাত্রী মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজ করার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, আল্লাহর নামে ও আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে এবং শুধুমাত্র যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি কুফরী করে তার সাথে যুদ্ধ করবে। যখন মোশরেক শক্রদের সম্মুখীন হবে, তখন প্রথমে তাদেরকে তিনটি জিনিসের মধ্য থেকে যে কোনো একটাকে গ্রহণের দাওয়াত দেবে। এর যেটাই তারা গ্রহণ করবে, তা মেনে নিও এবং তাদের ব্যাপারে অস্ত্র সংবরণ করো। প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দিও। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তা মেনে নিও এবং তাদের ব্যাপারে অস্ত্র সংবরণ করো। তারপর তাদেরকে বলো তারা যেন তাদের বর্তমান বাসস্থান থেকে হিজরত করে মোহাজেরদের আবাসভূমিতে চলে আসে। তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, তারা হিজরত করলে তাদেরকে মোহাজেরদের সমান অধিকার দেয়া হবে। কিন্তু তারা যদি হিজরত করতে অস্বীকার করে এবং নিজেদের বর্তমান আবাসভূমিতে থাকতে চায়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, তাদের সাথে বেদুঈন মুসলমানদের মতো আচরণ করা হবে।

অন্যান্য মোমেনদের ন্যায় তাদের ওপরও আল্লাহর বিধান বলবৎ হবে। তবে 'গনীমত' ও 'ফায়ী' থেকে তারা কোনো অংশ পাবে না। (যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে গনীমত ও বিনা যুদ্ধে বিজিত স্থানের সম্পদকে 'ফায়ী' বলা হয়।) তবে মুসলমানদের সাথে জেহাদে অংশ গ্রহণ করলেই তারা এ অংশ পাবে। ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে জিযিয়া দেয়ার আহবান জানিও। এ আহবান গ্রহণ করলে তা মেনে নিও এবং তাদের সাথে লড়াই করো না। কিন্তু যদি জিযিয়াও দিতে না চায়, তা হলে আল্লাহর সাহায্য চাইবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।'

এই হাদীসে জিযিয়ার সাথে হিজরত ও মোহাজেরদের আবাসভূমির উল্লেখ কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। কেননা মক্কা বিজয়ের পরে ছাড়া জিযিয়া আরোপিত হয়নি। আর মক্কা বিজয়ের পর মক্কা থেকে হিজরতের প্রশ্ন ওঠে না। (কেননা তৎকালীন মুসলমানরা ইসলামের আবাসভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো।) এও সুবিদিত যে, অষ্টম হিজরীর পরে ছাড়া জিযিয়া চালু হয়নি। তাই আরবের মোশরেকদের জিযিয়া দিতে হয়নি। কেননা তারা জিযিয়া প্রবর্তনের আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। পরবর্তীতে অগ্নি-উপাসকদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। জিযিয়ার বিধান নাযিল হওয়ার সময় যদি আরবে মোশরেক অবশিষ্ট থাকতো, তবে তাদের কাছ থেকে জিযিয়া নেয়া হতো। ইমাম ইবনুল কাইয়েমের মতে এটা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আহমদের অভিমত। (কুরতুবীর মতে, এটা ইমাম আওযায়ী ও ইমাম মালেকের অভিমত। অন্যদের মতে, এটা ইমাম আবু হানীফারও অভিমত।)

মোদ্দা কথা এই যে, ৬১নং আয়াতের বিধি চূড়ান্ত ও সর্বশেষ বিধি নয়। এ বিষয়ে সূরা তাওবার বিধানই চূড়ান্ত। আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কে শুধু সেই গোষ্ঠীর সন্ধি ও শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন, যারা তাঁর সাথে শান্তি, সহাবস্থান ও অনাক্রমণের নীতি অনুসরণ করেছে, চাই তাঁর সাথে এখনো পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি করুক বা না করুক। সূরা তাওবা নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মোশরেক ও ইহুদী খৃষ্টানদের কাছ থেকে সন্ধি ও আপোষ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ অথবা জিযিয়া প্রদান ছাড়া আর কোনো বিকল্প গ্রহণ করতেন না। যতোক্ষণ তারা চুক্তি মেনে চলতো, ততোক্ষণ তিনিও মেনে চলতেন। অন্যথায় মুসলমানদের শক্তি সামর্থে কুলালে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে ইসলাম পুরোপুরিভাবে বিজয়ী হয়।

এই আলোচনায় আমি কোনো কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করেছি এই উদ্দেশ্যে, যেন মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হীনমন্যতা থেকে সৃষ্ট সন্দেহের নিরসন ঘটে। ইসলামের জেহাদ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অনেকে এই হীনমন্যতায় ভুগে থাকে। চলমান অবস্থা তাদের মন মগয ও বিবেক বুদ্ধির ওপর প্রবল চাপের সৃষ্টি করে। তারা নিজেদের ধর্ম ইসলামকে ভালোভাবে জানে না। তাই সমগ্র মানব জাতিকে ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া দান অথবা যুদ্ধ এই তিনটির যে কোনো একটা গ্রহণের জন্যে চরমপত্র দেয়া ইসলামের স্থায়ী কর্মসূচী হোক- এটা তাদের কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয়। কেননা তারা দেখতে পায় একদিকে জাহেলী শক্তিগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধরত, অপরদিকে মুসলমানরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মোকাবেলায় দুর্বল। অনুরূপভাবে মুসলিম জাতির মধ্যে হকপন্থী দলের সংখ্যা খুবই কম। পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারেই নেই। এ সব দেখেই ওই সব লেখক বুদ্ধিজীবী কোরআনের আয়াতগুলোর এমন বিকৃত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে, যাতে চলমান পরিস্থিতির সাথে তাকে খাপ খাইয়ে নেয়া যায়। এই পরিস্থিতিতেই তারা ওই কর্মসূচীটাকে ইসলামের জন্য মাত্রাতিরিক্ত মনে করে।

একারণেই তারা অস্থায়ী বিধান সম্বলিত আয়াতগুলোকে স্থায়ী বিধি সম্বলিত আয়াত বলে প্রমাণ করতে চায়। তারা শর্তযুক্ত বিধান সম্বলিত আয়াতগুলোকে শর্তহীন বিধান মনে করে।

এভাবে যখন চূড়ান্ত বিধি সম্বলিত আয়াতগুলোতে উপনীত হয়, তখন সেগুলোকে অস্থায়ী ও শর্তযুক্ত আয়াত অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে। এসব কিছুর মাধ্যমে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ইসলামের জেহাদ কেবল মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক ও দেশরক্ষামূলক ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা শুধু আক্রান্ত হলেই প্রযোজ্য– তার আগে নয়। তারা মনে করে যে, ইসলাম যে কোনো শান্তি প্রস্তাব গ্রহণে উদগ্রীব। তারা ইসলামী রাষ্ট্রকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতিকেই শান্তি প্রস্তাব বলে মনে করে। তাদের ধারণা অনুসারে, ইসলামের উচিত শামুক ও ঝিনুকের মতো নিজের সীমার মধ্যে সংকুচিত হয়ে থাকা। তাকে গ্রহণ করার জন্যে অন্যদেরকে দাওয়াত দেয়া কিংবা আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করার জন্যে অন্যদেরকে আহবান জানানো অনুচিত। অবশ্য কোনো বক্তৃতা, বিবৃতি বা সম্প্রচার দ্বারা উপদেশ দেয়া যেতে পারে। বস্তুগত ও অর্থনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করে মানুষের ওপর বাতিল শক্তি যে আধিপত্য ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তাতে বাধা দেয়ার কোনো অধিকার ইসলামের নেই। তবে বাতিল শক্তি যদি তার ওপর আগ্রাসন চালায়, তাহলেই কেবল সে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নিতে পারে।

এসব লোক প্রতিষ্ঠিত বাতিল শক্তির চাপের মুখে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে পরাভূত। এরা যদি ইসলামের বিধিসমূহ বিকৃত না করে চলমান পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারে এমন বিধিমালা ইসলামে অন্বেষণ করতো, তাহলে অবশ্যই তা পেতো। ইসলামে চলমান বাস্তব সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। সে ব্যবস্থা দেখে তারা বলতে পারতো যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে ইসলাম এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। তবে এটা স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। এ হচ্ছে প্রয়োজনের তাগিদে গৃহীত সাময়িক ব্যবস্থা ও বিধিমালা।

সাময়িক প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ইসলামের এ ধরনের অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের অনেক নযীর রয়েছে। এর কয়েকটা নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো,

ক. রসূল (স.) মদীনায় হিজরত করার অব্যবহিত পর মদীনার আশপাশের ইহুদী ও মোশরেকদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সম্মিলিতভাবে মদীনাকে রক্ষা করার ব্যাপারে একটা চুক্তি সম্পাদন করেন। ওই চুক্তিতে রসূল (স.)-এর কর্তৃত্বকে মদীনার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব বলে স্বীকার করা হয়। ইহুদীরা এ অংগীকারও করে যে, কোরায়শদের আক্রমণ থেকে মদীনাকে রক্ষা করার জন্যে রসূল (স.)-এর সাথে একত্রে লড়াই করবে। মদীনার ওপর যে কেউ আক্রমণ করুক তাকে সাহায্য ও সমর্থন করবে না এবং রসূলের অনুমতি ছাড়া যুদ্ধরত মোশরেকদের সাথে কোনো মৈত্রী স্থাপন করবে না। সেই সাথে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এ আদেশও দেন যে, যারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আগ্রহী, তাদের প্রতি তিনিও যেন মনোযোগী হন। কিন্তু পরবর্তীকালে এসবই পাল্টে যায়।

খ. খন্দক যুদ্ধের সময় যখন মোশরেকরা মদীনার ওপর আক্রমণ চালালো এবং বনু কোরায়যা চুক্তি ভংগ করলো, তখন রসূল (স.) মুসলমানদের জীবন নিয়ে শংকিত হয়ে পড়লেন। তিনি উয়াইনা বিন হিসন আল ফিযারী এবং গীতফান গোত্রের নেতা হারেস বিন আওফ আল মারীকে মদীনার কৃষি ফসলের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে তাদের গোত্রকে নিয়ে কেটে পড়তে অনুরোধ করলেন, যাতে কোরায়শরা একাকী হয়ে যায় এবং মুসলমানদের পক্ষে তাদের মোকাবেলা করা সহজ হয়ে যায়। রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে এই অনুরোধটা ছিলো নিছক তাদের মনোভাব যাচাইয়ের চেষ্টা। এটা কোনো চুক্তি ছিলো না। গীতফান নেতৃদ্বয় যখন সম্মত হয়ে গেলো, তখন রসূল (স.) সা'দ বিন মোয়ায (রা.) ও সা'দ বিন ওবাদা (রা.) এর সাথে পরামর্শ করলেন এবং তাদের মতামত জানতে চাইলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, এটা কি আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ, যা আমরা আপনার জন্যে বাস্তবায়িত করবো, না আল্লাহর নির্দেশ, যা শুধু আমাদের শুনতে ও

কার্যকরী করতে হবে, না আপনার ব্যক্তিগত অভিমত? রসূল (স.) বললেন, 'ওটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত। কেননা সমগ্র আরব জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে।' সা'দ বিন মোয়ায তাঁকে বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, আমরাও এক সময় এই সব গোত্রের সাথে শেরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিলাম। আল্লাহর এবাদাতও করতাম না এবং আল্লাহকে চিনতামও না। কিন্তু সেকালেও তারা কখনো খরিদ অথবা আতিথেয়তার সূত্রে ছাড়া আমাদের কাছ থেকে শস্যের একটি দানাও পাওয়ার আশা করতে পারেনি। আজ যখন আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন, ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছেন, আপনাকে দিয়ে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন, তখন কি আমরা তাদেরকে আমাদের ধন সম্পদ দিয়ে দেবো? আল্লাহর কসম, আমরা তাদেরকে তরবারি ছাড়া আর কিছু দেবো না, যতোক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমাদের ও তাদের দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি না করেন। এ কথা শুনে রসূল (স.) খুশী হলেন। তিনি বললেন, 'বেশ, এটাই তাহলে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত।' তারপর তিনি গীতফান নেতৃদ্বয়– উয়াইনা ও হারেসকে বললেন, 'তোমরা যেতে পারো। তোমাদের জন্যে আমাদের কাছে তরবারি ছাড়া আর কিছু নেই।' সুতরাং এটাও একটা সাময়িক প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা ছিলো, চূড়ান্ত ও স্থায়ী কোনো নির্দেশ ছিলো না।

গ. রসূল (স.) কোরায়শদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধি করেছিলেন। তখনো তারা তাদের পৌত্তলিক ধর্মে বহাল। এই সন্ধির শর্তাবলীতে মুসলমানরা অস্বস্তি বোধ করেছিলো। এই চুক্তিতে মুসলমানদের ও মোশরেকদের মধ্যে দশ বছরের জন্যে যুদ্ধ বন্ধ, পরস্পরের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তার গ্যারান্টি এবং মুসলমানদের ওই বছরের জন্যে মদীনায় ফিরে যাওয়ার শর্ত ছিলো। এতে আরো ছিলো, পরবর্তী বছর তিনি মক্কায় আসবেন। তখন মোশরেকরা তাঁর প্রবেশ পথ থেকে সরে দাঁড়াবে। মক্কায় তারা তিন দিন অবস্থান করবেন। তিনি কেবল ঘোড়সওয়ার সাথীদেরকে নিয়ে আসবেন এবং তাদের তরবারি থাকবে কোষবদ্ধ। মুসলমানদের কেউ মোশরেকদের কাছে ফিরে গেলে তারা তাকে ফেরত দেবে না, কিন্তু মোশরেকদের কোনো লোক মুসলমানদের কাছে গেলে তাকে ফেরত দিতে হবে। আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে রসূল (স.) এই সব শর্ত মেনে নেন। বাহ্যত, এই শর্তগুলো মুসলমানদের স্বার্থের প্রতিকূল ছিলো। কিন্তু এর পেছনে আল্লাহর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিলো, যা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছিলো। একই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে এ শর্তাবলীতে যথেষ্ট প্রশস্ততা রয়েছে এবং এতে মুসলিম নেতৃত্বের স্বাধীনভাবে বিচার বিবেচনা করার অবকাশও রয়েছে।

মুসলমানদের পারস্পরিক বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববোধ

ইসলাম একটা বাস্তব জীবন বিধান। এটা একটা প্রগতিশীল, উদার, স্পষ্ট ও অটল জীবন ব্যবস্থা। যারা সর্বাবস্থায় ইসলামের বাস্তব দিকগুলো অনুসরণ করে, তাদের কখনো ওহীর বাণীগুলো অপব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। আসল প্রয়োজন হলো আল্লাহভীতির, আল্লাহর দ্বীনকে জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার অনুগত করা থেকে বিরত থাকার, জাহেলী সমাজ ব্যবস্থাকে পরাভূত করার এবং বাতিলের আগ্রাসন থেকে ইসলামকে রক্ষা করার। ইসলাম অন্য সকল মতবাদ, মতাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী ও পরাক্রান্ত। এই পরাক্রান্ত অবস্থান থেকেই সে সকল বাস্তব দাবী ও প্রয়োজন পূরণ করে।

যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে আপোষকামীদের আপোষ প্রস্তাব ও শান্তিকামীদের শান্তি প্রস্তাব মেনে নেয়ার আদেশ দিয়েছেন, তখন একই সাথে তাঁকে আল্লাহর ওপর ভরসা করারও আদেশ দিয়েছেন। আর তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে, দৃশ্যত যারা আপোষ ও শান্তির প্রস্তাব নিয়ে

এগিয়ে আসছে, তাদের মনে গোপন ইচ্ছা যাই থাক না কেন, সেটা আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে আসবে। ৬১ আয়াতের শেষ অংশে এই আশ্বাস লক্ষণীয়।

এরপর ৬২ নং আয়াতে তাদেরকে কাফেরদের সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকতা, চক্রান্ত ও প্রতারণা থেকে নিরাপত্তা দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আল্লাহ তায়ালাই তোমার জন্যে যথেষ্ট, তিনিই তোমার রক্ষক। তিনিই তোমাকে বদরের যুদ্ধে নিজের প্রত্যক্ষ সাহায্য দ্বারা জয়ী করেছেন। মোমেনদের দ্বারাও তোমাকে সাহায্য করিয়েছেন এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধনে তাদের মনকে আবদ্ধ করেছেন। অথচ তারা পারস্পরিক ভালোবাসায় অভ্যস্ত ছিলো না। তারা ছিলো একে অপরের বিরোধী। মহাশক্তিধর ও মহাকুশলী আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ তাদেরকে এই প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারতো না।

'যদি তারা তোমাকে ধোকা দিতে চায় ...... (আয়াত-৬২-৬৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাই তোমার জন্যে যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে প্রথমবার সাহায্য করেছেন। তিনি সেই সব মোমেনকে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছেন, যারা আল্লাহর সাথে করা অংগীকার পূরণ করেছে এবং তাদেরকে দিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তুলেছেন। অথচ ইতিপূর্বে তাদের মন ছিলো পরস্পর থেকে বিক্ষিপ্ত। তাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও সংঘাত ছিলো প্রকাশ্য ও ভয়ংকর। এ দ্বারা আওস ও খাযরাজ নামক আনসার গোত্রদ্বয়কে ও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। কেননা জাহেলী যুগে তাদের মধ্যে এতো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছিলো যে, সেগুলোর প্রতিশোধস্পৃহায় তারা পরস্পরের প্রতি ছিলো চরম ক্ষিপ্ত। সে হিসাবে তাদের সহাবস্থানই ছিলো অকল্পনীয়। অথচ ইসলাম তাদেরকে এমন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করলো, যার কোনো নযীর বিশ্ব ইতিহাসে দেখা যায়নি। এ দ্বারা মোহাজেরদেরকেও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। কেননা জাহেলী যুগে তাদের অবস্থাও ছিলো আনসারদের মতো। হয়তো বা এই উভয় গোষ্ঠীকেই বুঝানো হয়েছে। বলতে গেলে গোটা আরব উপদ্বীপের অবস্থাই ছিলো এরূপ।

এই অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ ঘটাতে পারতো না। এ ঘটনা শুধু ইসলামী আকীদা ও আদর্শের কল্যাণেই হতে পেরেছিলো। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হৃদয়গুলো এবং উচ্ছৃংখল ও নৈরাজ্যবাদী মানুষগুলো হয়ে গেলো পরস্পরের ভাই, পরস্পরের পরম মিত্র ও বন্ধু। সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের এই মান ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায়নি। এ সমাজটা বেহেশতের নমুনায় পরিণত হয়েছিলো, অথচ বলা যেতে পারে, বেহেশতের জীবন ও তার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের লীলাভূমির রূপ ধারণ করেছিলো। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আমি তাদের মনের যাবতীয় বিদ্বেষ দূর করে দেবো এবং তারা মুখোমুখি আসনে ভাইয়ের মতো বসে থাকবে।'

ইসলামী আদর্শ সত্যিই বিস্ময়কর। এ আদর্শ যখন হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তখন তা স্নেহ মমতা ও ভালোবাসার এমন এক মেযাজ ও স্বভাব গড়ে তোলে, যা গোটা পরিবেশকে প্রীতি ও মমত্বের জোয়ারে ভাসিয়ে দেয়। ফলে মোমেনের চোখের দৃষ্টি, হাতের পরশ, জিহবার কথা, হৃদয়ের স্পন্দন মাত্রেই পারস্পরিক সহানুভূতি, সম্প্রীতি, সহযোগিতা, উদারতা ও মহানুভবতায় সিক্ত হয়। যিনি মোমেনদের হৃদয়ের মধ্যে এই পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভাবধারা সৃষ্টি করেছেন, তিনি ছাড়া আর কেউ এর প্রকৃত রহস্য জানে না এবং এই হৃদয়গুলো ছাড়া আর কেউ তাদের অভিরুচি সম্পর্কে অবগত নয়।

এ আদর্শ আল্লাহকে ভালোবাসার জন্যে মানবজাতিকে আহ্বান জানায় এবং তাকে পরম আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার শিক্ষা দেয়। মানব জাতি যখন এ আহবানে সাড়া দেয়, তখন এই অলৌকিক ঘটনা ঘটতে বাধ্য, যার রহস্য আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না এবং যার ওপর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই।

রসূল (স.) বলেন, 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা নবীও নয়, শহীদও নয়, অথচ কেয়ামতের দিন তারা আল্লাহর এতো ঘনিষ্ঠ থাকবে যে, তা দেখে নবীরা ও শহীদরা বিস্মিত হয়ে যাবেন। সাহাবীরা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাদেরকে জানাবেন কি ওরা কারা। রসূল (স.) বললেন, যারা নিজেদের মধ্যে আল্লাহর দয়া ও করুণার কল্যাণে পরস্পরকে ভালোবাসবে। অথচ তাদের মধ্যে কোনো রক্তের সম্পর্ক বা আর্থিক লেনদেনের সম্পর্ক থাকে না। আল্লাহর কসম, তাদের চেহারাগুলো আল্লাহর নূরে আলোকিত হবে এবং তারা নূরের ওপরই অধিষ্ঠিত থাকবে। যখন সব মানুষ ভীত থাকবে, তখন তারা ভয় পাবে না এবং সব মানুষ যখন উদ্বিগ্ন থাকবে তখন তারা উদ্বিগ্ন হবে না।' (আবু দাউদ)

রসূল (স.) আরো বলেন, একজন মুসলমান যখন আরেকজন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত করে এবং একজন অপরজনের হাত ধরে, তখন গাছের শুকনো পাতা যেভাবে ঝরে যায়, তেমনি তাদের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাদের গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনারাশির মতোও হয়, তাহলে তাও মাফ হয়ে যায়।' (তাবরানী)

এ সম্পর্কে আরো বহু হাদীস রয়েছে। রসূল (স.)-এর ব্যক্তিগত জীবন থেকেও এর অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। আর তিনি যে উম্মতকে স্নেহ প্রীতি ও ভালোবাসার ভিত্তিতে গঠন করে গেছেন, তাদের সাক্ষ্য থেকেও জানা যায় যে, এগুলো শুধু আবেগদীপ্ত কথাবার্তাই ছিলো না কিংবা শুধু ব্যক্তিগত আদর্শ কার্যকলাপই ছিলো না, বরং ওটা ছিলো এমন একটা উন্নত মহৎ সমাজ ব্যবস্থা, যা এই ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে আল্লাহরই ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ এভাবে পারস্পরিক সম্প্রীতি গড়ে তুলতে পারে না।

মোমেনদের প্রতি আল্লাহর অভিভাবকত্বের আশ্বাস

পরবর্তী আয়াতে রসূল (স.) ও মুসলমানদেরকে আল্লাহর অভিভাবকত্ব ও বন্ধুত্বের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। তারপর তাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন তিনি মোমেনদেরকে আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। সেই সাথে এই বলে উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, তারা তাদের দশগুণ কাফেরের সমান। আর যদি তারা দুর্বলও হয়, তবুও তারা অন্তত দ্বিগুণের সমান। (আয়াত ৬৩, ৬৪ ও ৬৫)

মহান আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য শক্তির সামনে আল্লাহর সৈনিকদের গতি রোধ করতে সচেষ্ট কাফেরদের শক্তি যে কতো ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, উভয় বাহিনীর মধ্যে ব্যবধান যে কতো বেশী এবং এই উভয় শক্তির সংঘর্ষের ফল যে মোমেনদের বিজয়, এই সব কটা কথাই ৬৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

'হে নবী, আল্লাহ ও তোমার অনুসারী মোমেনরাই তোমার জন্যে যথেষ্ট।'

এ জন্যই পরবর্তী আয়াতে মোমেনদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা ইতিমধ্যেই তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাদের বিশ্বাস দৃঢ় করা হয়েছে।

'হে নবী, মোমেনদেরকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করো।'

অর্থাৎ যদিও তাদের সংখ্যা তাদের শত্রুদের তুলনায় কম, তথাপি যেহেতু তারা আল্লাহ তায়ালা ও তাদের শত্রুদের জন্য যথেষ্ট, তাই তাদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো।

'তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল প্রস্তুত হলে তারা দুশো ব্যক্তির ওপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মধ্যে একশো প্রস্তুত হলে তারা কাফেরদের এক হাজারের ওপর বিজয়ী হবে।'

এই ব্যবধানের যে কারণটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা বিস্ময়কর হলেও সত্য।

'কেননা তারা অবুঝ জাতি।'

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, বিজয়ের সাথে বুঝার সম্পর্কটা কী? আসলে অত্যন্ত গভীর ও বাস্তব সম্পর্ক রয়েছে। মোমেনদের বৈশিষ্ট্যই এই যে, তারা তাদের পথ, গন্তব্য ও তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য জানে ও বোঝে। তারা দাসত্ব ও প্রভুত্বের হাকীকত কী, তাও জানে। তারা বোঝে যে, প্রভুত্ব ও খোদায়ী সবার উর্ধে অবস্থান করে এবং তাঁর স্বাতন্ত্র শিরোধার্য। আর দাসত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিবেদিত হওয়া চাই। তারা বোঝে যে, একমাত্র মুসলিম উম্মাহরই দায়িত্ব হলো, মানব জাতিকে আল্লাহর বান্দাদের দাসত্বের পরিবর্তে আল্লাহর দাসত্ব করতে উদ্বুদ্ধ করা। তারা এও জানে যে, মুসলিম উম্মাহই পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সেটা শুধু তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা ও নিজের আরাম আয়েশের জন্যে নয়, বরং আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা, আল্লাহর পথে জেহাদ করা, পৃথিবীকে ন্যায় ও সত্যের লীলাভূমিরূপে গড়ে তোলা, ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায় বিচারকারী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। এ বুঝটা মোমেনদের মনে ঈমানের আলো, বিশ্বাস, শক্তি ও প্রত্যয় এনে দেয়। আল্লাহর পথে প্রবল শক্তি সামর্থ, পরিণতি সম্পর্কে আস্থা ও গুনিতক হারে শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশ্বাস এনে দেয়। কিন্তু শত্রুরা এসব জানেও না, বোঝেও না। তাদের মন রুদ্ধ, দৃষ্টি বিকৃত এবং শক্তি কম। তা তারা বাহ্যত যতোই বৃহৎ শক্তি মনে হোক না কেন। কেননা তারা শক্তির আসল উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন।

এক ও দশের এই অনুপাত হলো, বুদ্ধিমান মোমেনদের ও নির্বোধ কাফেরদের মাঝে শক্তির তারতম্যের প্রকৃত অনুপাত। এমনকি ধৈর্যশীল মুসলমানদের দুর্বলতম ঈমানী অবস্থায়ও শক্তির অনুপাত এক ও দুই।

'এখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বোঝা লাঘব করেছেন ....' (আয়াত ৬৬)

কোনো কোনো তাফসীরকার ও ফকীহ মনে করেন যে, এ আয়াতগুলোতে মোমেনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা সবল ঈমান থাকা অবস্থায় এক ও দশের অনুপাতের ভেতরে এবং দুর্বল ঈমান থাকাকালে এক ও দুইয়ের অনুপাতের ভেতরে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে পারবে না। এ ব্যাপারে অল্পবিস্তর ছোটো খাটো মতভেদ রয়েছে। আমরা সে ব্যাপারে কোনো বক্তব্য রাখতে চাই না। আমার মতে, সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ মত এই যে, এ আয়াতগুলোতে কোনো আইনগত বিধি নয়, বরং শত্রুর মোকাবেলা করার সময়ে মোমেনদের শক্তির মূল্যায়নের ব্যাপারে একটা তথ্যই শুধু বর্ণনা করা হয়েছে, যা আল্লাহর সত্যের মাপকাঠিতে নির্ণীত হয়েছে। এতে মোমেনদেরকে সেই তথ্যটি জানানো হয়েছে মাত্র, যাতে তাদের মন আশ্বস্ত হয় ও মনোবল বাড়ে। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

যুদ্ধ বন্দী ও তাদের মুক্তিপণ প্রসংগ

লড়াইতে উদ্বুদ্ধ করার নির্দেশের পর বন্দী সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এ বর্ণনা এসেছে বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে রসূল (স.) ও সাহাবীদের পদক্ষেপ প্রসংগে। এখানে এই সব বন্দী সম্পর্কে বক্তব্য রয়েছে। সেই সাথে তাদেরকে ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করার আদেশ দিয়ে তাদের ক্ষয়ক্ষতি কিভাবে পূরণ হতে পারে তা বুঝিয়ে বলার আহবান জানানো হয়েছে।

'কোনো নবীর জন্যে এটা শোভনীয় নয় যে, তার হাতে বন্দী থাকবে?' .... (আয়াত ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০ ও ৭১)

বদর যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনে ইসহাক বলেন, যুদ্ধ শেষ হলেও এখনো ভয় কাটেনি। রসূল (স.) তখনো তাঁর কক্ষে।

হযরত সা'দের নেতৃত্বে একদল আনসার তাঁকে পাহারা দিচ্ছে, পাছে কাফেররা পাল্টা আক্রমণ না করে বসে। প্রহরীদের হাতে উম্মুক্ত তরবারি। এ সময় রসূল (স.) সা'দের মুখমন্ডলে

অসন্তোষের চিহ্ন লক্ষ্য করলেন। মুসলমানরা বন্দী জড় করছে দেখে তিনি অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন। রসূল (স.) সাদকে বললেন, ' সাদ আমার মনে হচ্ছে, লোকদের কার্যকলাপ দেখে তুমি অসন্তুষ্ট।'

সাদ বললেন, 'আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল, সত্যিই তাই। মোশরেকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই প্রথম বিজয় দিলেন। আমার কাছে শত্রুদেরকে বন্দী করার চাইতে নিধন করাই শ্রেয় ছিলো।

ইমাম আহমদের বর্ণনামতে হযরত ওমর (রা.) বললেন, বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ তায়ালা মোশরেকদেরকে পরাভূত করে দিলেন। তাদের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হলো। রসূল (স.), আবু বকর (রা.), ওমর (রা.) ও আলী (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করলেন। আবু বকর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এরা সবাই আমাদেরই ভাই ব্রাদার ও আত্মীয়স্বজন। আমার মতে ওদের কাছ থেকে পণ নেয়া হোক। এই পণ নেয়াতে কাফেরদের ওপর আমাদের শক্তি বাড়বে। এমনও হতে পারে যে, এই বন্দীদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়াত করবেন এবং তারা আমাদের শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে। 'রসূল (স.) বললেন, 'তুমি কি মনে করো ওমর?' ওমর বলেন, আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম, আমি আবু বকরের মতের সাথে একমত নই। আমার মতে, আপনি আমাকে আমার অমুক আত্মীয়কে হত্যা করতে অনুমতি দেবেন, আলীকে অনুমতি দেবেন আকীলকে হত্যা করতে, হামযাকে অনুমতি দেবেন অমুককে হত্যা করতে। এতে আল্লাহ তায়ালা জানবেন যে, আমাদের মনে মোশরেকদের প্রতি কোনো সহানুভূতি নেই। এরা মোশরেকদের প্রধান প্রধান নেতা। রসূল (স.) আবু বকরের মতে সম্মতি দিলেন, আমার মতে সম্মতি দিলেন না। তাদের কাছ থেকে পণ নিলেন। ওমর (রা.) বলেন, পর দিন সকালে আমি রসূল (স.)-এর কাছে গেলাম। দেখলাম, রসূল (স.) ও আবু বকর দুজনেই কাঁদছেন। আমি বললাম, 'আপনি ও আপনার সাথী কেন কাঁদছেন? কাঁদার কারণ জানলে আমার যদি কান্না পায়, তবে আমিও কাঁদবো। নচেত আপনাদের কান্নার অনুসরণে কৃত্রিমভাবে কাঁদবো। রসূল (স.) বললেন, 'তোমার সাথীরা বন্দীদের কাছ থেকে পণ নিতে রাযী হওয়ার কারণে এই গাছটার চেয়েও কাছে তোমাদের আযাব আমাকে দেখানো হয়েছে। অতপর আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন,

'কোনো নবীর পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তার কাছে যুদ্ধবন্দী থাকবে যতক্ষণনা.........।' (আয়াত ৬৭, ৬৯)

ইমাম আহমদের অপর বর্ণনা অনুসারে হযরত আনাস বলেন, রসূল (স.) বদর যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা আজ ওদেরকে তোমাদের মুঠোর মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন।' ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল, ওদেরকে হত্যা করা হোক। রসূল (স.) তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'হে লোক সকল, আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের করুণার পাত্র বানিয়ে দিয়েছেন। আসলে তারা কাল পর্যন্তও তোমাদের ভাই ছিলো। ওমর (রা.) আবারো দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল, ওদেরকে হত্যা করা হোক। রসূল (স.) আবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং আগে যা বলেছেন তার পুনরাবৃত্তি করলো। এবার আবু বকর (রা.) উঠলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার মতে ওদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ক্ষমা করা হোক।' এ কথা শোনার পর রসূল (স.)-এর মুখ থেকে উদ্বেগের চিহ্ন দূর হলো। তিনি তাদেরকে মাফ করলেন এবং মুক্তিপণ গ্রহণ করলেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, ৬৮ নং আয়াত,

'যদি ইতিপূর্বে একটা বিধি না আসতো, ...।'

আমাশের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বদর যুদ্ধের পর রসূল (স.) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন 'বন্দীদের সম্পর্কে তোমাদের মত কী?'

আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রসূল, ওরা তো আপনারই জ্ঞাতিগোষ্ঠীর লোকজন। ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং তাওবা করান, হয়তো আল্লাহ তায়ালা ওদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। ওমর বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল, ওরা আপনাকে অস্বীকার করেছে ও বিতাড়িত করেছে। ওদের গর্দান মেরে দিন।' 'আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা বললেন, আপনি এখন যে জায়গায় আছেন, এখানে বহু কাষ্ঠ আছে। এখানকার মাঠটায় আগুন জ্বালিয়ে ওদেরকে তার মধ্যে ফেলে দিন। রসূল (স.) নীরব হয়ে গেলেন। কোনো জবাব দিলেন না। তারপর তিনি নিজ কক্ষে প্রবেশ করলেন। এরপর কেউ কেউ বলতে লাগলো, 'রসূল (স.) আবু বকরের মতটাই গ্রহণ করবেন। কতকে বললো, 'ওমরের কথাই তিনি গ্রহণ করবেন। আবার কেউ কেউ বললো, উনি আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহার পরামর্শ গ্রহণ করবেন। এবার রসূল (স.) বেরিয়ে এসে বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা কিছু লোকের মন নরম করতে করতে দুধের চেয়েও নরম করে দেন। আর কিছু লোকের মন শক্ত করতে করতে পাথরের চেয়েও শক্ত করে দেন। হে আবু বকর, তোমার উদাহরণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো। তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে, সেতো আমার লোক। আর যে আমার অবাধ্য হবে, তার সম্পর্কে আপনি দয়াশীল ও ক্ষমাশীল আপনার ইচ্ছামতোই তাদের বিষয় ফয়সালা করবেন। তোমার উদাহরণ হযরত ঈসার মতও বটে। তিনি বলেছিলেন, 'আপনি যদি ওদেরকে শাস্তি দেন, তবে ওরা তো আপনার বান্দা। আর যদি ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী ও প্রাজ্ঞ।' আর ওহে ওমর, তোমার উদাহরণ মূসা (আ.)-এর মতো। তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ, ওদের সহায়-সম্পদকে নষ্ট ও অন্তরকে রুদ্ধ করে দিন, যেন ওরা কষ্টদায়ক আযাব না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে।' তোমার উদাহরণ হযরত নূহের মতোও বটে। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, পৃথিবীতে কোনো কাফেরকে বাঁচিয়ে রেখো না।' তোমরা আজ সহায় সম্বলহীন। কাজেই বন্দীরা হয় মুক্তিপণ পরিশোধ করবে, নচেত নিহত হবে, এর কোনো অন্যথা হবে না। ইবনে মাসউদ বলেন, আমি বললাম, সোহেল বিন বায়যা বাদে। কেননা সে ইসলামের কথা বলাবলি করে থাকে। রসূল (স.) নীরব হয়ে গেলেন। সেদিন আমি নিজের ওপর আকাশ থেকে পাথর পতিত হয় কিনা এই ভয়ে এতো ভীত হয়েছিলাম যে, অতো ভয় আর কখনো পাইনি। অবশেষে রসূল (স.) বললেন, সোহেল বিন বায়যা বাদে। অতপর আল্লাহ ৬৭ নং আয়াত নাযিল করলেন। (আহমদ, তিরমিযী, হাকেম)

'ইছখান' শব্দটার অর্থ হলো ব্যাপকভাবে হত্যা করা, যাতে মোশরেকদের শক্তি চূর্ণ হয় এবং মুসলমানদের শক্তি বাড়ে। বদরের যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রেফতার করার আগে এটা করা উচিত ছিলো। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা ৬৭ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে ভর্ৎসনা করেছেন।

বদরের যুদ্ধ ছিলো কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত প্রথম যুদ্ধ। তখন মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিলো এবং কাফেরদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই যাচ্ছিলো। মোশরেকদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করার যোগ্য, তাদের সংখ্যা কমাতে পারলে তাদের ঔদ্ধত্য কমতো এবং মুসলমানদের ওপর তাদের আবার আক্রমণ চালানোর সম্ভাবনা হ্রাস পেতো। এটা এতো জরুরী ছিলো যে, মুক্তিপণ আদায় তার সমকক্ষ ছিলো না, তা মুসলমানদের অর্থাভাব যতোই প্রকট হোক না কেন।

এর আরো একটা সার্থকতা ছিলো, যা হযরত ওমরের বক্তব্যে ফুটে উঠেছিলো। সেটা এই যে, 'যাতে আল্লাহ তায়ালা জেনে নেন যে, আমাদের মনে মোশরেকদের প্রতি কোনোই সহানুভূতি নেই।'

এই দুটো কারণে আমার ধারণা যে, বদরের যুদ্ধের পর কাফেরদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেননি। সে সময়কার ওই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি আবারো ঘটতে পারে। যা হোক, ওই পরিস্থিতিতেই ৬৭ নং আয়াত নাযিল হয়েছে।

প্রথম যুদ্ধের বন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ ও ছেড়ে দেয়ার কারণে কোরআন মুসলমানদেরকে ভর্ৎসনা করে বলেছে,

'তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও, অথচ আল্লাহ তায়ালা চান আখেরাত।'

অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করার পরিবর্তে বন্দী করে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিলে!

'আল্লাহ তায়ালা চান আখেরাত।'

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যা চান মুসলমানদেরও তাই চাওয়া উচিত। কেননা সেটা উত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী। আর আখেরাত চাইলে দুনিয়ার স্বার্থ কিছুটা ত্যাগ করতেই হয়।

'আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

আপন প্রজ্ঞার আলোকেই তোমাদের জন্য বিজয় বরাদ্দ করেছেন। তোমাদেরকে বিজয়ের ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়েছেন। 'যাতে কাফেরদের মূলোৎপাটন হয়ে যায় এবং সত্য বিজয়ী ও বাতিল পরাভূত হয়, তা অপরাধীরা যতোই অসন্তুষ্ট হোক না কেন।'

'যদি আগেই একটা সিদ্ধান্ত না থাকতো, তাহলে তোমরা যা শুরু করেছিলে তাতে তোমাদের ওপর কঠিন আযাব এসে যেতো।'

বস্তুত, আল্লাহর ফয়সালা এটাই আগে হয়ে গিয়েছিলো যে, বদর যোদ্ধারা যা করবে, তা তিনি মাফ করে দেবেন। এই ফয়সালাটা আগেই হয়েছিলো বলে তাদের মুক্তিপণ গ্রহণের দরুন প্রাপ্য কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করা হয়েছিলো।

এরপর তাদের ওপর আরো অনুগ্রহ করা হলো। তাদের জন্যে যুদ্ধলব্ধ গনীমতের সম্পদ হালাল করা হলো। মুক্তিপণও এর আওতাভুক্ত। অথচ এটা পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের জন্যে বৈধ ছিলো না। সেই সাথে আল্লাহকে ভয় করার কথা এবং ইতিপূর্বে করা অনুগ্রহ ও ক্ষমার কথা মনে করিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ধ্যান ধারণায় ভারসাম্য রক্ষা করা, যেন দয়া ও ক্ষমার কারণে খোদাভীতি ও গুনাহ বর্জনের কথা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি না হয়।

'অতএব, তোমরা যে গনীমত পেয়েছো, তা হালাল ও পবিত্র। কাজেই তা খাও। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (আয়াত ৬৯)

এরপর বন্দীদের অন্তরে আশার আলো জ্বালানো, অতীতের চেয়ে উত্তম ভবিষ্যতের আশ্বাস দান, অধিকতর সম্মানিত জীবন দান, অর্থকড়ির চেয়ে মূল্যবান জিনিস প্রদান এবং ক্ষমা ও দয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হচ্ছে ৭০ আয়াতে।

' হে নবী, তোমাদের হাতে যে সব যুদ্ধবন্দী রয়েছে ....' (আয়াত ৭০)

যে কল্যাণ ও মংগলের প্রতিশ্রুতি এ আয়াতে দেয়া হয়েছে, তার পূর্বশর্ত হলো ঈমান আনয়নের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা। তাহলেই আল্লাহ তায়ালা স্বীকৃতি দেবেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। এখানে কল্যাণ বলে ঈমানকে বুঝানো হয়েছে।

ইসলামের হাতে যুদ্ধবন্দী যদি থাকে, তবে তার উদ্দেশ্য হবে তাদের অন্তরে সকল কল্যাণ ও সততার উৎস ঈমানের আলো জ্বালানো– প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করা, নির্যাতন করা, লাঞ্ছনা দান ও শোষণ করা নয়, যেমন করা হতো রোম সাম্রাজ্যে ও অন্যান্য দেশ ও জাতির বিজয়ের সময়।

যুহরী বর্ণনা করেন যে, কোরায়শরা তাদের বন্দী মুক্ত করার জন্যে লোক পাঠালো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ বন্দীকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিলো। হযরত আব্বাস বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ, আমি মুসলমান ছিলাম। রসূল (স.) বললেন, আপনার ইসলামের কথা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। যদি সত্যিই মুসলমান থেকে থাকেন, তবে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে পুরস্কৃত করবেন। আমরা আপনার প্রকাশ্য অবস্থাটাই ধরবো। কাজেই আপনি নিজেকে ও আপনার দুই ভাতিজা নওফেল ইবনুল হারেস ও আকীল ইবনে আবু তালেবকে এবং আপনার বন্ধু ওৎবাকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিন। তিনি বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ, আমার কাছে মুক্তিপণ দেয়ার অর্থ নেই। রসূল (স.) বললেন, তাহলে যে সম্পদ আপনি ও উম্মুল ফযল মাটির নীচে পুঁতে রেখেছেন, সেটা কোথায়? ওই মাল সম্পর্কেই তো আপনি উম্মুল ফযলকে বলেছিলেন, 'এই সফরে আমি যদি মারা যাই, তাহলে এই পুঁতে রাখা মাল ফযল আবদুল্লাহ ও কাছছামের সন্তানদের জন্যে রইলো।' আব্বাস বললেন, আল্লাহর কসম, ইয়া রসুলাল্লাহ, আমি নিশ্চিত জানি যে, আপনি আল্লাহর রসূল। নচেত এই সম্পদের খবর আমি ও উম্মুল ফযল ছাড়া আর কেউ জানে না। ইয়া রসুলাল্লাহ, আপনারা ইতিমধ্যে আমার কাছ থেকে যে বিশ উকিয়া জিনিসপত্র পেয়েছেন, তা-ই যথেষ্ট মনে করুন। রসূল (স.) বললেন, 'না, ওটা আল্লাহ তায়ালাই আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে দিয়েছেন।' এরপর আব্বাস নিজেকে, তার দুই ভাইয়ের ছেলেদেরকে ও তার বন্ধুকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, 'হে নবী, তোমার হাতে আটক বন্দীদেরকে বলো.....' (আয়াত ৭০) আব্বাস (রা.) বলেছেন, বিশ উকিয়ার পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিশটি দাস দিয়েছিলেন, যাদের প্রত্যেকের হাতে প্রচুর ধন সম্পদ ছিলো। তদুপরি আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমার আশা তো করতেই পারি।

৭০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বন্দীদেরকে ক্ষমার আশ্বাস যেমন দিয়েছেন, তেমনি ৭১ আয়াতে উচ্চারণ করেছেন রসূল (স.)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কড়া হুশিয়ারী। এ বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই আজ তারা বন্দীত্বের দশায় পতিত।

'আর যদি তারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার মতলব এঁটে থাকে, তবে ইতিপূর্বে তো তারা আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং তার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরাভূত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মহাজ্ঞানী মহাকুশলী।' (আয়াত-৭১)

আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করা এবং তাঁকে এককভাবে নিজের মনিব হিসাবে গ্রহণ না করাই তো ছিলো সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা। তাদের সৃষ্টির সূচনাতেই তাদের কাছ থেকে আল্লাহ তায়ালা অংগীকার নিয়েছিলেন। সে অংগীকার তারা ভংগ করেছে। এখন যদি আল্লাহর রসূলের হাতে বন্দী থাকা অবস্থায়ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে ইচ্ছুক হয়ে থাকে, তা হলে তাদের প্রথম বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম তাদের স্মরণ করা উচিত। সেই পরিণতি ছিলো আল্লাহর রসূল ও তাঁর সাথীদের কাছে তাদের শোচনীয় পরাজয় ও বন্দীদশা। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাদের মনের গোপন ইচ্ছা সম্পর্কে 'মহাজ্ঞানী' এবং তাদেরকে শাস্তি দানের ব্যাপারে 'মহাকুশলী'।

ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে ইবনুল আরাবীর নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন-

'মোশরেকদের মধ্য থেকে একটা দল যখন বন্দী হলো, তখন তাদের কেউ কেউ ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করলো। কিন্তু তারা কোনো সিদ্ধান্তে আসলো না এবং ইসলামকে তেমন

গুরুত্বের সাথে স্বীকৃতিও দিলো না। তখন সন্দেহ ঘনীভূত হতে লাগলো যে, তারা মুসলমানদের কাছেই ঘনিষ্ঠ হতে চাইলো, আবার মোশরেকদের কাছ থেকেও দূরত্ব সৃষ্টি করতে চাইছে না। আমাদের মনীষীরা বলেছেন যে, কোনো কাফের যদি মনে মনে ইসলাম নিয়ে চিন্তা করে ও মুখে তা নিয়ে কথাও বলে এবং কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়, তবে সে মোমেন হবে না। কিন্তু এ ধরনের অবস্থা যদি মোমেনের ভেতর কুফরী সম্পর্কে পাওয়া যায়, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। অবশ্য শয়তানের এমন কু-প্ররোচনা বা ওয়াসওয়াসা যা কিছুতেই রোধ করা যায় না, তার কথা ভিন্ন। এগুলো আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে বলেছেন যে,

'তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়'

অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্কে তারা যে আলোচনা করে থাকে, তা যদি প্রতারণার ফাঁদ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের স্মরণ করা উচিত যে, তারা ইতিপূর্বে তোমাকে স্বীকার করা, তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও তোমার সাথে লড়াই করার মাধ্যমে তোমার সাথে অনেক বিশ্বাসঘাতকতাই করেছে। আর যদি এ সব কথাবার্তা সদুদ্দেশ্যে বলে থাকে, তবে আল্লাহর তা অবশ্যই জানা আছে এবং আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করবেন। তাদের অতীতের জীবনের চেয়ে উত্তম জীবন দান করবেন এবং তাদের অতীতের কুফরী, বিশ্বাসঘাতকতা ও ধোকাবাজী মাফ করে দেবেন।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক কিছু নীতিমালা

এরপর শুরু হচ্ছে সূরার শেষ পর্ব। এখানে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি, মুসলিম সমাজ ও অমুসলিম সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি এবং এইসব সম্পর্ক ও বন্ধনের শৃংখলা রক্ষাকারী আইন কানুন ও বিধিমালা বর্ণনা করেছেন। এ থেকে মুসলিম সমাজটা আসলে কেমন, তাও জানা যায়। জানা যায় মুসলিম সমাজের ভিত্তি ও কর্মপন্থা কী। বস্তুত এ সম্পর্কটা রক্তের সম্পর্ক নয়, ভূমির সম্পর্ক নয়, বর্ণ, বংশ ও জাতিগত সম্পর্ক নয়, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও অর্থনীতির সম্পর্কও নয়। এটা কোনো আত্মীয়তা, জাতীয়তা বা আঞ্চলিকতা নয়। এটা অর্থনৈতিক স্বার্থ সংক্রান্তও নয়। এটা হচ্ছে আকীদা বিশ্বাসের সম্পর্ক, নেতৃত্বের সম্পর্ক এবং আন্দোলন সংগঠনগত সম্পর্ক। কাজেই যারা ঈমান এনেছে এবং ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে হিজরত করেছে এবং ইসলামের খাতিরে ভূমি, ঘরবাড়ী, স্বজাতি ও জাতিগত স্বার্থ সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছে, জান ও মাল বাজি রেখে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, তাদের সাথে তাদের আকীদা বিশ্বাস ও নেতৃত্বের প্রতি একই সংগঠনে একীভূত হয়ে আনুগত্য প্রদান করেছে, তারা সবাই পরস্পরের বন্ধু। কিন্তু যারা ঈমান আনলেও হিজরত করেনি, তাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের অভিভাবকত্ব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক নেই। কেননা তারা তাদের আকীদা বিশ্বাসের খাতিরে সমস্ত সহায় সম্পদ ত্যাগ করতে পারেনি, নেতার আনুগত্য করেনি এবং সাংগঠনিক নিয়ম শৃংখলার আওতাভুক্ত হয়নি। এই সাংগঠনিক নিয়ম শৃংখলার আওতায় বসবাসকারীদের মধ্যে উত্তরাধিকার অন্যান্য বিষয়ে রক্ত সম্পর্কই অগ্রগণ্য। আর যারা কুফরী করেছে, তারাও পরস্পরের বন্ধু। এই হলো সম্পর্ক বন্ধনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ৭২ থেকে ৭৫ নং আয়াত পর্যন্ত সূরার শেষ আয়াত কটির এই হলো প্রধান আলোচিত বিষয়। (আয়াত-৭২-৭৫)

ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনাকাল থেকে শুরু করে বদর যুদ্ধের সময়কাল পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে অভিভাবকত্বের সম্পর্ক ছিলো উত্তরাধিকার, রক্তপণের দায় দায়িত্ব গ্রহণ, সাহায্য ও ভ্রাতৃত্বের মধ্যে সীমিত এবং এগুলো রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার স্থলাভিষিক্ত হতো। কিন্তু যখন ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত

হলো এবং বদরের দিন আল্লাহ তায়ালা এই রাষ্ট্রকে যাবতীয় ক্ষমতা দান করলেন, তখন অভিভাবকত্ব ও সাহায্যের সম্পর্কটাই শুধু অবশিষ্ট রইল। আর আল্লাহ তায়ালা উত্তরাধিকার ও রক্তপণের দায় দায়িত্ব ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরেই রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের ওপর বর্তালেন। কিন্তু এ আয়াতগুলোতে যে হিজরতের উল্লেখ রয়েছে এবং যাকে অভিভাবকত্বের শর্ত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে মোশরেকদের রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত। অবশ্য এটা যার সামর্থের আওতাভুক্ত, তাকেই করতে হবে। যারা হিজরত করতে সমর্থ হয়েও হিজরত করেনি এবং মোশরেকদের সাথে আত্মীয়তা বা অন্য কোনো স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজের অভিভাবকত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। বেদুইন মুসলমানদের বেলায় সচরাচর এমনিই ঘটতো। তারা ছাড়াও মক্কায় কিছু সক্ষম ব্যক্তি হিজরত না করে থেকে গিয়েছিলো। এ ধরনের লোকেরাও যদি কখনো তাদের ধর্ম ও ঈমান বাঁচানোর খাতিরে সাহায্য চায়, তবে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাহায্য করাও মুসলমানদের কর্তব্য বলে গণ্য করেছেন। তবে এখানে শর্ত এই যে, তাদের ওপর আক্রমণ বা যুলুমটা যেন এসব কোনো গোষ্ঠী থেকে না হয় যাদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র বা সমাজের চুক্তি রয়েছে। কেননা ইসলামী রাষ্ট্রকে তার চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হয়।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র, প্রকৃতি, তার অবকাঠামোগত বিন্যাস ও সমন্বয়ের মৌলিক নীতিমালা এবং তার মৌলিক মূল্যবোধসমূহ সম্পর্কে এ আয়াতগুলোতে পর্যাপ্ত তথ্য রয়েছে বলে আমি মনে করি। তবে এই সমাজটা কিভাবে গঠিত হলো, কোন মৌলিক নীতিমালার ভিত্তিতে তা গঠিত হলো ও টিকে থাকলো এবং আন্দোলন ও সংগ্রামে তার অনুসৃত পদ্ধতি ও দায় দায়িত্ব কী ছিলো, সে সম্পর্কে একটা বিশদ বিবরণ না দেয়া পর্যন্ত এ রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সৃষ্টি হবে না। সেই বিবরণটি নিম্নে দেয়া যাচ্ছে-

দুনিয়ায় যতো নবী রসূল ইসলামের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতে এসেছেন, নবীদের সেই শেকলের শেষ কছিটি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (স.) যাঁকে এই রসূলদের মিছিলে পাঠানো হয়েছিলো নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ......আর বিশ্বের মানবমন্ডলীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় বরাবর এ দাওয়াত একটা কাজই করেছে, আর তা হচ্ছে মানুষকে তার একমাত্র মালিক মনিব-প্রভু প্রতিপালকের সাথে পরিচিত করে দেয়া, তাদের একমাত্র বাদশাহ ও মুনিবের দাসত্বের বন্ধনে তাদেরকে আবদ্ধ করে দেয়া এবং ছুঁড়ে ফেলে দেয়া সৃষ্টির গোলামীর শেকলকে তাদের গলা থেকে ...... আর অবশ্যই এটা সত্য কথা, যে বারবার দেখা গেছে, অতি অল্প সংখ্যক একদল লোক, মানব জাতির দীর্ঘ ইতিহাসের একটা ছোট্ট অধ্যায়ে আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে। অবশ্যই তারা তাদের প্রকৃত মুনিবকে যথাযথভাবে চিনতে ভুল করেছে। অথবা স্বার্থের কারণে বা সঠিক জ্ঞান না থাকায় আল্লাহর সাথে অন্য আরো অনেককে শরীক বানিয়ে নিয়েছে, এই শরীক বানানো হয় বিশ্বাস ও আনুগত্যের দিক দিয়ে, অথবা তাদেরকে নিশর্তভাবে শাসন-কর্তৃত্বের আসনে বসিয়ে এবং তাদের অন্ধ আনুগত্যের মাধ্যমে, আর এ উভয় অবস্থাই হচ্ছে অন্য সরাসরি শেরক-এর মতোই শেরক, যার দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত সেই জীবন ব্যবস্থা থেকে মানুষকে সরিয়ে নেয়া হয় যা তারা প্রত্যেক রসূলের মাধ্যমে লাভ করেছে। এরপর তাদের জীবনের লক্ষ্য ও আশা-আকাংখা যখন দীর্ঘ হতে থাকে তখন আল্লাহকে তারা পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করে বসে এবং সেই জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যায় যার থেকে রসূল (স.) তাদেরকে বের করে এনেছিলেন এবং বারবার সতর্ক করা সত্তেও তারা শেরকের দিকে ফিরে যায় ..... হয় বিশ্বাস ও এবাদাতের ক্ষেত্রে অথবা তার অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে এবং এসব আল্লাহ বিমুখ লোকের শাসন কর্তৃত্বকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিয়ে, অথবা এই উভয় উপায়েই।

মানব জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এইটাই একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দিকে দাওয়াত দানের প্রকৃতি। ও পদ্ধতি এ দাওয়াত দানের অর্থ ইসলাম গ্রহণ করতে বা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের রব-এর নিকট আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান জানানো। এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে আবদ্ধ করা। তাদের স্বৈরাচারী শাসকের শাসন শোষণ ও কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন করা তাদেরকে সমস্ত মানব রচিত আইন-কানুন মূল্যায়ন ও অন্ধ অনুকরণ করা থেকে এবং তাদেরকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও তাঁর শাসন ক্ষমতার দিকে নিয়ে যাওয়া এবং সব ব্যাপারেই একমাত্র তারই আইন-কানুনের ওপর নির্ভর করা। এই উদ্দেশ্যেই মোহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে দুনিয়ায় ইসলাম এসেছে।

যেমন ইতিপূর্বে ইসলাম এসেছিলো অন্যান্য রসূলের মাধ্যমে, ইসলাম এসেছে মানুষকে পুনরায় আল্লাহর কর্তৃত্বের দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য, যেমন প্রকৃতির সকল বস্তুই মানুষকে ঘিরে রেখেছে। সুতরাং, যে মহান সত্ত্বা নবী (স.)-এর সাংগঠনিক ক্ষমতাকে টিকিয়ে রেখেছেন তিনিই তাঁর অস্তিত্বকেও সুনির্দিষ্ট এক সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছেন অতএব তাঁরই হাতে থাকতে হবে সকল ক্ষমতার চাবিকাঠি। বিশ্বপতির সেই ক্ষমতাকে পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে কোনো কোনো ব্যক্তি কেড়ে নিয়ে তারা নিজেদের পদ্ধতি চালু করবে, নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহার করবে এবং যিনি গোটা বিশ্বকে পরিচালনা করছেন, তাঁর পদ্ধতি সবখানে বিরাজ করছে এবং সকল কিছুর ওপর যাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেই মহান আল্লাহকে উৎখাৎ করে তাঁর জায়গায় অন্য কেউ জেঁকে বসবে এটা কিছুতেই হতে পারে না। বরং তিনিই তো তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছেন। তারা নিজেদের জীবনকে নিজেদের ইচ্ছামতো চালাতে পারে না, সুতরাং এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে আল্লাহ তায়ালার যে আইন-কানুন রয়েছে তার অধীনে সবাই পরিচালিত হতে বাধ্য। এ আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তাদের জন্ম, বৃদ্ধি, সুস্থতা-অসুস্থতা জীবন ও মৃত্যুর ওপর, যেমন করে এই সকল আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমাজ সংগঠন এবং নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের ঐচ্ছিক কাজগুলোর জন্য প্রচেষ্টার শেষ অবস্থাটা। তারা এসব কিছুর মধ্যে কিছুতেই পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে না যেমন তারা পরিবর্তন করতে পারে না বিশ্ব প্রকৃতির গতি প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সেই নিয়ম-কানুনকে যার অধীনে চলছে ও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সারা বিশ্বের সকল কিছু .... এই জন্যই তাদের জীবনে যে সব বিষয়ে তাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে সেখানেও তাদের উচিত ইসলামেরই বিধান মেনে নেয়া এবং আল্লাহ তায়ালার বিধানকেই জীবনের যাবতীয় বিষয়ে পরিচালক হিসাবে গ্রহণ করা। তাহলেই প্রকৃতির সকল নিয়ম-কানুনের সাথে তাদের জীবনের নিয়ম-কানুনগুলো খাপ খেয়ে যাবে।(১)

কিন্তু প্রকৃত জাহেলিয়াত হচ্ছে মানুষের ওপর মানুষের শাসন কর্তৃত্ব-এর ব্যতিক্রম হচ্ছে প্রাকৃতিক জগত। মানুষের জীবনের ইচ্ছা শক্তিকে স্বাধীনতা দান করায় এবং প্রাকৃতিক জগতের বস্তু নিচয়ে ও জীবন জন্তুগুলোকে এই স্বাধীনতা না দেয়ায় এবং মানুষের জীবনের মধ্যে ঐচ্ছিক কর্মধারা ও প্রকৃতিগত কর্মধারার মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধে সেটাকেই জাহেলিয়াত বলা হয়েছে, যা দূর করাই ছিল প্রত্যেক রসূলের দাওয়াতের লক্ষ্য। এসব পার্থক্যকে দূর করে এই ভিন্ন ধর্মী উভয় শ্রেণীর যোগ্যতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার জন্যে প্রত্যেক রসূলই ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এসেছে। যাদেরকে এক অতি মূল্যবান আমানত হিসাবে ইচ্ছা শক্তিতে এই স্বাধীনতা রূপ নেয়ামত

---

(১) এ বিষয়ে আরো বিস্তারিতভাবে জানতে হলে দেখুন ওস্তাদ জনাব সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রচিত 'মাবাদিউল ইসলাম' (ইসলামের মূলনীতিসমূহ) পুস্তকটি। আরো দেখুন সাইয়্যেদ কুতুবেরই 'মায়ালিমু ফিত তারীক'।

দেয়া হয়েছে তাদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (স.)ও এসেছিলেন এই একই দাওয়াত নিয়ে। .... জাহেলিয়াতকে উৎখাৎ করার যে দাওয়াত ছিলো তা চিরন্তন হওয়া সত্তেও এই জাহেলিয়াতকে পৃথিবীর বুকে কখনই কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই। বরং আরো সত্য কথা হচ্ছে, সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য জাহেলিয়াতকে কোনো দিন কোনো স্বতন্ত্র মতবাদ বলে দাবীও করা হয় নাই। তবু সকল সময়েই মানুষের মতবাদ একটা সামাজিক বিপ্লব হিসাবে ভূমিকা রেখেছে, স্বার্থবাদীরা একে সামাজিক আন্দোলন হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, যার উদ্দেশ্য থেকেছে সমাজের সাধারণ মানুষের ওপর এক বিশেষ শ্রেণীর প্রাধান্য বিস্তার করা। প্রতিষ্ঠিত করা জীবনের সকল পর্যায়ে এর চিন্তাধারাকে এর মূল্যবোধকে কায়েম করা, এর চেতনাকে চালু করা, মানুষের আনুগত্যকে এবং পারস্পরিক সহযোগিতাকে সামাজিক উন্নয়নের খাতে ব্যয় করা একে বলা হয় পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে গঠিত সমবায় সমাজ। এতে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সমঝোতা সৌহার্দ্য ও সকল এবং সদস্যদের সহযোগিতার মনোভাব ও সমাজকে সুশৃংখল রাখতে এক সক্রিয় ভুমিকা রাখবে এর উদ্দেশ্য হবে গোটা সৃষ্টির হেফাজত করা, সবার জন্য নিরাপত্তা দান এবং সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি এবং বিপদজনক অবস্থায়ও সবার প্রয়োজন মেটানো। আর জাহেলিয়াত যে সরল-সহজ ও একমাত্র আদর্শ পেশ করেছে তা নয়, বরং এক আদর্শ সমাজ গঠনের জাতিকে প্রতারিত করতে এ জাহেলিয়াত এসেছে। সুতরাং মানব নির্মিত এই ব্যবস্থাকে উৎখাত করে মানুষকে পুনরায় আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য স্রেক কোনো মতবাদ পেশ করাই সঠিক পথ নয় এবং শুধুমাত্র এই ধরনের তাত্বিক মতবাদ পেশ করলে কোন ফায়দাও হবে না, কারণ তা বর্তমান জাহেলিয়াত থেকে কার্যত কোনো দিক থেকেই উন্নত হবে না, আর ঐ জাহেলিয়াত থেকে উন্নত ব্যবস্থা দান করা তো দূরের কথা আজকে সর্বত্র সমাজ-বিপ্লবের নামে যে আন্দোলন চলছে তার বিকল্প বলেও তা গৃহীত হবে না। আমাদের চেষ্টা সংগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জন্য অকল্যাণকর যে নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে তাকে পরিবর্তন করে বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আসা একমাত্র কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা ইসলামের চালু করা। সমাজের সর্ব-সাধারণের সার্বিক কল্যাণের জন্যেই সমাজ ব্যবস্থায় আনতে হবে মৌলিক পরিবর্তন এবং মানবরচিত ছোট-বড় সমস্ত আইন ও পদ্ধতির মুলোৎপাটন করে সেখানে ইসলামের নীতিমালার প্রবর্তন। অন্য কথায় বলা যায়, মানব কল্যাণের জন্য আজ মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত যে সব আন্দোলন চলছে এবং যে সব মুখরোচক কথা বলে সেই আন্দোলনের দিকে মানুষকে ধাবিত করা হচ্ছে তার থেকে অনেক বেশী জোরদার এবং শক্তিশালী করে তুলতে হবে। কেননা এটিই একমাত্র জীবনব্যবস্থা যা- মানুষের জীবন সমস্যার সকল সমাধান দিতে পারে। এজন্য ইসলামকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিয়োজিত সংগঠনটি সাংগঠিনক কাঠামো যেমন মযবুত ও সুন্দর হতে হবে তেমনি হতে হবে এর সদস্যদের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও মধুর সম্পর্ক-তারা পরস্পরের প্রতি হবে দয়া-সহানুভূতি ও সংবেদনশীলতার মূর্ত প্রতীক এবং তাদের অবিশ্বাস্য সৌহার্দ্য সম্প্রীতি জাহেলি ভাবধারার মোকাবেলায় হবে এতো উজ্জল যেন জাহেলিয়াতের অনুসারী ও ধ্বজাধারীরা এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়।

আর যে মূলনীতির ভিত্তিতে গোটা মানব জাতির ইতিহাসে ইসলাম এক অভূতপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে তা হচ্ছে, তা হচ্ছে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই, হতে পারেনা, অর্থাৎ শক্তি-ক্ষমতা, সৃষ্টির সবার প্রতিপালনের ক্ষমতা, সবার ওপর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব করার ও সবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন-বিধান দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর, এ ব্যাপারে অন্য কারো কোনো দখল নাই, যেহেতু আল্লাহ তায়ালাই সবার সৃষ্টিকর্তা

এবং তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে, রাজ্য যার আইন তাঁর এটা শুধু বিশ্বাস হিসাবে মেনে নিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না, বরং মনে প্রাণে একথা মেনে নিয়ে, বাস্তবে তাঁর হুকুম মতো জীবন যাপন করতে হবে, তাঁর আইন-অনুযায়ী দেশ ও সমাজকে পরিচালনা করতে হবে এবং শাসন ও বিচার করতে হবে। তাঁরই আইন দ্বারা, ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজিক আচার-আচরণে তাঁর দেয়া পদ্ধতিসমূহের অনুসরণ করতে হবে। বিশ্বাস, কাজ, পোশাক-আশাক, চাল-চলন, পারস্পরিক লেন-দেন, সামাজিকতা, পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন বা সম্পর্ক ছিন্ন করা, সব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করার মাধ্যমে বাস্তবে আনুগত্যের প্রমাণ দিতে হবে। এইভাবে সঠিক ও সামগ্রিক আনুগত্য দেয়া না দেয়ার ওপর নির্ভর করে মুসলিম থাকা বা না থাকা। মুখে এসব কথার স্বীকৃতি দিয়ে বাস্তব, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এসবের আমল করে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে মানুষ কিছুই বুঝবে না এবং ইসলামের সৌন্দর্যও প্রকাশ পাবে না। এমন অবস্থায় ঐ তথাকথিত মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্যও পরিলক্ষিত হবে না।

বিশ্বাসগত বা মতবাদগত দিক দিয়ে এক কথায় এর অর্থ দাঁড়ায়-মানুষকে আল্লাহ তায়ালার দিকে পুরোপুরি ফিরে আসতে হবে, জীবনের কোনো দিক ও বিভাগে আল্লাহ ছাড়া কারো কথা মানা চলবে না, কারো কথা মতো চললেও চলবে না, আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য কারো আইন মতো বিচার ফায়সালা করা যাবে না, বরং পূর্ণ আনুগত্য বোধ নিয়ে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসতে হবে ...... আর আল্লাহর হুকুমের দাবী হচ্ছে যে তাঁকেই একমাত্র হুকুম দাতা হিসাবে জানতে হবে ও মানতে হবে এবং তাঁকেই সকল আইনের উৎস হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আর রসূলুল্লাহ (স.)ই যে আল্লাহর শেষ নবী তার সাক্ষ্য দিতে হবে। ইসলামের মূল রুকন যে প্রথম কালেমা তার প্রথম অংশের পর, দ্বিতীয় অংশে মোহাম্মদ (স.)কে আল্লাহর রসূল বলে সাক্ষ্য দিতে হবে।

তাত্ত্বিক মতবাদের দিক দিয়ে, এইটাই হচ্ছে ইসলামের মূল নীতি, যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের প্রাসাদ। আর এই ইসলাম যখন মানুষের জীবনের সুপরিকল্পিত পরিচালনা করার দায়িত্ব নিয়েছে তখন জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যই পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগ ব্যবস্থা দিয়েছে, ব্যবস্থা দিয়েছে ব্যক্তিগত জীবনের জন্য, সামাজিক জীবন পরিচালনা ও সৌহার্দ-সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য। যে কোনো দেশের ভেতরে ও বাহিরে মুসলিম সমাজ ও অমুসলিম সমাজের সবখানেই ইসলামী বিধি-বিধান চালু করতে হবে..... তবেই মানুষ ইসলামের পূর্ণাংগতা ও এর বাস্তব মুখিতা ও কল্যাণকামীতা বুঝতে সক্ষম হবে। (১)

ওপরে যেমন বলেছি, আবারও বলছি, ইসলাম শুধুমাত্র মতবাদই পেশ করেনি এবং এটা শুধু মতবাদ-সর্বস্ব ব্যবস্থাও নয়। ইসলাম যে গ্রহণ করবে বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব বরণ করে নিতে হবে, তারপর দুনিয়ার বুকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে আন্দোলন-ধর্মী একটা দল গড়ে তুলতে হবে এবং এর সদস্যবর্গকে নিয়ে গড়ে তুলতে হবে এক মযবুত ও একতাবদ্ধ কর্মী বাহিনী। এই বাহিনী বা এই জামায়াতের লোক সংখ্যা যাই হোক না কেন তাতে কিছুই আসে যায় না। এমনই এক উৎকৃষ্টপ্রাণ কর্মী-বাহিনীর বাস্তব অনুসরণ ও আনুগত্য ছাড়া বাস্তবে ইসলামের অস্তিত্ব আশা করা যায় না; কারণ শুধু মুখে মুখে মুসলিম জামায়াতের সদস্য হওয়ার দাবী করে মুসলিম জামায়াতে যারা প্রবেশ করে তারা কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে নিজেদেরকে ইসলামের দাবীপূরণকারী হিসাবে প্রমাণ দিতে পারে না। এরা প্রয়োজনের সময় হয়তো যুদ্ধের ক্ষেত্রে রওয়ানা না হয়ে পারে না, কিন্তু আন্তরিকতার অভাবে এরা সর্বদা ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ থেকে পালানোর চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে, শত্রুদের আক্রমণের পরিবর্তে শুধু

(১) দেখুন, 'মায়ালিমু ফিত তরীক' পুস্তকের অধ্যায়, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-ই হচ্ছে জীবনের পদ্ধতি।

আত্মরক্ষার জন্যই এরা চেষ্টা করে; তবে হ্যাঁ যুদ্ধে না গিয়ে পাগুলো স্থির থাকতে পারে না তারা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যেতে চাইলেও লড়তে হয়। ক্ষিপ্র হতে হয় কারণ যুদ্ধের একবার পৌঁছে গেলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মানুষের সকল অংগ প্রত্যংগই তৎপর হয়ে ওঠে; অর্থাৎ ইসলামকে যারা শুধু তাত্ত্বিকভাবে গ্রহণ করেছে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বাধ্য হয়ে দুশমন থেকে বাঁচার জন্য বাস্তবিক পক্ষেই মুসলমান হয়ে যায়; তার শরীরের প্রতিটি কনা প্রতিরোধের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তখন সে আত্মরক্ষার জন্য সর্বোতভাবে প্রচেষ্টা চালায়। এর ফলে তাদেরকে প্রচুর পুরস্কারও দেয়া হয়। তাদের সম্মান ও পুরস্কার বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং তার ধমনীতে এনে দেয়া হয় প্রভূত শক্তি সাহস। আর এ সাহায্য আসে এ জন্য যে অন্তরে ভয়-ভীতি জনিত দুর্বলতা থাকলেও জাহেলিয়াতকে উৎখাত করে ইসলামী ব্যবস্থা বিজয়ী করার জন্য (ইচ্ছায় অনিচ্ছায়) তার দেহ সক্রিয় হয়েছে!

আর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা ও ইসলামকে বিরোধী শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যও প্রয়োজন। সুতরাং এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও গ্রহণ করতে হবে। এই সব প্রস্তুতির জন্যে যা কিছু করা হবে তাই হবে বাস্তব কর্মপন্থা। এইভাবে ইসলামের তাত্ত্বিক অবস্থা রূপান্তরিত হবে বাস্তব কর্মকান্ডে। এই সব কারণেই ইসলামের সূচনা থেকে নিয়েই দেখা গেছে তথ্য প্রযুক্তি ও অস্ত্র-শস্ত্রের সাধ্যমত ব্যবহার করা হয়েছে, শুধু তাই নয় জাহেল ও বিরোধী গোষ্ঠীর সঠিক মোকাবেলার জন্য আন্দোলনধর্মী কর্মীদেরকে একত্রিত করতে হবে, ছোটো ছোটো দল হোক বা বড় দল হোক, তাদেরকে একত্রিত করে সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাদের প্রকৃতি ও পরিমাণের দিক দিয়ে এমন হতে হবে এবং এতো হতে হবে যেন শত্রুরা তা দেখে ভয় পেয়ে যায় এবং আক্রমণ করার সাহসই হারিয়ে ফেলে। ইসলাম কোনো রক্তপাত চায় না। এমনকি কাউকে সামান্যতম কষ্টও দিতে চায় না। কিন্তু কেউ অথবা কোনো গোষ্ঠী যদি নিজেদের স্বার্থের কারণে নিজেদের মন-গড়া নিয়ম-নীতি ও আইন-কানুন চালু করে সামগ্রিকভাবে মানুষকে কষ্ট দিতে চায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে তাঁর রাজ্যে এই নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে দিতে পারেন না। এ জন্য মানুষকে বুঝার সময় দিয়েছেন যেন তারা ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করলে তাকে অপসারিত করা আল্লাহর খলীফাদের দায়িত্ব, আর কেউ যদি স্বয়ং মালিকের এই ব্যবস্থা উৎখাৎ করতে উদ্যত হয় তাহলে তা বরদাশত করা দুর্বলতা প্রকাশের শামিল এবং নিশ্চিত আল্লাহ তায়ালার এসব দুর্বলতার উর্দ্ধে। তাই, প্রাথমিক পর্যায়ে বুঝানো দৃষ্টান্ত দ্বারা ইসলামী ব্যবস্থার সৌন্দর্য হৃদয়ংগম করানোর চেষ্টা করা হবে আর বিদ্রোহীদেরকে দেয়া হবে চরম শাস্তি। এসব কিছুর জন্য প্রয়োজন সকল প্রকার ঈমানী ও সাময়িক আয়োজনের। বাতিল শক্তির উৎখাৎ ও রসূল (স.) এর নেতৃত্বে ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত এ যুদ্ধ শেষ হবে না। পরবর্তী কালেও অন্যান্য সকল নেতৃত্বের মাধ্যমে মানুষকে একমাত্র আল্লাহকে সার্বভৌম শক্তি ও আইনদাতা মানার দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে, ফিরিয়ে দিতে হবে সেই ব্যবস্থার দিকে যেখানে কায়েম থাকবে আল্লাহর প্রভুত্ব, তাঁর পরিচালনা, তাঁরই শাসন, তাঁর ক্ষমতা এবং তাঁরই আইন। যারা লা-ইলাহা-ইল্লাহল্লাহ- মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ- এ কথায় সাক্ষ্য দেয়, তারা জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীদের থেকে নিজেদেরকে সর্বতোভাবে মুক্ত করবে। জাহেলী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব ধর্মের নামে, ফকীর দরবেশের নামে, ধর্ম জাযকদের নামে, যাদুকরদের নামে, পন্ডিতদের নামে এবং তাদের অনুসারীদের নামে অর্থাৎ এসব রাষ্ট্র যেভাবেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, পরিচালিত হোক না কেন তা সবই জাহেলিয়াত বলে গণ্য হবে। এ সব ছাড়াও জাহেলিয়াতের অন্যান্য আরও রূপ আছে, যেমন রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক নেতৃত্ব ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব; যেমন কোরায়শদের মধ্যে

ছিলো। এসব সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এবং বশীভূত করে ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ সভ্যতাকে নতুন ভাবে গড়তে হবে। এ লক্ষ্যে কর্মীদেরকে সংগঠিত করতে হবে যোগ্যও সৎ মুসলিম নেতৃত্বের অধীনে।

ইসলামের শুরু থেকেই একথা নিশ্চিত করা হয়েছে যে, যারাই ইসলামের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করবে, তাদেরকে এই একই নিয়মে গড়ে উঠতে হবে। যেহেতু ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে তারা ঘোষণা দিয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনিই একমাত্র বাদশাহ ও আইন দাতা এবং মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল এই ঘোষণার বাস্তবায়ন ছাড়া মুসলিম সমাজ কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না । এই মূলনীতির কথাগুলো শুধু অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়ার মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না- তা যতো অধিক সংখ্যক মানুষই এই মূলনীতি পৌঁছে দেয়ার জন্য পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুক না কেন এই কথাসর্বস্ব জনগোষ্ঠী ঐ কর্মী বাহিনীর মতো কিছুতেই হতে পারে না যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে শরীয়তসম্মত নেতার নেতৃত্বে এবং সুপরিকল্পিত এক ব্যবস্থা মতো সক্রিয় ও জীবন্ত ভূমিকা রাখে, যেমন কোনো জীব তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য জীবন রক্ষা করার জন্য ও তার প্রভাব বলয়কে প্রশস্ত করার জন্য তৎপরতা নেয়। এতোটুকুতেও সে ক্ষান্ত হয় না, বরং যে অপশক্তি তার অস্তিত্বটুকুকে মুছে ফেলার জন্য চক্রান্ত চালাচ্ছে তাকে প্রতিহত করার জন্য সর্ব প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং এই কর্মীদের সমষ্টি একত্রিত হয়ে নিজেদেরকে মযবুত বানানোর চেষ্টা করে। তারা নেতৃত্বের অনুসরণে কাজ করে বটে। কিন্তু তাদের অনুসরণ ও আনুগত্য জাহেলি সংগঠনের নেতৃত্বে গঠিত কর্মীদের আনুগত্য থেকে ভিন্নধর্মী; যেহেতু এই আনুগত্যের লক্ষ্য কোনো ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা নয়, নয় কোনো জনগোষ্ঠীর সুযোগ-সুবিধা ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা; বরং তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, তারা প্রচার ও প্রসার ঘটানো এবং মানুষের অন্তরের গভীরে ইসলামের প্রভাব সৃষ্টি করা আর এ জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে জাহেলিয়াতের প্রভাব-বলয়কে অপসারিত করা।

এটিই ইসলামের বাস্তব, জীবন্ত ও চূড়ান্ত রূপ। এইভাবেই ইসলামের প্রথম অনুসারীরা বাস্তব জীবনে এর বিধি বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে। নবী (স.)-এর মাধ্যমে যখন ইসলাম এলো তখন সর্বপ্রথম তাঁর নিজের কাজ কথা ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাস্তবে মানুষ ইসলামকে দেখলো এরপর এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠলো এক কর্মী-বাহিনী। এ কর্মী-বাহিনীর চরিত্র জাহেলী সমাজের মানুষ থেকে ছিলো সর্ম্পূণ ভিন্ন। স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে এ কর্মী-বাহিনী ছিলো সম্পূর্ণ অনন্য। এ বাহিনীর লোকজন বাস্তব কাজ ও ব্যবহারের মাধ্যমে এমন এক সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছিলো যে, এ বাস্তবতার সংস্পর্শে না এসে শুধু কথাসর্বস্ব হয়ে কখনো ওই চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না, না পারে মানুষের জীবনের ওপরে কোনো প্রভাব ফেলতে। একইভাবে, আজও যদি আমরা ইসলামকে আবার জীবন্ত এক জীবন ব্যবস্থা হিসাবে দেখতে চাই, তাহলে আমাদেরকেও সেই সাহাবায়ে কেরামের যুগের মতো সেই বাস্তব কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হবে, যার আলোকে তৎকালীন মানুষ পেয়েছিলো সত্য-সুন্দর পথ। এ ছাড়া ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং সেই সোনালী যুগের মুখ দেখা কিছুতেই সম্ভব নয়; কেননা দুনিয়ার যে কোনো যামানায় বা যে কোনো দেশে কোনো আদর্শকে শুধু ওয়ায নসীহত ও দাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। সকল সময়েই যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার ও কাজ মানুষ আশা করেছে এবং যুক্তির মাধ্যমেই মানুষের বিবেকে সাড়া জেগেছে এবং তখনই মানুষ অন্তর প্রাণ দিয়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে।

যখন আমরা ইসলামের জাগরণ ও প্রতিষ্ঠার গূঢ় রহস্যগুলো বাস্তবে বুঝতে পারবো, বুঝতে পারবো মানুষের স্বভাব ও তার প্রকৃতিগত রহস্যকে, হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো এ জীবন ব্যবস্থার

প্রকৃতিকে এবং তার আন্দোলনের পদ্ধতিকে, তখনই আমরা ইসলামের ইপ্সিত লক্ষে পৌছুতে পারবো। এইভাবে যদি যাত্রা শুরু করি তাহলেই আমরা কোরআন-হাদীসে বর্ণিত তথ্যগুলোর তাৎপর্য অনেকাংশ বুঝতে পারবো বলে আশা করি, যা এ সূরার শেষে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে আমাদেরকে মোহাজের মোজাহেদদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বলা হয়েছে- তাদের সম্পর্কেও বলা হয়েছে, যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলো এবং সাহায্য করেছিলো। সেখানে তাদের কথা ও আলোচনা করা হয়েছে যারা ঈমান এনেছে। কিন্তু হিজরত করে নাই এবং মোশরেক ও বিধর্মী লোকের সাথে সম্পর্ক গড়ার কথাও এসেছে। যারা কুফরী করেছে .... এই সম্পর্ক পুরোপুরিভাবে সেই চেতনার ওপর ভিত্তি করে টিকে থাকে যা ইসলামী সমাজের উন্নতির জন্য গড়ে ওঠে।

এবারে আমরা এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত আয়াতগুলো পেশ করতে পারবো,

যারা হিজরত করবেনা তাদের সাথে সম্পর্কের ধরণ

'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে তাদের মাল ও জান দ্বারা জেহাদ করেছে .... যদি তা না করে তাহলে পৃথিবীতে ভীষণ ফিৎনা-ফাসাদ ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে।' (৭২-৭৩ আয়াত)

মক্কাতে যারা বললো: আশহাদু আল-লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ-অ-আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ- তারা সবাই নিজেদের পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো। নিজেদের আত্মীয় স্বজনের সাথে বন্ধন ছিন্ন গেলো, নিজেদের গোত্রের সাথে দূরত্ব এসে গেলো কোরায়শদের মধ্যে নেতৃত্ব করার জন্য জাহেলী যুগে যে নেশা ছিলো তার সম্ভাবনা তারা একেবারেই শেষ করে দিলো। তাদের সম্পর্ক ও ভালোবাসা গড়ে উঠলো মোহাম্মাদ (স.)-এর সাথে; তাঁর হাতেই তারা নিজেদেরকে সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব দিলো, তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে উঠলো ছোট্ট এই দলটি। যখনই রসূলুল্লাহ (স.)-কে খতম করে দেয়ার জন্য এরা কোনো ষড়যন্ত্র করেছে তখনই এ ছোট্ট দলটি অস্থির হয়ে গেছে, এবং তাঁর সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এমনকি যখন তিনি মক্কার বাইরে চলে গেলেন, তখন তাঁর জন্য তারা যুদ্ধের ঝুঁকিও নিয়ে নিলো। যখন এই ছোট্ট দলটাকে অংকুরেই ধ্বংস করে দেয়ার জন্য কোরায়শরা বদ্ধপরিকর হয়ে এগিয়ে এলো তখনও মানব ঢাল হয়ে দাড়িয়ে গেলো।

এ সময়ে রসূলুল্লাহ (স.) তাদের এই ছোট্ট দলটির সদস্যদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিলেন....... অর্থাৎ জাহেলী সমাজ থেকে বের করে এনে এই নবীন দলের প্রতিটি সদস্যকে তিনি দান করলেন নতুন এক জীবন এবং তাদের সমন্বয়ে তিনি এমন একটি সংগঠন তৈরী করলেন যার প্রতিটি সদস্য একজন আর একজনের জন্যে যে কোনো দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। অতীতের সম্পর্ক ভেংগে গিয়ে তাদের যাবতীয় সম্পর্ক গড়ে উঠলো এই নতুন জামায়াতের সাথে।

তারপর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে মদীনাতে হিজরতের হুকুম দিলে, মুসলমানরা দেখতে পেলো মদীনার লোকেরা সাধারণভাবে ইসলামী নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে আল্লাহর রসূলের কথা শুনতে আগ্রহী হয়েছে, সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্য করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে,. তাদের বল সম্পদ ও বিবি-বাচ্চাদের মতোই তাঁকে আপনজন করে নিয়েছে এবং একইভাবে তাঁর নিরাপত্তার জন্য সর্বপ্রকার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়ে গেছে, সর্বোপরি রসূলুল্লাহ (স.) এর নেতৃত্বে মদীনাতে মুসলমানদের জন্য যখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারার সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে উঠেছে। তখন রসূল (স.) মদীনায় হিজরত করলেন এবং মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে সেই রকম গভীর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন যেমন রক্ত ও বংশের টানে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে। যেমন করে পরিবার ও বংশের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকার, যামীন

হওয়া, রক্তপণ শোধ করার যে ধারা চালু আছে, এই ভ্রাতৃত্বের কারণে ঐ একইভাবে এবং একই প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলো। আর এ বিষয়ের ওপর পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার হুকুমও এসে গেলো।

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও তাদের মাল-জান দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর বন্ধু অভিভাবক।'

বন্ধু তারা পারস্পরিক সাহায্য সহযোগীতা করার ব্যাপারে, বন্ধু ওয়ারেস হওয়ার ব্যাপারে, রক্তপণ পরিশোধ করার ব্যাপারে, ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারে এবং রক্ত, বংশ ও বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্কের কারণে যে বন্ধন ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয় সে সব কিছুর মতো এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে গেলো।

তারপর আরও কিছু লোক এমনও পাওয়া গেলো যারা বিশ্বাসগত দিক দিয়ে এই দ্বীনের গভীর মধ্যে প্রবেশ করলো বটে কিন্তু মুসলিম সমাজে কার্যত যোগদান করলো না (মদীনা কেন্দ্রীক-। হিজরতও করলো না, যেখানে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে অবতীর্ণ নির্দেশ অনুসারে দেশ শাসন ও মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করা হচ্ছিলো, এবং যে শহরটিকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করে তার মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত আইন-কানুন চালু করা হচ্ছিলো। সেখানে এসে মুসলমানদের সাথে তারা শামিল হলো না, নিজেদের পূর্ণাংগ অস্তিত্বকেও স্থির করলো না। যেহেতু সমাজে বংশগত দিকদিয়ে তাদের নেতৃত্ব-কতৃত্ব ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিলো, সেগুলো পরিত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি-হাসিলের জন্য মুসলিম সমাজের মধ্যে পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত হলোনা এবং নিজেদেরকে মুসলমান বিপ্লবীদের নেতৃত্বাধীনে সর্ম্পূণভাবে সোপর্দ করলো না। নিজেদের পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে নিল না জাহেলী সমাজ থেকে এবং ঐ সমাজের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে আনতেও রাযি হল না।

এই ধরনের কিছু লোক মক্কায় এবং মদীনার উপকণ্ঠে ছিলো, যারা ইসলামের আকীদাকেও অবশ্যই গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু এই আকীদার দাবী হিসাবে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারছিলো না এবং মারাত্মকভাবে বাপ দাদাদের রীতিনীতি পরিত্যাগ করে ইসলামী আইন-কানুন মেনে নিতেও পারছিলো না।

এদেরকে ইসলামী সমাজের লোক বলে মনে করা হয়নি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেও তাদের জন্য হেফাযতের দায়িত্ব নেয়া হয়নি কোনো দরদও তাদের জন্য দেখানো হয়নি বরং প্রকৃত অর্থে তাদের কোনো ব্যাপারেই কোনো দায়িত্ব নেয়ার কথা আল্লাহ তায়ালা বলেননি, ইসলামী সমাজের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক আছে এ কথাও জানানো হয়নি, কারণ তারা কার্যত মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। এই কারণেই তাদের সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানাতে গিয়ে নীচের আয়াতটি নাযেল হলো:

'আর যারা ঈমান আনলো, কিন্তু হিজরত করলো না, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে দ্বীন-ইসলামে শরীক হওয়ার ব্যাপারে অথবা দ্বীন ইসলাম জানা বুঝার ব্যাপারে অথবা তাদেরকে কোনো শত্রু থেকে রক্ষার ব্যাপারে তারা যদি তোমাদের কাছে কোনো সাহায্য চায় তাহলে অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবে, কিন্তু এ সাহায্য তাদের বিরুদ্ধে করা যাবে না যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গেছ।'

আল্লাহ তায়ালার এ দ্বীন-এর প্রকৃতির সাথে এ হুকুম খুবই সামঞ্জস্যশীল এবং যুক্তিপূর্ণ বলে বুঝা যায়। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। তবে ইসলামের বিপ্লবী যে বাস্তব চরিত্র আছে তার বিচারে ঐ সব মৌখিক স্বীকারোক্তি দানকারী ব্যক্তিরা মুসলিম সমাজভুক্ত নয়, এ কারণে

মুসলমানাদের সাথে তাদের কোন বন্ধত্বের সম্পর্ক নেই, নেই কোনো দায়িত্ব বা তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার কোনো কর্তব্য। তাদের আকীদা বিশ্বাসের একটা সম্পর্ক মাত্র আছে। এতটুকু কারণে ঐ চুক্তিবদ্ধ লোকদের মোকাবেলায় এই (কলেমা সর্বস্ব) লোকদেরকে সাহায্য করা যাবে না এবং তাদেরকে ইসলামী সমাজের লোক মনে করা যাবে না। তবে তারা যদি বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে আসে এবং এই আকীদা গ্রহণের কারণে ওদের ওপর যদি কোনো বিপদ আপদ আসে এবং যদি কেউ ঐ সব মুসলমানদের ওপর দারুল ইসলামে হামলা করে তাহলে একমাত্রই অবস্থাতে ওদেরকে সাহায্য করা মুসলমানদের কর্তব্য হবে। সেখানেও শর্ত থাকবে এই যে মুসলমান ব্যতীত অন্য কোনো বাহিনীকে এই চুক্তিবদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না; এমনকি এই চুক্তিবদ্ধ জাতি যদি তাদের প্রতিপক্ষের (মুসলমান ছাড়া অন্য কোন) ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু বলে বা সীমালংঘন করে কিছু করে সেখানে ঐ আক্রান্ত জনগণের পক্ষে অস্ত্র ধরবে না। এটা এই জন্য যে, আসল কথা হচ্ছে সাহায্য করতে হবে মুসলিম সমাজকে এবং তাদের আন্দোলন ধর্মী পদক্ষেপকে। সম্মান করতে হবে তাদের সকল কর্মকান্ড ও চুক্তি সমূহকে। এটাই প্রথম কর্তব্য, তারপর আকীদা বিশ্বাসীদের প্রতি তাদের আকীদার কারণে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। চুক্তিবদ্ধদের সাথে ওই কালেমাধারীদের বিরোধ ইসলামী সমাজে যোগ দিতে চাওয়ার কারণে না হয়ে যদি শুধু তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে হয় সেখানে চুক্তিবদ্ধদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা যাবে না। ......আর এইটাই হচ্ছে সেই মূল গুরুত্বপূর্ণ কথা যা দ্বীনকে আন্দোলন মুখর এক সংগঠনের সাথে সম্পর্কিত করে। সত্যিকারে ইসলামকে সমাজে টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই আন্দোলন। আর এ হুকুমকে কার্যকর না করা হলে শাস্তির কথা বলতে গিয়ে উচ্চারিত হয়েছে!

'আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালা তা সবই দেখেন।'

তোমাদের সকল কাজই তাঁর চোখের সামনে রয়েছে। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কেই তিনি জানেন, জানেন তার শুরু ও শেষ, সকল কাজের উদ্দেশ্য ও তার প্রতিক্রিয়া কী হবে তা সবই তাঁর জানা।

এটা যেমন ঠিক যে, প্রত্যেক মুসলিম সমাজই একটি আন্দোলন-ধর্মী সংগঠন এবং এর অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিরোধী শক্তির রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এ আন্দোলন অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। এ জামায়াতের অনুসারীরা একে অপরের অভিভাবক হবে, সাহায্যকারী হবে এবং বিপদ আসলে সবাই পারস্পরিক সহযোগিতার সাথে তার মোকাবেলা করবে। এমনিভাবে জাহেলী সমাজের লোকেরাও পারস্পরিক সহযোগিতার ওপরে টিকে আছে: তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে:

'আর যারা কুফরী করেছে তারাও পরস্পরের বন্ধু।'

সকল কাজই প্রকৃতিগতভাবে এই একই রকম সংঘটিত হয়, যেমন ইতিপূর্বে আলোচনা এসেছে। জাহেলী সমাজ একাকী চলে না, চলতে পারে না, বিচ্ছিন্নভাবে কেউ টিকে থাকতে পারবে না। যে কোনো ব্যবস্থা– সে জাহেলী হোক বা ইসলামী তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে সাংগঠনিক কাজ থাকতেই হবে, যার ভিত্তিতে তার সদস্যরা বিরোধীদেরকে প্রতিরোধ করবে, নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা ও সক্রিয় বানানোর জন্য আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই অপরিহার্য। স্বাভাবিক কারণেই তারা পরস্পরের বন্ধু এবং কুফরীর কারণেও তাদের একজনকে অপরজনের অবিচ্ছেদ্য অংগ, আর এই কারণেই ইসলাম তাদেরকে ভিন্ন সমাজ হিসাবেই গণ্য করে এবং তাদের চেনার মতো বিশেষ কিছু লক্ষণও আছে, কিন্তু সে বৈশিষ্টগুলো ঈমানী বৈশিষ্টের

তুলনায় আরও গভীর, আরও শক্ত এবং আরও শক্তিশালী। সুতরাং পরস্পরের বন্ধু হিসাবে যদি ঐ জনসমষ্টিকে সম্বোধন না করা হয় তা হলে জাহেলী সমাজের লোকদের পক্ষে তাদেরকে বুঝতে পারাটা অসুবিধাজনক হয়ে যাবে এবং ঐ অবস্থায় ঐ জাহেলীয়াতের ধ্বজাধারীদের মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। যেহেতু তারা মানুষের খোঁজ খবর নেয় এবং তাদের জন্য যামীন হওয়ার গ্যারান্টিও দেয়। এইভাবে জাহেলিয়াতের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে এবং ইসলামের ওপর জাহেলিয়াতের বিজয় এসে গেলে পৃথিবীর বুকে সাধারণভাবে অশান্তি ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে। ইসলামের ওপর জাহেলিয়াতের কেতন যদি উড়তে শুরু করে এবং ইসলামী ব্যবস্থার ওপর যদি জাহেলিয়াত প্রাধান্য বিস্তার করার সুযোগ পায়, তাহলে দেখা যাবে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে নানা প্রকার বিশৃংখলা, দেখা যাবে আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্ব-কর্তৃত্বের ওপর বেড়ে যাচ্ছে দাসদের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব, পুনরায় মানুষ মানুষের গোলামে পরিণত হচ্ছে- আর এটাই সকল অশান্তির বড় অশান্তি। তাই আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'যদি তোমরা তা না করো তাহলে পৃথিবীর বুকে নানা প্রকার বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে এবং ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হয়ে যাবে।'

আর পরিষ্কারভাবে এটা জেনে রাখা দরকার যে এই সতর্ককারীর পরে আর কোন সতর্ককারী আসবে না, আর এই ভীতি প্রদর্শনকারীর পর আর কেউ এমন আসবে না যে পরকালীন আযাবের ভয় দেখাবে। আর যে সকল মুসলমান এক গভীর সম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ হবে না এবং একই নেতৃত্বের অধীনে আন্দোলনধর্মী কাজ করে শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর একটা সমাজ গড়ে তুলবে না তারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের অন্ধ অনুসারীতে পরিণত হবে, অনুসারী হবে এই মহা বিশৃংখলার যা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

এরপর আল কোরআনের অমিয় বাণী প্রকৃত ঈমানের বাস্তব রূপরেখা কী হবে এবং কিভাবে তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা হবে তা জানাতে গিয়ে বলছে,

'আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে; আর যারা (মোহাজের মুসলমানদেরকে) আশ্রয় দিয়েছে এবং সর্বোতভাবে সহায়তা করেছে, তারাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মোমেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রেযেক।'

এই যে কথাটা: ওরাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মোমেন .... এই হচ্ছে ঈমানের বাস্তব রূপ। অর্থাৎ এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এর অনুসারীদেরকে প্রকৃতপক্ষে (ঈমানের সকল দাবীপূরণকারী হিসাবে) মোমেন হতে হবে। এই অবস্থাটা শুধু ঈমানের কথা মুখে আওড়ানো বা ঈমানদার হওয়ার কথা বড় গলায় মুখে উচ্চারণ করাতেই আসে না, আসে শুধু ঈমান কবুল করার মাধ্যমে; এমনকি আনুষ্ঠানিক এবাদাত করার মাধ্যমেও ঈমানের বাস্তব বহিপ্রকাশ ঘটে না, ঈমানের বাস্তব কোনো দিক ফুটে ওঠে না .... অবশ্যই এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হচ্ছে সম্মিলিত আন্দোলন, অর্থাৎ এ দ্বীন হচ্ছে একদল লোক সংঘবদ্ধভাবে সাংগঠনিক নিয়ম-কানুনের অধীনে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে বাস্তবে চালু করার আন্দোলনে নিয়োজিত থাকবে। ওরাই প্রকৃতপক্ষে মোমেন। এদের জন্যই রয়েছে মাগফেরাত ক্ষমা ও সম্মানজনক রেযেক আর এখানে রেযেক বলতে বুঝানো হয়েছে, জেহাদ, এনফাক ফী সাবীলিল্লাহ এবং আশ্রয় দান, সাহায্য করা ও সর্বপ্রকার দায়িত্ব পালন (করা), আর সর্বোপরি রেযেক হচ্ছে মাগফেরাত সম্মানিত রেযেক এরই একটি রূপ। বরং সম্মানজনক যতো রেযেক আছে তাদের মধ্যে সব থেকে বড় সম্মানিত রেযেক হচ্ছে এই মাগফেরাত।

এরপর বর্ণনা আসছে প্রথম শ্রেণীর মোহাজের মোজাহেদদের সম্পর্কে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে যারা হিজরত ও জেহাদ করবে তারাও এ মর্যাদা অবশ্যই পাবে। তবে, তাদের মধ্যে যারা

অগ্রগামী হবে, তাদের মর্যাদা প্রথম স্তরের মোজাহেদদের মর্যাদার সর্ম্পূণভাবে সমান হবে, যেমন তাদের সম্পর্কে আল-কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা ইসলামের প্রথম যুগে সমান সমান মর্যাদার অধিকারী হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও জেহাদ করেছে তারা তোমাদের একই দলের অন্তর্ভূক্ত'।

আর হিজরতের এই শর্ত মক্কা বিজয় না হওয়া পর্যন্ত কায়েম ছিলো। মক্কা বিজয়ের পর আরব দেশগুলো ইসলামের জন্য পরস্পর খুব নিকটবর্তী হয়ে গেলো, গোটা এলাকা ইসলামী নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য উপযোগী ভূমিতে পরিণত হলো এবং ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সর্বপ্রকার উপযোগী ব্যবস্থা তৈরী হয়ে গেলো। অতপর মক্কা বিজয়ের পরে ইসলামী শাসনাধীন অঞ্চলের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় আর হিজরত রইলো না, অর্থাৎ হিজরতের যে নির্দেশ ছিলো মক্কা বিজয়ের পর সে নির্দেশ রহিত হয়ে গেলো। মক্কা থেকে হিজরত করে ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য যে নির্দেশ ইতিপূর্বে জানা গেছে তার কার্যকারিতা থাকলো না যেহেতু মক্কায় ইসলামী সমাজ ও পরিবেশ গড়ে উঠলো; যেমন রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ইসলামী শাসন আমলের প্রথম স্তরে প্রায় বার শত বছর ধরে পৃথিবীতে ইসলাম বিজয়ী ব্যবস্থা হিসাবে বর্তমান ছিলো। এ সময়ের মধ্যে কোন সময়েই ইসলামী শরীয়াতের কোনো বিধান চালু থাকা বন্ধ হয়নি, বন্ধ হয়নি কোনো সময়ে মুসলমানদের নেতৃত্বে শরয়ী বিধানের কার্যকারিতা এবং মুসলমানদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা অন্য জাতির হাতেও কোনো সময়ে চলে যায়নি। ......অবশ্য বর্তমান অবস্থায় মানুষ যখন ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও বাস্তব অনুসরণ পরিত্যাগ করেছে তখন শাসন ক্ষমতা পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাদ্রোহী (তাগূত)-দের হাতে চলে গেছে এবং মানুষ মানুষের গোলামে পরিণত হয়ে পড়েছে। আজকে ইসলামের জন্য আর এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, যেমন ছিলো প্রথম যুগ। অর্থাৎ প্রথম যুগের মতোই বিভিন্ন দেশে ইসলামকে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং তারা চায় একটি ইসলামী দেশ (দারুল ইসলাম) গড়ে তুলতে যেখানে পূর্ণাংগ ইসলামী ব্যবস্থা চালু হবে এবং যেখানে ঈমানী জীবন যাপনের সংকটে পড়া মানুষরা এসে আশ্রয় নিতে পারবে। ইসলামী সমাজে যোগদানের জন্য যেখানে মানুষ হিজরত করে আসতে পারবে, তারপর আল্লাহর হুকুম ইসলামের ছায়া পূনর্বার গোটা বিশ্ব ব্যাপী প্রসারিত হবে। আবার যখন এই অবস্থা হবে তখন আর হিজরত করে অন্য কেনো দেশে চলে যাওয়ার প্রয়োজন থাকবে না, কিন্তু জেহাদের অবশ্যই বহাল থেকে যাবে, যেমন প্রথম যুগে মক্কা বিজয়ের পর বহাল ছিলো।

প্রথম যুগে ইসলামী সমাজ গড়ার জন্য বিশেষ বিশেষ কিছু হুকুম জারি করা হয়, তাদেরকে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব বহন করতে হয়, তৎকালীন মুসলিম জনগণের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আকীদা-বিশ্বাস এতো গভীরভাবে প্রোথিত ছিলো যেন এ বিশ্বাস তাদের রক্ত -মজ্জার সাথে মিশে ছিলো, মিশে ছিলো সর্বোতভাবে এবং সকল স্তরে। তাদের জীবনে এ আকীদা সকল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হতো এবং সকল কাজেই এ বিশ্বাসের দাবী তারা পূরণ করতো। কারও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার কাজে হোক বা কারও ক্ষতিপূরণ আদায় কার জন্যে হোক, কারও পক্ষে জরিমানা আদায় করা হোক সর্ব-বিষয়েই এই আকীদাই ছিলো তাদের মুল পরিচালিকা শক্তি। তারপর, সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী সেই শুভ দিনটা যখন এসেই গেলো তখন মুসলমানদের আচরণে (সংকীর্ণতা সাময়িকভাবে দেখা গেলেও) সামগ্রিকভাবে ইসলামী আকীদা তার আকর্ষণীয়

ভূমিকার স্বাক্ষর রাখতে ত্রুটি করলো না। আল্লাহ .... তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স.) ভারসাম্যপূর্ণ ভাবে যার যার অধিকার তাকে দিতে বলেছেন এবং আত্মীয়তার হক আদায় করারও ব্যবস্থা দিয়েছেন।

সুতরাং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক পারিবারিক সুসম্পর্ক স্থাপনের পর এবং সুবিচারপূর্ণ সকল ব্যবস্থা কায়েমের পর আত্মীয়তার ক্ষেত্রে কাউকে প্রাধান্য দান করা এবং এর কারণে সৃষ্ট মনমালিন্য হওয়া বা ঝগড়া-বিবাদ বাধার আর কোনো সুযোগ রইলো না এবং মানুষের প্রকৃতির মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ এবং যে সব সংকীর্ণতা মজ্জাগত হয়ে আছে সেগুলোর ও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার কোনো সুযোগ রইলো না। মানুষের মধ্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চেতনার সাথে সংঘর্ষ বাধার মতো কোনো কারণ অবশিষ্ট না থাকায় পারস্পরিক ঘৃনা-বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠারও আর কোনো সুযোগ রইলো না।

ইসলাম মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয় না, বরং এগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে। নিয়ন্ত্রিত করে সব কিছুকে ইসলামী ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য এবং মানুষের জীবনের বড় বড় প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্য। এরপর এরপর আবার ধীরে ধীরে মুসলিম জাতি ইসলাম থেকে সরতে সরতে একেবারে ইসলামের বাইরে গিয়ে দাড়িয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের সেই বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব পালন করেনি, যার কারণে বর্তমান মুসলিম দাবীদাঁর মানুষেরা তাদের মুল অবস্থান আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা চেতনা ও কার্যক্রম থেকে যোজন যোজন দুরে সরে গেছে আর একারণে প্রথম যুগের মুসলমানদের কী কী দায়িত্ব ছিলো তা সঠিকভাবে জানা বুঝাও আমাদের জন্য একান্ত জরুরী। আমাদের বিস্তারিতভাবে জানা দরকার ইসলামের সাধারণ প্রকৃতি কি এবং অন্যান্য জরুরী হুকুম আহকামই বা কি ..... এরশাদ হচ্ছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সব কিছু সম্পর্কে ওয়াকেফহাল।'

আয়াতের এ অংশটুকু দ্বারা আল্লাহ তায়ালা বুঝাতে চেয়েছেন, যে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন যেভাবে সংগঠনের সদস্য হয়ে বাতিল শক্তির মোকাবেলায় ইসলামকে বাস্তব জীবনের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনে শরীক হতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা জেনে বুঝে পালন না করলে তাদের তিনি অবশ্যই শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন এ কথা মোমেনদের চেতনার মধ্যে জাগরুক করা এবং সদা সর্বদা তাদের মনের মধ্যে ওই চেতনা রেখে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে গিয়েই তিনি জানাচ্ছেন-'তিনি সব কিছু জানেন।'

এরপর আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন যে এই মূলনীতি ও এই নিয়মের অধীনে তিনি মুসলিম উম্মাহকে গড়ে তুলতে চান এবং তিনি চান এই উম্মতের আন্দোলনমুখী কর্মীদের নিয়ে একটি বলিষ্ঠ সমাজ গড়ে উঠুক। এই ঈমানদার লোকদের মধ্যে একতা ও ভালোবাসার বন্ধন সৃষ্টি করবে এই বলিষ্ট আকীদা বিশ্বাস- এ বিশ্বাস যতো বেশী মযবুত হবে ততো বেশি তাদের মধ্যে একতা ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং এককেন্দ্রীক হয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ করার জন্য তাদের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টি হবে। এদের লক্ষ্য হবে মানুষের মধ্যে মানবতাবোধ পয়দা করা, তাদেরকে শক্তিশালী করা ও তাদেরকে ক্ষমতাবান বানানো এবং সৃষ্টির বুকে যতো মানুষ আছে তাদের জীবনকে অন্যান্য সকল দিক দিয়ে বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ করে তোলা, আর এটা বলবে তাদের সকল মূলনীতি, শিক্ষা, আইন ও হুকুম আহকামের জন্যে যে সাধারণ নিয়ম-কানুন ছিলো তার আয়ত্বের মধ্যে থেকেই।

নিশ্চয়ই মানব জাতির মধ্যে কিছু পাশব বৃত্তিও আছে, বরং অন্য কথায় বলা যায়, বস্তুগত সৃষ্টির কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে, অবশ্য এগুলো হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীদের কাল্পনিক বৈশিষ্ট। কখনও তাকে অন্যান্য জীব-জানোয়ারের মতোই একপ্রকার জানোয়ার মনে হয়, কখনও

তাকে অন্যান্য জড় পদার্থের মতোই এক প্রকার জড় পদার্থ মনে হয়। কিন্তু এসব সৃষ্টির সাথে তাদের মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের আরো কিছু বৈশিষ্ট আছে যা অন্যান্য জিনিসের মধ্যে নাই এবং যে গুণগুলো অন্যদের থেকে তাকে পৃথক করে রেখেছে এবং তাকে বানিয়েছে সৃষ্টির সেরাজীব। এ সত্যটিকে জাহেলিয়াতের বৈজ্ঞানিকরা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এবং এ সত্যের সামনে তাদের মাথা নত হয়ে গেছে। কিন্তু আন্তরিকতার সাথে ও প্রকাশ্যভাবে তারা এ সত্য কথা মেনে নিতে চায় না।(১)

ইসলাম আল্লাহ তায়ালার নিয়ম অনুসারে মানুষের সেই সব বৈশিষ্টের দিকে খেয়াল করে যা মানুষকে এই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে এবং অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে তার স্বতন্ত্র অবস্থা নির্ণয় করেছে। এই গুণগুলোকে ইসলাম প্রকাশ করে, গড়ে তোলে এবং এগুলোকে প্রাধান্য দেয়। এগুলোকে যখন ইসলাম আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত মনে করে এবং মনে করে যে এসব গুণ গড়ে ওঠে একমাত্র আকীদার কারণেই, তখন এটিও মনে করে যে সমাজের যেসব বৈপ্লবিক চিন্তাধারা গড়ে ওঠে তার মূলেও সক্রিয় হয়ে রয়েছে এই আকীদা-বিশ্বাস, যার মাধ্যমে রচিত হয়েছে উম্মাতে মুসলিমার ভীত এবং যার কারণে উম্মাতে মুসলিমার অস্তিত্ব বিশ্বের বুকে টিকে আছে। অবশ্যই ইসলাম এই মানবতার চরিত্রের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে এবং এরই ওপর এগিয়ে চলেছে। এসবের মধ্যে 'ঈমানী-বৈশিষ্টই' হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গুণ যা মানুষকে প্রকৃত মানুষ রূপে গড়ে তোলে।

কোনো বংশ পরিচয়, ভাষা, কোনো নির্দিষ্ট এলাকা, শ্রেণী, বর্ণ, কোনো সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হওয়া অথবা কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমির মালিক হওয়ার কারণে এসব বৈশিষ্ট গড়ে ওঠে তা নয়। ....

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে এগুলো সব কিছুই এমন বৈশিষ্ট যেসব বৈশিষ্টের দিক দিয়ে মানুষের সাথে পশুদেরও কিছু সাদৃশ্য আছে। যেমন মেষপালের মধ্যে যে সম্পর্ক এবং যে একতা পরিলক্ষিত হয় তা মুসলমানদের সম্পর্কের সাথে বেশ তুলনীয়, তুলনীয় তাদের এক সাথে দলবদ্ধভাবে অবস্থানের সাথে, তাদের চারণক্ষেত্রে এক সাথে ম্য ম্য করে সেই ধ্বনি তোলার সাথে যার দ্বারা তারা পরস্পরকে নিজেদের অনুভূতি জানায়!

এখন, একটু খেয়াল করুন, যে আকীদা মানুষকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানায়, তার আশে পাশের সব কিছু সম্পর্কে তাকে অবহিত করে, সেই আকীদাই তাকে তার জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যও বিশদভাবে জানিয়ে দেয়। একইভাবে তার চতুর্দিকের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পর্কেও তাকে সঠিক তথ্য জানায়। কোথায় তার প্রত্যাবর্তন স্থল, তার আশ-পাশের প্রাকৃতিক বস্তুগুলোর পরিণতি কী হবে তাও তার আকীদা তাকে জানতে সাহায্য করে। একথাও জানায় যে এসব কিছুকে ফিরিয়ে নেয়া হবে সেই মহাবস্তু-নিচয়ের দিকে, যা এই দৃশ্যজগত থেকে অনেক বড়, অনেক উর্দ্ধে অনেক দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং অনেক দীর্ঘস্থায়ী। এ আকীদার মৌলিক বৈশিষ্ট হচ্ছে এটি সরাসরি তার আত্মার সাথে, সৃষ্টির অন্যান্য সব কিছু থেকে তার পার্থক্য নির্ণয়কারী অনুভূতির সাথে। এই আকীদার কারণেই সে বিশ্বের সকল সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছে। এই আকীদাই তার মানবতাকে সুউচ্চ মর্যাদার স্তরে পৌঁছে দিয়েছে, যেখানে আর কারো পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

এরপর আবারও চিন্তা করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। জীবনের সাথে বিশ্বাসের এই যে সম্পর্ক– এটা কী? আকীদা বিশ্বাস চিন্তা চেতনা, জীবন পদ্ধতির সাথে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক কতো গভীর তা চিন্তা করতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ সম্পর্ক কিভাবে গড়ে ওঠে?

(১) দেখুন, Julian Huxley রচিত 'আধুনিক ডারউইনবাদ-এর ভূমিকা।

জাহেলিয়াতের সকল প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে এ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানুষ তার সচেতন ইচ্ছা দ্বারাই চলে এবং এই ইচ্ছা শক্তির ওপর তার যথেষ্ট কর্তৃত্ব রয়েছে। এখন এ বিষয়টি চূড়ান্ত যে, মালিকের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করা তার জন্য ফরয, এ ব্যাপারে তাকে নিজ মত খাটানোর কোনো অধিকার দেয়া হয়নি বা কোনো ওযর আপত্তি পেশ করারও তার কোনো সুযোগ নেই। এই আকীদা বিশ্বাস তার বংশ পরিচয়ের মধ্যেও কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনা যার মধ্যে সে প্রতিপালিত হয়েছে, যে মানব-শ্রেণীর ধারাতে সে পরিচিত তার মধ্যেও কোনো পরিবর্তন আনা তার পক্ষে সম্ভব নয়, যে শারীরিক বর্ণ সে জন্মগত ভাবে লাভ করেছে সেটাও সে ইচ্ছা করলেই পরিবর্তন করতে পারে না। কেননা এগুলো তার জন্মের আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। এসবের মধ্যে কোনো ইচ্ছা এখতিয়ার খাটানোর সাধ্য কোনো মানুষের নেই। হিলা বাহানা করে এর কোনোটাকে এড়িয়ে যাওয়াও তার ক্ষমতার বাইরে। এমনি করে কোন এলাকায় তার জন্ম হবে তাও সে নির্দিষ্ট করে দিতে পারে না। তার বাক-শক্তি, তাও তার সৃষ্টিকর্তার দান। এরপর বস্তুগত কোন জিনিসের সাথে সে সম্পর্ক রাখবে এবং কোন এলাকায় কার সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠবে সেও পূর্ব নির্ধারিত। এমন আরো অনেক ব্যাপার আছে যা এমনভাবে পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে যার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর তার ইচ্ছা শক্তিতে যে স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে তাও একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে........ আর এই সমস্ত কারণে ইসলাম এসব জিনিসকে তেমন কোনো গুরুত্ব দেয়নি। ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে তার আকীদা বিশ্বাসকে। কেননা আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, কোনো জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করা– এগুলোকে সব সময়েই মানুষের এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং ইচ্ছা করলে যে কোনো সময়ে সে তার ইচ্ছা-ইখতিয়ারের কথা প্রকাশ করতে পারে এবং কোন জনগোষ্ঠিতে বসবাস করে সে জীবন যাপন করতে চায় তাও সে পূর্ণ ইচ্ছা মতো স্থির করে নিতে পারে। এখানে তাকে ওই রকম কোনো বাধ্য-বাধকতার মধ্যে ফেলে মজবুর করে দেয়া হয়নি যেমন তার বর্ণ-ভাষা, শ্রেণী বংশ অথবা জন্মস্থান অথবা বস্তুগত দ্রব্যের ভোগ ব্যবহারের ব্যাপারে যেমন করে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে কিছু পরিবর্তন হয়ে যায়-যা বেছে নিতে এবং পছন্দ করতে সে বাধ্য হয়ে যায়।

ইসলামের বিশ্ব বিজয়ী সাম্যনীতি

এখান থেকে শুরু হচ্ছে ইসলামী চিন্তাধারায় মানুষের মর্যাদা কতটুকু তার বর্ণনা। এ বিষয়ে আমরা দেখতে পাই, ইসলামী জীবন পদ্ধতিতে মানুষকে বাস্তবে কি কি মর্যাদা দেয়া হয়েছে তার বেশ কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বজায় রেখে একমাত্র আকীদার সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতেই ইসলামী সমাজ গড়ে উঠেছে। কোন বিশেষ শ্রেণীর মানুষ হওয়ায় অথবা বিশেষ কোনো এলাকার বাসিন্দা হওয়ায়, কোনো বর্ণ, ভাষা বা অন্য কোনো কারণে আল্লাহর দরবারে তার এই মর্যদা গড়ে ওঠে না। মানুষের মধ্যে যাতে মানবতা সুলভ গুণাবলী বিকশিত হয় সে লক্ষ্যে ঈমানকে মযবুত বানানোর জন্য ইসলাম সদা-সর্বদা চেষ্টা করে এসেছে। এর ফলে গড়ে উঠেছে একটি পূর্ণাংগ ইসলামী সমাজ। যেন এই সমাজের সৌন্দর্য, শান্তি ও সংহতি দেখে আশেপাশের ভাষা, বর্ণ ও ধর্মের জাতিসমূহ প্রভাবিত হয়, তারা যেন মুসলমানদের দেখা-দেখি অনেক কিছু ত্যাগ করতে পারে, পশুসুলব চরিত্র ও মানবতা-বিধ্বংসী কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারে, গ্রহণ করতে পারে মানব সভ্যতা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী, বিগলিত হয় তাদের পাষাণ হৃদয় ইসলামী ভাবধারার প্রতি মুগ্ধ হয়ে ইসলামী সভ্যতা গ্রহণ করার জন্য তাদের মন উন্মুক্ত হয়ে যায়। এভাবেই আশা করা যায়, মানুষের মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকে গড়ে ওঠা সংকীর্ণতা দূরীভূত হবে এবং বৈষম্যের

ভেদাভেদের প্রাচীর ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে। ইসলাম এমনই এক সুশীতল ছায়ায় বৃক্ষ যার ছায়াতলে সকল যুগের সকল এলাকার সকল বর্ণের সকল জাতির সকল শ্রেনীর বিভ্রান্ত দিশেহারা শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষেরা এসে হৃদয় জুড়াতে পারবে। আজকের আধুনিক সমাজ বস্তুগত ও বৈজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতির এত উচ্চ শিখরে উঠে যাওয়ার পরও, ধীরে ধীরে হলেও ইসলামের সম্মোহনী আদর্শকে আলিংগন করার জন্য এগিয়ে আসছে।

ইসলামী সমাজের এই মহতী সম্মেলনে জড় হয়েছে আরবী, ফার্সী, সীরিয়, মিশরী, পাশ্চাত্যবাসী, তুর্কী, চীন, ভারতীয়, রোম, গ্রীক, ইন্দোনেশীয়া ও আফ্রিবাসী সবাই .... এইভাবে আজ পর্যন্ত সকল জাতির সকল শ্রেণীর মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। এই সুবিশাল ইসলামী সভ্যতা কোনো দিন স্রেক আরবী সভ্যতা হিসাবে পরিচিত হয়নি। বরং সদ-সর্বদা ইসলামী সভ্যতা হিসাবেই সারা পৃথিবীতে আলো বিলিয়েছে, এ মহা সভ্যতা কোনো বিশেষ জাতীয় সভ্যতা হিসাবেও বিকাশ লাভ করেনি। বরং ঈমানী সভ্যতা হিসাবে বিশ্ব মানবের দরবারে করাঘাত করেছে।

আর তারা সবাই ভ্রাতৃত্ব ভালবাসা, সাম্য মৈত্রী ও সংহতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সবার চেতনা উদ্দেশ্য ও লক্ষ এক ও অভিন্ন এবং সবাই এ সত্যিকার সভ্যতার আলোকে চরম ও পরম প্রশান্তি লাভ করেছে। এই সভ্যতার ছায়াতলেই গড়ে তুলতে পেরেছে তারা তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্টগুলোকে। সাম্য ও মৈত্রীর ছায়াতলে তারা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং তাদের ব্যক্তিগত ও এলাকাভিত্তিক জাতিগত ভেদাভেদ শুধু আকীদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে মহান সভ্যতা ও সংহতির জন্ম দিয়েছে এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ভয় ও ভালোবাসার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে যে মানবতাবোধ সৃষ্টি হয়েছে তার নযীর সারা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়না। অতীত জাতিসমূহের ইতিহাসে যদিও দেখা যায় যে, বিশাল রোমান সাম্রাজ্যে একত্রিত হয়েছে বহু জাতি, বহু মানব গোষ্ঠী, বহু ভাষাভাষি মানুষ, বহু দেশ এই মহা সাম্রাজ্যের সাথে সংহতি ঘোষণা করেছে, কিন্তু তারা ঈমান আকীদার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বৈষম্যমুক্ত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের মতো কোনো মানব সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি, প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি সত্যিকার মানবতাবোধ, মানুষে মানুষ ভালবাসাবাসি, মানুষের জন্য মানুষের নিঃস্বার্থ ত্যাগের উজ্জল দৃষ্টান্ত। ঐ রোমীয় সভ্যতায় শ্রেণী বৈষম্য প্রকটভাবে দেখা গেছে, সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে সবখানে দু'টি শ্রেনীতে ভাগ হয়ে গেছে, মুনিব-দাস। সমগ্র রোম জাতি নিজেদেরকে মনে করতো বর্ণ শ্রেষ্ঠ, বাকি সকলকে তারা ভাবতো দাস-দাসী এজন্য তারা ইসলামী সভ্যতাকে কখনই সানন্দে গ্রহণ করতে পারেনি এবং ইসলামী সমাজে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্ববোধের কল্যাণও তারা গ্রহণ করতে পারেনি।

এমনি করে আধুনিক ইতিহাসেও আর এক জনসমষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়, এরা ছিলো বৃটিশ জাতি। তাদের নির্মিত সভ্যতা ও তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তার এক সময়ে এতোবেশী হয়েছিলো যে বলা হতো বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। এরা রোমানদের মতোই তাদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলো। এদের জাতিয়তাবাদী চেতনা এদেরকে বানিয়ে ফেলেছিলো সাম্রাজ্যবাদী, আগ্রাসী, অহংকারী আর ইংরেজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব বিস্তারে এরা হয়ে গিয়েছিলো উন্মাদ ও নরাধম পশুর সমান। এরা আধিপত্যবাদের নেশায় অপর সাম্রাজ্যগুলোর ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে এবং ধীরে ধীরে গোটা ইউরোপের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এক সময়ে এদের এই আগ্রাসী নীতির কবলে পড়ে স্পেন, পর্তুগাল এমনকি ফ্রান্সও তার অংগীভূত হয়ে যায় এবং বৃটিশ জাতির হিংস্র ও বিভৎস চেহারা উন্মুক্ত থাকে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী যাবত।

আবার আজ এক দিকে দেখা যায় সমাজতন্ত্রীদের অভ্যুদয়। তারা আর এক প্রকার জনগোষ্ঠি গড়তে চেয়েছিলো, তারা শ্রেণী, জাতি, দেশ ভাষা ও বর্ণের সব ভেদাভেদ ভেংগে দিয়ে গড়তে চেয়েছিল বিশ্বব্যাপী এক মহা সভ্যতা। কিন্তু, হায়, তারাও সকল মানুষের মধ্যে মানবতার মূল নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। তারা আন্দোলন করলো শ্রেণী সংগ্রামের নীতিতে। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল প্রাচীন রোম-সভ্যতারই আর এক ভিন্ন রূপ। ওরা বর্ণশ্রেষ্ঠদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেছিলো আর এরা সর্বহারাদের রাজ্য কায়েম করার জন্য সকল ক্ষমতা তুলে দিতে চেয়েছিলো সর্বহারা শ্রেণীর হাতে। এজন্য তারা বিশ্বাস করেছিলো হিংস্র পন্থাবলম্বনে, তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে এবং তাদের সবাইকে হত্যা করে সকল সম্পদ তুলে দিতে হবে সর্বহারাদের হাতে!

এ বিপ্লব পৃথিবীর ছোট্ট একটি জনগোষ্ঠির মধ্যে গড়ে ওঠে। কিন্তু এ আন্দোলনের ফলে এতো রক্তপাত করা হয়েছে যা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দিন হয়নি। এ আন্দোলনের সূত্রপাতই হিংস্র দানবীয় হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে। আর এর প্রসার ঘটানো হয় মানবতার মুক্তির নামে, অর্থাৎ অত্যাচারী যালেমদেরকে হত্যা করে মযলুম জনতা কৃষক শ্রমিক-মজুর তথা গোটা পৃথিবীর সর্বহারাদের মুক্তি আন্দোলনের নামে সারা পৃথিবীতে এর আওয়ায ছড়িয়ে দেয়া হয়। এর মূল দাবী তুলে ধরা হয় খাদ্য বাসস্থান ও সর্বহারাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। এই মূলনীতিতে শুরু করে দেয় তারা এই হিংসাত্মক আন্দোলন। তারা মানুষকে একথাই জানাতে থাকে যে মানুষের ইতিহাস হচ্ছে বুভুক্ষ মানুষের খাবারের জন্য হাহাকারের ইতিহাস!!

আল্লাহ তায়ালার আইন ও জীবন বিধানের আলোকে, ইসলাম এ সব আন্দোলনের মোকাবেলায় উপস্থাপন করেছে সকল মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনাদর্শ। এ আদর্শ এসেছে সেই প্রভু প্রতিপালক একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতাধারী আইন দাতার পক্ষ থেকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন সবাইকে এবং সবাইকে তিনি পরম ভাবে ভালবেসে সৃষ্টি করেছেন। এর জন্য তিনি ডাক দিয়েছেন মানবতাবোধ সৃষ্টির জন্য ও সকল শ্রেণীর মধ্যে শ্রেনী বৈষম্যমুক্ত কল্যাণধর্মী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এজন্য এ আদর্শ অন্যান্য সকল আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী। আর যারা ইসলামী আদর্শের সাথে অন্য কোনো মতবাদের তুলনা করে সেই দিকে ধাবিত হয়, তারা যে কোনো জাতির, যে কোনো শ্রেণীর যে কোনো স্থানের এবং যে কোন স্তরেরই লোকের অনুসৃত পথ হোক না কেন আর যে কোনো নিয়ম-নীতির দিকেই তারা ঝুঁকে পড়ুক না কেন তা হবে নিদারুণ এক ভ্রান্তি, তা ডেকে আনবে তাদের জন্য জঘন্য এক জীবন যার সমাপ্তি হবে অত্যন্ত মারাত্মক এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মানুষের দুশমন এরাই হচ্ছে ওইসব মানুষ যারা চায় না যে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা যে বিশেষ দায়িত্ব ও মর্যাদা দিয়েছেন তারা সে মর্যাদা লাভ করুক। তারা এও চায় না যে সাধারণ জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের বৈশিষ্টগুলোকে কাজে লাগাক এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে জীবন-যাপন করে ধন্য হোক। ..... আসলে তারা সাময়িকভাবে হলেও শ্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতার কাটছে, আর তারা চলছে মানব নির্মিত বক্র পথের দিকে, যাতে করে তারা জীব জন্তুদের অনুসৃত পথেই চলতে পারে, গরু ছাগলের মতো চারণ ভূমিতে ঘাস খেয়ে বেড়াতে পারে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও লাগামহীন পশুর মতো জীবন যাপন করে, সেই মহান দায়িত্ব পালন না করে যার জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সম্মানিত করেছেন খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে।

আর সব থেকে বড় আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, মানুষের মধ্যে যারা সব থেকে মানবীয় বৈশিষ্টের অধিকারী তাদেরকে বিদ্বেষপূর্ণ অকর্মন্য, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি নামে অভিহিত করা এবং যারা জীব-জানোয়ারের গুণাবলীর অধিকারী তাদেরকেই প্রগতিবাদী বলা, সংস্কারবাদী এবং পুনর্জাগরণবাদী এইভাবে সকল কিছুরই অবমূল্যায়ণ করা– এটা আর কিছুই নয়, বরং জেনে বুঝে আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একমাত্র কল্যাণধর্মী জীবন বিধানকে অস্বীকার করা ও আল্লাহর দেঁয়া সেই খেলাফতের দায়িত্ব থেকে পলায়ন করা ছাড়া আর কিছুই নয় যে দায়িত্ব পালন করাই হচ্ছে মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর কাজকে সম্পন্ন করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান ...... এবং মানবতার মহান মর্যাদা থেকে মুখ ফিরিয়ে জাহেলিয়াতের আমলে গড়ে উঠা জীব-জানোয়ারের জীবনের দিকে যারা ফিরে যাবে তাদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে একদিন অবশ্যই মুছে যাবে। আর অবশ্যই তাই হবে যা আল্লাহ রব্বুল আলামীন চান। আর শীঘ্রই এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ তাদের সংগঠনগুলো সেই পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে চাইবে যেভাবে আল্লাহ্ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা চান এবং যেভাবে গড়ে তুললে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সম্মানিত করবেন। সেই নিয়ম-কানুন ও সংগঠন-পদ্ধতি তারা অনুসরণ করবে যা ইতিহাসের মুসলিম সংগঠনগুলো অনুসরণ করেছিলো, আর যা অনুসরণ করার কারণে তারা ইতিহাসের পাতায় সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে স্বরণীয় হয়ে রয়েছে। আজও যদি সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে মানবজাতিকে গড়ে তোলা হয় তাহলে আজও তারা অনুকরণ-অনুসরণের পাত্র হয়ে যাবে এবং তাদের সৌভাগ্যের বাতির জ্যোতি প্রতিভাত হতে থাকবে দিগ-দিগান্তরে। তখন মানুষ তাদের দিকে বিষয়ের সাথে তাকাতে থাকবে এবং আপামর জনতা পুনর্বার তাদের দিকে এগিয়ে আসবে এবং তাদের পদাংক অনুসরণ করে উন্নতি ও অগ্রগতির সন্ধান করতে থাকবে। আবারও তারা সেই চিহ্নিত পথে সাগ্রহে এগিয়ে আসবে যে পথে চলে এক সময় নবী (স.) এর সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁর পরবর্তী মুসলমানরা কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীর মানুষকে আলোর সন্ধান দিয়েছিলো এবং সর্বপ্রকার উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো।

এক নযরে
তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'এর ২২ খন্ড

১ম খন্ড
সূরা আল ফাতেহা ও
সূরা আল বাকারার প্রথম অংশ

২য় খন্ড
সূরা আল বাকারার শেষ অংশ

৩য় খন্ড
সূরা আলে ইমরান

৪র্থ খন্ড
সূরা আন নেসা

৫ম খন্ড
সূরা আল মায়েদা

৬ষ্ঠ খন্ড
সূরা আল আনয়াম

৭ম খন্ড
সূরা আল আ'রাফ

৮ম খন্ড
সূরা আল আনফাল

৯ম খন্ড
সূরা আত তাওবা

১০ম খন্ড
সূরা ইউনুস
সূরা হুদ

১১তম খন্ড
সূরা ইউসুফ
সূরা আর রা'দ
সূরা ইবরাহীম

১২তম খন্ড
সূরা আল হেজ্‌র
সূরা আন নাহ্‌ল
সূরা বনী ইসরাঈল
সূরা আল কাহ্‌ফ

১৩তম খন্ড
সূরা মারইয়াম
সূরা ত্বাহা
সূরা আল আম্বিয়া
সূরা আল হাজ্জ

১৪তম খন্ড
সূরা আল মোমেনুন
সূরা আন নূর
সূরা আল ফোরকান
সূরা আশ শোয়ারা

১৫তম খন্ড
সূরা আন নামল
সূরা আল কাছাছ
সূরা আল আনকাবুত
সূরা আর রোম

১৬তম খন্ড
সূরা লোকমান
সূরা আস সাজদা
সূরা আল আহযাব
সূরা সাবা

১৭তম খন্ড
সূরা ফাতের
সূরা ইয়াসিন
সূরা আছ ছাফফাত
সূরা ছোয়াদ
সূরা আয ঝুমার

১৮তম খন্ড
সূরা আল মোমেন
সূরা হা-মীম আস সাজদা
সূরা আশ শূ-রা
সূরা আয যোখরুফ
সূরা আদ দোখান
সূরা আল জাছিয়া

১৯তম খন্ড
সূরা আল আহকাফ
সূরা মোহাম্মদ
সূরা আল ফাতাহ

২০তম খন্ড

২১তম খন্ড

২২তম খন্ড

سيّد قطب

في ظلال القرآن

باللغة البنغالية

المجلد الثاني

ترجمة القرآن

حافظ منير الدين أحمد

AL-QURAN ACADEMY LONDON

إكاديمية القرآن لندن